সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

www.banglabookpdf.blogspot.com

আল হিজ্‌র

১৫

নামকরণ

৮০ আয়াত وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ এর আল হিজ্‌র শব্দটি থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, এ সূরাটি সূরা ইবরাহীমের সমসময়ে নাযিল হয়। এর পটভূমিতে দু'টি জিনিস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। যে জাতিকে তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের অবিরাম হঠকারিতা, বিদ্রূপ, বিরোধিতা, সংঘাত ও জুলুম-নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরপর বুঝাবার সুযোগ কমে এসেছে এবং তার পরিবর্তে সতর্ক করা ও ভয় দেখাবার পরিবেশই বেশী সৃষ্টি হয়েছে। দুই, নিজের জাতির কুফরী, স্থবিরতা ও বিরোধিতার পাহাড় ভাংতে ভাংতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি বারবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। তা দেখে আল্লাহ তাঁকে সান্তনা দিচ্ছেন এবং তাঁর মনে সাহস যোগাচ্ছেন।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

এই দু'টি বিষয়বস্তুই এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত যারা অস্বীকার করছিল, যারা তাঁকে বিদ্রূপ করছিল এবং তাঁর কাজে নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করে চলছিল, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা ও সাহস যোগানো হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বুঝাবার ও উপদেশ দেবার ভাবধারা নেই। কুরআনে আল্লাহ শুধুমাত্র সতর্কবাণী উচ্চারণ বা নির্ভেজাল ভীতিপ্রদর্শনের পথ অবলম্বন করেননি; কঠোরতম হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন এবং তিরস্কার ও নিন্দাবাদের মধ্যেও তিনি বুঝাবার ও নসীহত করার ক্ষেত্রে কোন কমতি রাখেননি। এ জন্যই এ সূরায়ও একদিকে তাওহীদের যুক্তি-প্রমাণের প্রতি সংক্ষেপে ইংগিত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে আদম ও ইবলীসের কাহিনী শুনিয়ে উপদেশ দানের কার্যও সমাধা করা হয়েছে।

আয়াত ৯৯	সূরা আল হিজ্‌র – মক্কী	রুকূ' ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ①
رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ② ذَرْهُمْ
يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ③ وَمَآ اَهْلَكْنَا
مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا
وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑤

আলিফ–লাম–র। এগুলো আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।[১]

এমন এক সময় আসা বিচিত্র নয় যখন আজ যারা (ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে) অস্বীকার করছে, তারা অনুশোচনা করে বলবে ঃ হায়, যদি আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিতাম! ছেড়ে দাও এদেরকে, খানাপিনা করুক, আমোদ ফূর্তি করুক এবং মিথ্যা প্রত্যাশা এদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। শিগ্‌গির এরা জানতে পারবে। ইতিপূর্বে আমি যে জনবসতিই ধ্বংস করেছি তার জন্য একটি বিশেষ কর্ম–অবকাশ লেখা হয়ে গিয়েছিল।[২] *কোন জাতি তার নিজের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যেমন ধ্বংস হতে পারে না, তেমনি সময় এসে যাওয়ার পরে অব্যাহতিও পেতে পারে না।*

১. এটি এ সূরার সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক ভূমিকা। এরপর সাথে সাথেই আসল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাষণ শুরু হয়ে গেছে।

"সুস্পষ্ট" শব্দটি কুরআনের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এগুলো এমন এক কুরআনের আয়াত যে নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বলে দেয়।

২. এর মানে হচ্ছে, কুফরী করার সাথে সাথেই আমি কখনো কোন জাতিকে পাকড়াও করিনি। তাহলে এই নির্বোধরা কেন এ ভুল ধারণা করছে যে, নবীকে তারা

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٦ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٩

এরা বলে, "ওহে যার প্রতি বাণী[৩] অবতীর্ণ হয়েছে,[৪] তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদ! যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে আনছো না কেন?" —আমি ফেরেশতাদেরকে এমনিই অবতীর্ণ করি না, তারা যখনই অবতীর্ণ হয় সত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়, তারপর লোকদেরকে আর অবকাশ দেয়া হয়না।[৫] আর এই বাণী, একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[৬]

যেভাবে মিথ্যা বলছে এবং ঠাট্টা–বিদ্রূপ করছে, তাতে যেহেতু এখনো তাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি, তাই এ নবী আসলে কোন নবীই নয়? আমার নিয়ম হচ্ছে, প্রত্যেক জাতিকে শুনবার, বুঝবার ও নিজেকে শুধরে নেবার জন্য কি পরিমাণ অবকাশ দেয়া হবে এবং তার যাবতীয় দুষ্কৃতি ও অনাচার সত্বেও পূর্ণ ধৈর্য সহকারে তাকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার কতটুকু সুযোগ দেয়া হবে তা আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে নিই। যতক্ষণ এ অবকাশ থাকে এবং আমার নির্ধারিত শেষ সীমা না আসে ততক্ষণ আমি ঢিল দিতে থাকি। (কর্মের অবকাশ দেবার ব্যাপারটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা ইবরাহীমের ১৮ টীকা দেখুন।)

৩. "যিকির" বা বাণী শব্দটি পারিভাষিক অর্থে কুরআন মজীদে আল্লাহর বাণীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ বাণী হচ্ছে আগাগোড়া উপদেশমালায় পরিপূর্ণ। পূর্ববর্তী নবীদের ওপর যতগুলো কিতাব নাযিল হয়েছিল সেগুলো সবই "যিকির" ছিল এবং এ কুরআন মজীদও যিকির। যিকিরের আসল মানে হচ্ছে স্মরণ করিয়ে দেয়া, সতর্ক করা এবং উপদেশ দেয়া।

৪. তারা ব্যংগ ও উপহাস করে একথা বলতো। এ বাণী যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হয়েছে একথা তারা স্বীকারই করতো না। আর একথা স্বীকার করে নেয়ার পর তারা তাঁকে পাগল বলতে পারতো না। আসলে তাদের একথা বলার অর্থ ছিল এই যে, "ওহে, এমন ব্যক্তি! যার দাবী হচ্ছে, আমার ওপর যিকির তথা আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।'' এটা ঠিক তেমনি ধরনের কথা যেমন ফেরাউন হযরত মূসার (আ) দাওয়াত শুনার পর তার সভাসদদের বলেছিল ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি অতীতের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের কাছে কোন রসূল এসেছে এবং তারা তাকে বিদ্রূপ করেনি, এমনটি কখনো হয়নি। এ বাণীকে অপরাধীদের অন্তরে আমি এভাবেই (লৌহ শলাকার মত) প্রবেশ করাই। তারা এর প্রতি ঈমান আনে না।[৭] এ ধরনের লোকদের এ রীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। যদি আমি তাদের সামনে আকাশের কোন দরজা খুলে দিতাম এবং তারা দিন দুপুরে তাতে আরোহণও করতে থাকতো তবুও তারা একথাই বলতো, আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে বরং আমাদের ওপর যাদু করা হয়েছে।

إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

"এই যে পয়গম্বর সাহেবকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, এর মাথা ঠিক নেই।"

৫. অর্থাৎ নিছক তামাশা দেখাবার জন্য ফেরেশতাদেরকে অবতরণ করানো হয় না। কোন জাতি দাবী করলো, ডাকো ফেরেশতাদেরকে আর অমনি ফেরেশতারা হাযির হয়ে গেলেন, এমনটি হয় না। কারণ ফেরেশতারা এ জন্য আসেন না যে, তারা লোকদের সামনে সত্যকে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং গায়েবের পর্দা চিরে এমন সব জিনিস দেখিয়ে দেবেন যার প্রতি ঈমান আনার জন্য নবীগণ দাওয়াত দিয়েছেন। যখন কোন জাতির শেষ সময় উপস্থিত হয় এবং তার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা করার সংকল্প করে নেয়া হয় তখনই ফেরেশতাদেরকে পাঠানো হয়। তখন কেবলমাত্র ফায়সালা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়। তখন আর একথা বলা হয় না যে, এখন ঈমান আনলে ছেড়ে দেয়া হবে। যতক্ষণ সত্য আবরণ মুক্ত না হয়ে যায়, কেবল ততক্ষণ পর্যন্তই ঈমান আনার অবকাশ থাকে। তার আবরণ মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর আর ঈমান আনার কি অর্থ থাকে?

"সত্য সহকারে অবতীর্ণ হওয়ার" মানে হচ্ছে সত্য নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ তারা মিথ্যাকে মিটিয়ে দিয়ে তার জায়গায় সত্যকে কায়েম করার জন্যই আসেন। অথবা অন্য

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

আকাশে আমি অনেক মজবুত দূর্গ নির্মাণ করেছি,[৮] দর্শকদের জন্য সেগুলো সুসজ্জিত করেছি,[৯] এবং প্রত্যেক অতিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সংরক্ষণ করেছি।[১০] কোন শয়তান সেখানে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, তবে আড়ি পেতে বা চুরি করে কিছু শুনতে পারে।[১১] আর যখন সে চুরি করে শোনার চেষ্টা করে তখন একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তাকে ধাওয়া করে।[১২]

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি, তার মধ্যে পাহাড় স্থাপন করেছি, সকল প্রজাতির উদ্ভিদ তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করেছি[১৩] এবং তার মধ্যে জীবিকার উপকরণাদি সরবরাহ করেছি তোমাদের জন্যও এবং এমন বহু সৃষ্টির জন্যও যাদের আহারদাতা তোমরা নও।

কথায় বুঝে নিন, তারা আল্লাহর ফায়সালা নিয়ে আসেন এবং তা প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হন।

৬. অর্থাৎ এই বাণী, যার বাহককে তোমরা পাগল বলছো, আমিই তা অবতীর্ণ করেছি, তিনি নিজে তা তৈরী করেননি। তাই এ গালি তাকে দেয়া হয়নি বরং আমাকে দেয়া হয়েছে। আর তোমরা যে এ বাণীর কিছু ক্ষতি করতে পারবে তা ভেব না। এটি সরাসরি আমার হেফাজতে রয়েছে। তোমাদের চেষ্টায় একে বিলুপ্ত করা যাবে না। তোমরা একে ধামাচাপা দিতে চাইলেও দিতে পারবে না। তোমাদের আপত্তি ও নিন্দাবাদের ফলে এর মর্যাদাও কমে যাবে না। তোমরা ঠেকাতে চাইলেও এর দাওয়াতকে ঠেকাতে পারবে না। একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার সুযোগও তোমরা কেউ কোনদিন পাবে না।

৭. সাধারণত অনুবাদক ও তাফসীরকারগণ نَسْلُكُهُ (আমি তাকে প্রবেশ করাই বা চালাই) এর মধ্যকার সর্বনামটিকে استهزاء (বিদ্রূপ) এর সাথে এবং لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

(তারা এর প্রতি ঈমান আনে না) এর মধ্যকার সর্বনামটিকে ذكر এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। তারা এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমি এভাবে এ বিদ্রূপকে অপরাধীদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেই এবং তারা এ বাণীর প্রতি ঈমান আনে না।" যদিও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এতে কোন ত্রুটি নেই, তবুও ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী উভয় সর্বনামই "যিকির" বা বাণীর সাথে সংযুক্ত হওয়াই আমার কাছে বেশী নির্ভুল বলে মনে হয়।

আরবী ভাষায় سَلَكَ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া, অনুপ্রবেশ করানো, চালিয়ে দেয়া বা গলিয়ে দেয়া। যেমন সুঁইয়ের ছিদ্রে সূতো গলিয়ে দেয়া হয়। কাজেই এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ঈমানদারদের মধ্যে তো এই "বাণী" হৃদয়ের শীতলতা ও আত্মার খাদ্য হয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু অপরাধীদের অন্তরে তা বারুদের মত আঘাত করে এবং তা শুনে তাদের মনে এমন আগুন জ্বলে ওঠে যেন মনে হয় একটি গরম শলাকা তাদের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

৮. আরবী ভাষায় দূর্গ, প্রাসাদ ও মজবুত ইমারতকে বুরুজ বলা হয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় সূর্যের পরিভ্রমণ পথকে যে বারটি স্তরে বা রাশিচক্রে বিভক্ত করা হয়েছিল 'বুরুজ' শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে সেই বারটি স্তরের জন্য ব্যবহার করা হতো। এ কারণে কুরআন ঐ বুরুজগুলোর দিকে ইংগিত করেছে বলে কোন কোন মুফাস্‌সির মনে করেছেন। আবার কোন কোন মুফাস্‌সির এটিকে গ্রহ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হবে, এর অর্থ সম্ভবত উর্ধ জগতের এমন সব অংশ যার মধ্যকার প্রত্যেকটি অংশকে অত্যন্ত শক্তিশালী সীমান্ত অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করে রেখেছে। যদিও এ সীমান্তরেখা মহাশূন্যে অদৃশ্যভাবে অংকিত হয়ে আছে তবুও সেগুলো অতিক্রম করে কোন জিনিসের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়া খুবই কঠিন। এ অর্থের প্রেক্ষিতে আমি বুরুজ শব্দটিকে সংরক্ষিত অঞ্চলসমূহ (Fortified spheres) অর্থে গ্রহণ করা অধিকতর নির্ভুল বলে মনে করি।

৯. অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলে কোন না কোন উজ্জ্বল গ্রহ বা তারকা রেখে দিয়েছেন এবং এভাবে সমগ্র জগত ঝলমলিয়ে উঠেছে। অন্য কথায়, আমি দৃশ্যত কুলকিনারাহীন এ বিশ্ব জগতকে একটি বিশাল পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ি বানিয়ে রেখে দেইনি। বরং তাকে এমন একটি সুন্দর সুসজ্জিত জগত বানিয়ে রেখেছি যার মধ্যে সর্বত্র সব দিকে নয়নাভিরাম দীপ্তি ছড়িয়ে রয়েছে। এ শিল্পকর্মে শুধুমাত্র একজন মহান কারিগরের অতুলনীয় শিল্প নৈপুণ্য এবং একজন মহাবিজ্ঞানীর অনুপম বৈজ্ঞানিক কুশলতাই দৃষ্টিগোচর হয় না বরং এই সংগে একজন অতীব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী শিল্পীর শিল্পও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিষয়বস্তুটিই অন্য এক স্থানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ الَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ (আল্লাহ, যে জিনিসই বানিয়েছেন, চমৎকার বানিয়েছেন।) আস-সাজদাহ ঃ ৭।

১০. অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টি যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বন্দী হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনি জিন বংশোদ্ভূত শয়তানরাও এ অঞ্চলে বন্দী হয়ে রয়েছে। উর্ধ জগতে পৌঁছুবার ক্ষমতা তাদের নেই। এর মাধ্যমে মূলত লোকদের একটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করাই উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল এবং আজো আছে। তারা মনে করে,

শয়তান ও তার সাংগপাংগদের জন্য সারা বিশ্ব জাহানের দরজা খোলা আছে, যত দূর ইচ্ছা তারা যেতে পারে। কুরআন এর জবাবে বলছে, শয়তানরা একটি বিশেষ সীমানা পর্যন্তই যেতে পারে, তার ওপরে আর যেতে পারে না। তাদেরকে কখনোই সীমাহীন উড্ডয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

১১. অর্থাৎ যেসব শয়তান তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোশকদেরকে গায়েবের খরব এনে দেবার চেষ্টা করে থাকে, যাদের সাহায্যে অনেক জ্যোতিষী, গণক ও ফকির–বেশী বহুরূপী অদৃশ্য জ্ঞানের ভড়ং দেখিয়ে থাকে, গায়েবের খবর জানার কোন একটি উপায়–উপকরণও আসলে তাদের আয়ত্বে নেই। তারা চুরি–চামারি করে কিছু শুনে নেবার চেষ্টা অবশ্যি করে থাকে। কারণ তাদের গঠনাকৃতি মানুষের তুলনায় ফেরেশতাদের কিছুটা কাছাকাছি কিন্তু আসলে তাদের কপালে শিকে ছেঁড়ে না।

১২. شهاب مبين এর আভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল আগুনের শিখা। কুরআনের অন্য জায়গায় এজন্য شهاب ثاقب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, অন্ধকার বিদীর্ণকারী অগ্নি–স্ফুলিংগ। এর মানে যে, আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত নক্ষত্র হতে হবে, যাকে আমাদের পরিভাষায় "উল্‌কা পিণ্ড" বলা হয়, তেমন কোন কথা নেই। এটা হয়তো অন্য কোন ধরনের রশ্মি হতে পারে। যেমন মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays) অথবা এর চেয়েও তীব্র ধরনের অন্য কিছু, যা এখনো আমাদের জ্ঞানের আওতার বাইরে রয়ে গেছে। আবার এ উল্‌কা পিণ্ডও হতে পারে, যাকে আমরা মাঝে মধ্যে আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে দেখি। বর্তমানকালের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে যেসব উল্‌কা ছুটে আসতে দেখা যায় তার সংখ্যা হবে প্রতিদিন এক লক্ষ কোটি। এর মধ্য থেকে প্রায় ২ কোটি প্রতিদিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। তার মধ্য থেকে কোন রকমে একটা ভূ–পৃষ্ঠে পৌঁছে। মহাশূন্যে এদের গতি হয় কমবেশী প্রতি সেকেণ্ডে ২৬ মাইল এবং কখনো কখনো তা প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইলেও পৌঁছে যায়। অনেক সময় খালি চোখেও অস্বাভাবিক উল্‌কা বৃষ্টি দেখা যায়। পুরাতন রেকর্ড থেকে জানা যায়, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর উত্তর আমেরিকার পূর্ব এলাকায় শুধুমাত্র একটিস্থানে মধ্য রাত্র থেকে প্রভাত পর্যন্ত ২ লক্ষ উল্‌কা পিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গিয়েছিল। (ইনসাই–ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৪৬, ১৫ খণ্ড, ৩৩৭–৩৯ পৃঃ) হয়তো এই উল্‌কা বৃষ্টিই উর্ধ জগতের দিকে শয়তানদের উড্ডয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ পৃথিবীর উর্ধ সীমানা পার হয়ে মহাশূন্যে প্রতিদিন এক লক্ষ কোটি উল্‌কাপাত তাদের জন্য মহাশূন্যের ঐ এলাকাকে সম্পূর্ণরূপে অনতিক্রম্য বানিয়ে দিয়ে থাকবে।

এখানে উপরে যে সংরক্ষিত দূর্গগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলোর ধরন সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে মহাশূন্য একেবারে পরিষ্কার। এর মধ্যে কোথাও কোন দেয়াল বা ছাদ দেখা যায় না। কিন্তু আল্লাহ এ মহাশূন্যের বিভিন্ন অংশকে এমন কিছু অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছেন যা এক অংশের বিপদ ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে অন্য অংশকে সংরক্ষিত করে রাখে। এ দেয়ালগুলোর বদৌলতেই প্রতিদিন গড়ে যে এক লক্ষ কোটি উল্‌কা পিণ্ড পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তা সব পথেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং মাত্র একটি এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়তে সক্ষম হয়। পৃথিবীতে উল্‌কা পিণ্ডের

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾
وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ
وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ
الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

এমন কোন জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি।[১৪]

বৃষ্টিবাহী বায়ু আমিই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে নেই।

জীবন ও মৃত্যু আমিই দান করি এবং আমিই হবো সবার উত্তরাধিকারী।[১৫]

তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে আমি দেখে রেখেছি এবং পরবর্তী আগমনকারীরাও আমার দৃষ্টি সমক্ষে আছে। অবশ্যি তোমার রব তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি জ্ঞানময় ও সবকিছু জানেন।[১৬]

যেসব নমুনা দুনিয়ার বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওজন ৬৪৫ পাউণ্ড। এ পাথরটি ওপর থেকে পড়ে মাটির মধ্যে ১১ ফুট গভীরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও এক জায়গায় ৩৬ $\frac{১}{২}$ টনের একটি লোহার স্তূপ পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে আকাশ থেকে এ লোহা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ ছাড়া সেখানে এর স্তূপাকার অস্তিত্বের কোন কারণই তারা খুঁজে পাননি। চিন্তা করুন পৃথিবীর উর্ধ সীমানাকে যদি মজবুত দেয়ালের মাধ্যমে সংরক্ষিত না করা হতো তাহলে এসব উল্‌কাপাতে পৃথিবীর কী অবস্থা হতো! এ দেয়ালগুলোকেই কুরআনে বুরুজ (সংরক্ষিত দুর্গ) বলা হয়েছে।

১৩. এর মাধ্যমে আল্লাহর কুদ্‌রত, শক্তিমত্তা ও জ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উদ্ভিদের প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা এত বেশী যে, তার যদি শুধু একটি মাত্র তারাকে দুনিয়ায় বংশ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর চতুরদিকে শুধু তারই চারা দেখা যাবে, অন্যকোন উদ্ভিদের জন্য আর কোন জায়গা খালি থাকবে না। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী ও অসীম শক্তিধরের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ এ বিশ্ব চরাচরে

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

৩ রুকূ'

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠন্ঠনে পচা মাটি থেকে।[১৭] আর এর আগে জিনদের সৃষ্টি করেছি আগুনের শিখা থেকে।[১৮] তারপর তখনকার কথা স্মরণ করো যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি শুকনো ঠন্ঠনে পচা মাটি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে পূর্ণ অবয়ব দান করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো[১৯] তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদাবনত হয়ো। সেমতে সকল ফেরেশতা একযোগে তাকে সিজ্দা করলো, ইবলীস ছাড়া, কারণ সে সিজ্দাকারীদের অন্তরভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।[২০]

উৎপন্ন হচ্ছে। প্রত্যেক প্রজাতির উৎপাদন একটি বিশেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর থেমে যায়। এ প্রক্রিয়ার আর একটি দিক হচ্ছে, প্রত্যেক প্রজাতির উদ্ভিদের আয়তন, বিস্তৃতি, উচ্চতা ও বিকাশের একটি সীমা নির্ধারিত আছে। কোন উদ্ভিদ এ সীমা অতিক্রম করতে পারে না। পরিষ্কার জানা যায়, প্রতিটি বৃক্ষ, চারা ও লতাপাতার জন্য কেউ শরীর, উচ্চতা, আকৃতি, পাতা, ফুল, ফল ও উৎপাদনের একটি মাপাজোকা পরিমাণ পুরোপুরি হিসেব ও গণনা করে নির্ধারিত করে দিয়েছে।

১৪. এখানে এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে যে, সীমিত ও পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির এই নিয়ম কেবল উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বায়ু, পানি, আলো, শীত, গ্রীষ্ম, জীব, জড়, উদ্ভিদ তথা প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি প্রজাতি, প্রত্যেকটি শ্রেণী ও প্রত্যেকটি শক্তির জন্য একটি সীমা নির্ধারিত রয়েছে। তার মধ্যে তারা অবস্থান করছে। তাদের জন্য একটি পরিমাণও নির্ধারিত রয়েছে, তার চাইতে তারা কখনো বাড়েও না আবার কমেও না। এই নির্ধারিত অবস্থা এবং পরিপূর্ণ প্রজ্ঞামূলক নির্ধারিত অবস্থার বদৌলতেই পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় এই ভারসাম্য, সমন্বয় ও পারিপাট্য দেখা যাচ্ছে। এই বিশ্ব জাহানটি যদি একটি আকস্মিক ঘটনার ফসল হতো অথবা বহু খোদার কর্মকুশলতা ও কর্মতৎপরতার

ফল হতো, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অসংখ্য বস্তু ও শক্তির মধ্যে এই পর্যায়ের পূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা কেমন করে সম্ভব হতো?

১৫. অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংসের পরে একমাত্র আমিই টিকে থাকবো। তোমরা যা কিছু পেয়েছো, ওগুলো নিছক সাময়িকভাবে ব্যবহার করার জন্য পেয়েছো। শেষ পর্যন্ত আমার দেয়া সব জিনিস ত্যাগ করে তোমরা এখান থেকে বিদায় নেবে একেবারে খালি হাতে এবং এসব জিনিস যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি আমার ভাণ্ডারে থেকে যাবে।

১৬. অর্থাৎ তার অপার কর্মকুশলতা ও প্রজ্ঞার বলেই তিনি সবাইকে একত্র করবেন। আবার তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তার নাগালের বাইরে কেউ নেই। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন মানুষের মাটি হয়ে যাওয়া দেহের একটি কণাও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে দূরবর্তী বা অবাস্তব মনে করে সে মূলত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কুশলতা সম্পর্কেই বেখবর। আর যে ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "মরার পরে যখন আমাদের মৃত্তিকার বিভিন্ন অণু–কণিকা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের কিভাবে পুনর্বার জীবিত করা হবে," সে আসলে আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ।

১৭. এখানে কুরআন পরিষ্কার করে একথা বলে দিচ্ছে যে, মানুষ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশুত্বের পর্যায় অতিক্রম করে মানবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদে প্রভাবিত আধুনিক যুগের কুরআনের ব্যাখ্যাতাগণ একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বরং কুরআন বলছে, সরাসরি মৃত্তিকার উপাদান থেকে তার সৃষ্টিকর্ম শুরু হয়। صلصال من حما مسنون (শুক্‌নো ঠন্‌ঠনে পচা মাটি) শব্দাবলীর মাধ্যমে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে। حما বলতে আরবী ভাষায় এমন ধরনের কালো কাদা মাটিকে বুঝায় যার মধ্যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাকে আমরা নিজেদের ভাষায় পংক বা পাঁক বলে থাকি অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যা মাটির গোলা বা মণ্ড হয়ে গেছে। مسنون শব্দের দুই অর্থ হয়। একটি অর্থ, পরিবর্তিত, অর্থাৎ এমন পচা, যার মধ্যে পচন ধরার ফলে চক্‌চকে ও তেলতেলে ভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অর্থ, চিত্রিত। অর্থাৎ যা একটা নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে। صلصال বলা হয় এমন পচা কাদাকে যা শুকিয়ে যাওয়ার পর ঠন্‌ঠন করে বাজে। এ শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, গাঁজানো কাদা মাটির গোলা বা মণ্ড থেকে প্রথমে একটি পুতুল বানানো হয় এবং পুতুলটি তৈরী হবার পর যখন শুকিয়ে যায় তখন তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দেয়া হয়।

১৮. سموم বলা হয় গরম বাতাসকে। আর আগুনকে সামুমের সাথে সংযুক্ত করার ফলে এর অর্থ আগুনের পরিবর্তে হয় প্রখর উত্তাপ। কুরআনের যেসব জায়গায় জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াত থেকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে যায়। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আর রহমান, টীকা ঃ ১৪–১৬)

১৯. এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয় অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করা হয় তা মূলত আল্লাহর গুণাবলীর একটি প্রতিচ্ছায়া। জীবন, জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ, সংকল্প এবং অন্যান্য যতগুলো গুণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়, যেগুলোর সমষ্টির নাম প্রাণ—সেসবই আসলে আল্লাহরই গুণাবলীর একটি প্রতিচ্ছায়া। মানুষের মাটির দেহ–

قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "হে ইবলীস! তোমার কি হলো, তুমি সিজ্‌দাকারীদের অন্তরভুক্ত হলে না?" সে জবাব দিল, "এমন একটি মানুষকে সিজ্‌দা করা আমার মনোপূত নয় যাকে তুমি শুক্‌নো ঠন্‌ঠনে পচা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো।" আল্লাহ বললেন, "তবে তুমি বের হয়ে যাও এখান থেকে, কেননা, তুমি ধিকৃত। আর এখন কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার ওপর অভিসম্পাত!"[২১] সে আরয করলো, "হে আমার রব! যদি তাই হয়, তাহলে সেই দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও যেদিন সকল মানুষকে পুনর্বার উঠানো হবে।" বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো সেদিন পর্যন্ত যার সময় আমার জানা আছে।" সে বললো, "হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো,[২২] তবে এদের মধ্য থেকে তোমার যেসব বান্দাকে তুমি নিজের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছো তাদের ছাড়া।"

কাঠামোটির ওপর এ প্রতিচ্ছায়া ফেলা হয়। আর এ প্রতিচ্ছায়ার কারণেই মানুষ এ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং ফেরেশতাগণসহ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি তাকে সিজদা করেছে।

আসলে তো সৃষ্টির মধ্যে যেসব গুণের সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিরই উৎস ও উৎপত্তিস্থল আল্লাহরই কোন না কোন গুণ। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝٤١ إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝٤٢ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝٤٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۚ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝٤٤

বললেন, "এটিই আমার নিকট পৌঁছুবার সোজা পথ।[২৩] অবশ্যি যারা আমার প্রকৃত বান্দা হবে তাদের ওপর তোমার কোন জোর খাটবে না। তোমার জোর খাটবে শুধুমাত্র এমন বিপথগামীদের ওপর যারা তোমার অনুসরণ করবে[২৪] এবং তাদের সবার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তির অংগীকার।"[২৫]

এ জাহান্নাম (ইবলীসের অনুসারীদের জন্য যার শাস্তির অংগীকার করা হয়েছে) সাতটি দরজা বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।[২৬]

جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَّاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَّلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيْبَهُ - (بخارى ، مسلم)

"মহান আল্লাহ রহমতকে একশো ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর এর মধ্য থেকে ৯৯টি অংশ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র একটি অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি মাত্র অংশের বরকতেই সমুদয় সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। এমনকি যদি একটি প্রাণী তার নিজের সন্তান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ জন্য তার ওপর থেকে নিজের নখর উঠিয়ে নেয় তাহলে এটিও আসলে এ রহমত গুণের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।"—(বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া যে ধরনের পূর্ণতার সাথে মানুষের ওপর ফেলা হয় অন্য কোন প্রাণীর ওপর তেমনভাবে ফেলা হয়নি। এ জন্যই অন্যান্য সৃষ্টির ওপর মানুষের এ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। এটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সামান্যতম ভ্রান্তি মানুষকে এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে যার ফলে সে আল্লাহর গুণাবলীর একটি অংশ লাভ করাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কোন অংশ লাভ করার সমার্থক মনে করতে পারে। অথচ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সামান্যতম অংশ লাভ করার কথাও কোন সৃষ্টির জন্য কল্পনাই করা যায় না।

২০. তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য সূরা বাকারার ৪ রুকূ', সূরা নিসার ১৮ রুকূ' এবং সূরা আরাফের ২ রুকূ দেখুন। তাছাড়া এসব জায়গায় আমি যে টীকাগুলো লিখেছি সেগুলোও একটু সামনে রাখলে ভাল হয়।

২১. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুমি অভিশপ্ত থাকবে। তারপর যখন প্রতিফল দিবস কায়েম হবে তখন তোমাকে তোমার নাফরমানির শাস্তি দেয়া হবে।

২২. অর্থাৎ যেভাবে তুমি এ নগণ্য ও হীন সৃষ্টিকে সিজ্‌দা করার হুকুম দিয়ে আমাকে তোমার হুকুম অমান্য করতে বাধ্য করেছো ঠিক তেমনিভাবে এ মানুষদের জন্য আমি দুনিয়াকে এমন চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর জিনিসে পরিণত করে দেবো যার ফলে তারা সবাই এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে তোমার নাফরমানী করতে থাকবে। অন্য কথায়, ইবলীসের উদ্দেশ্য ছিল, সে পৃথিবীর জীবন এবং তার সুখ–আনন্দ ও ক্ষণস্থায়ী আরাম–আয়েশ ও ভোগ–বিলাসকে মানুষের জন্য এমন চমকপ্রদ ও সুদৃশ্য করে তুলবে যার ফলে সে খিলাফত ও তার দায়িত্বসমূহ এবং পরকালের জবাবদিহির কথা ভুলে যাবে, এমনকি আল্লাহকেও ভুলে যাবে অথবা স্মরণ রাখা সত্ত্বেও তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

২৩. هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ আমি অনুবাদে অবলম্বন করেছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে একথা ঠিক, আমি এটা মেনে চলবো।

২৪. এ বাক্যেরও দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ আমি অনুবাদে অবলম্বন করেছি। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমার বান্দাদের (অর্থাৎ সাধারণ মানুষদের) ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। তুমি তাদেরকে জবরদস্তি নাফরমান বানাতে পারবে না। তবে যারা নিজেরাই বিভ্রান্ত হবে এবং নিজেরাই তোমার অনুসরণ করতে চাইবে তাদেরকে তোমার পথে চলার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। তোমার পথ থেকে তাদেরকে আমি জোর করে বিরত রাখার চেষ্টা করবো না।

প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হবেঃ বন্দেগীর পথই হচ্ছে আল্লাহর কাছে পৌঁছুবার সোজা পথ। যারা এ পথ অবলম্বন করবে তাদের ওপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব চলবে না। আল্লাহ তাদেরকে নিজের জন্য একান্তভাবে গ্রহণ করে নেবেন। আর শয়তান নিজেও স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, তারা তার ফাঁদে পা দেবে না। তবে যারা নিজেরাই বন্দেগীর পথ থেকে সরে এসে নিজেদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলবে তারা ইবলীসের শিকারে পরিণত হবে এবং ইবলীস তাদেরকে প্রতারিত করে যেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে তারা তার পেছনে সেদিকেই বিভ্রান্তের মত ছুটে বেড়াতে বেড়াতে দূরে—বহু দূরে চলে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বক্তব্যের সার সংক্ষেপ হবেঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান তার যে কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এই যে, সে পৃথিবীর জীবনকে মানুষের জন্য সুদৃশ্য ও সুশোভিত করে তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে গাফিল ও বন্দেগীর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আল্লাহ তার এই কর্মপদ্ধতির স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, এ শর্ত আমি মেনে নিয়েছি এবং এর আরো ব্যাখ্যা করে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তোমাকে কেবলমাত্র ধোঁকা দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে, তাদের হাত ধরে জোর করে

নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে না। আল্লাহ তাঁর যেসব বান্দাকে নিজের একনিষ্ঠ বান্দা করে নিয়েছেন শয়তান তাদের নাম নিজের খাতায় রাখেনি। এ থেকে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল যে, সম্ভবত কোন যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই আল্লাহ ইচ্ছামতো যাকে চাইবেন নিজের একনিষ্ঠ বান্দা করে নেবেন এবং সে শয়তানের হাত থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ একথা বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেই বিভ্রান্ত হবে সে–ই তোমার অনুসারী হবে। অন্য কথায়, যে বিভ্রান্ত হবে না সে তোমার অনুসরণ করবে না এবং সে–ই হবে আমার বিশেষ বান্দা, যাকে আমি একান্ত করে নেব।

২৫. এখানে এ ঘটনাটি যে উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য পূর্বাপর আলোচনা পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একটি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। সেটি হচ্ছে ঃ এ বর্ণনা ধারায় আদম ও ইবলীসের এ কাহিনী বর্ণনা করার পেছনে একটি উদ্দেশ্য কাজ করছে। অর্থাৎ কাফেরদেরকে এ সত্যটি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া এর উদ্দেশ্য যে, তোমরা নিজেদের আদি শত্রু শয়তানের ফাঁদে পড়ে গেছো এবং সে নিজের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য তোমাদের যে হীনতার গর্তে নামিয়ে দিতে চায় তোমরা তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছো। পক্ষান্তরে এ নবী তোমাদের এ ফাঁদ থেকে উদ্ধার করে উন্নতির সেই উচ্চ শিখরের দিকে নিয়ে যেতে চান যা আসলে মানুষ হিসেবে তোমাদের স্বাভাবিক অবস্থান স্থল। কিন্তু তোমরা অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছো। নিজেদের শত্রুকে বন্ধু এবং কল্যাণকামীকে তোমরা শত্রু মনে করছো।

এই সংগে এ সত্যটিও এ কাহিনীর মাধ্যমে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, তোমাদের জন্য একটি মাত্র মুক্তির পথ রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী করা। এ পথ পরিহার করে তোমরা যে পথেই চলবে তা হবে শয়তানের পথ এবং সে পথটি চলে গেছে সোজা জাহান্নামের দিকে।

এ কাহিনীর মাধ্যমে তৃতীয় যে কথাটি বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের এ ভুলের জন্য দায়ী। শয়তানের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে এর বেশী আর কিছু নয় যে, সে দুনিয়ার বাহ্যিক জীবনোপকরণের সাহায্যে ধোঁকা দিয়ে তোমাদের আল্লাহর বন্দেগীর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। তার ধোঁকায় পড়ে যাওয়া তোমাদের নিজেদের ত্রুটি। এর কোন দায়–দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের ছাড়া আর কারোর ওপর বর্তায় না।

(এ ব্যাপারে আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা ইবরাহীম ২২ আয়াত ও ৩১ টীকা দেখুন)।

২৬. যেসব গোমরাহী ও গোনাহের পথ পাড়ি দিয়ে মানুষ নিজের জন্য জাহান্নামের পথের দরজা খুলে নেয় সেগুলোর প্রেক্ষিতে জাহান্নামের এ দরজাগুলো নির্ধারিত হয়েছে। যেমন কেউ নাস্তিক্যবাদের পথ পাড়ি দিয়ে জাহান্নামের দিকে যায়। কেউ যায় শিরকের পথ পাড়ি দিয়ে, কেউ মুনাফিকীর পথ ধরে, কেউ প্রবৃত্তি পূজা, কেউ অশ্লীলতা ও ফাসেকী, কেউ জুলুম, নিপীড়ন ও নিগ্রহ, আবার কেউ ভ্রষ্টতার প্রচার ও কুফরীর প্রতিষ্ঠা এবং কেউ অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের প্রচারের পথ ধরে জাহান্নামের দিকে যায়।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

৪ রুকূ'

অন্যদিকে মুত্তাকীরা[২৭] থাকবে বাগানে ও নির্ঝরিণীসমূহে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এগুলোতে প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে। তাদের মনে যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকবে তা আমি বের করে দেবো,[২৮] তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে। সেখানে তাদের না কোন পরিশ্রম করতে হবে আর না তারা সেখান থেকে বহিস্কৃত হবে।[২৯]

হে নবী! আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। কিন্তু এ সংগে আমার আযাবও ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক।

২৭. অর্থাৎ যারা শয়তানের পদানুসরণ থেকে দূরে থেকেছে এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বন্দেগী ও দাসত্বের জীবন যাপন করেছে।

২৮. অর্থাৎ সৎ লোকদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির কারণে দুনিয়ার জীবনে যদি কিছু মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তা দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পরের পক্ষ থেকে তাদের মন একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা আরাফের ৩২ টীকা দেখুন)।

২৯. নিম্নলিখিত হাদীস থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন ঃ

يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا وَلَا تَمْرَضُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا وَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَلَا تَظْعَنُوا أَبَدًا –

অর্থাৎ "জান্নাতবাসীদেরকে বলে দেয়া হবে, এখন তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। এখন তোমরা চিরকাল জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না। এখন তোমরা চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। এখন তোমরা হবে চির অবস্থানকারী, কখনো স্থান ত্যাগ করতে হবে না"

وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ؕ
قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾
قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلٰٓى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنٰكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَّقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ
إِلَّا الضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوٓا إِنَّآ
أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّآ اٰلَ لُوطٍ ؕ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾

আর তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী একটু শুনিয়ে দাও।[৩০] যখন তারা এলো তার কাছে এবং বললো, "সালাম তোমার প্রতি" সে বললো, "আমরা তোমাদের দেখে ভয় পাচ্ছি।"[৩১] তারা জবাব দিল, "ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাকে এক পরিণত জ্ঞান সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।"[৩২] ইবরাহীম বললো, "তোমরা কি বার্ধক্যাবস্থায় আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছো? একটু ভেবে দেখো তো এ কোন্ ধরনের সুসংবাদ তোমরা আমাকে দিচ্ছো?" তারা জবাব দিল, "আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি, তুমি নিরাশ হয়ো না।" ইবরাহীম বললো, "পথভ্রষ্ট লোকেরাই তো তাদের রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়।" তারপর ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর প্রেরিতরা! তোমরা কোন্ অভিযানে বের হয়েছো?"[৩৩] তারা বললো, "আমাদের একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের দিকে পাঠানো হয়েছে।[৩৪] শুধুমাত্র লূতের পরিবর্গ এর অন্তরভুক্ত নয়। তাদের সবাইকে আমরা বাঁচিয়ে নেবো, তার স্ত্রী ছাড়া, যার জন্য (আল্লাহ বলেন ঃ) আমি স্থির করেছি, সে পেছনে অবস্থানকারীদের সাথে থাকবে"।

এর আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এমন সব আয়াত ও হাদীস থেকে যেগুলোতে বলা হয়েছে জান্নাতে নিজের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য মানুষকে কোন শ্রম করতে হবে না। বিনা প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রম ছাড়াই সে সবকিছু পেয়ে যাবে।

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۣالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰۤؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

৫ রুকূ’

প্রেরিতরা যখন লূতের পরিবারের কাছে পৌঁছুলো[৩৫] তখন সে বললো, “আপনারা অপরিচিত মনে হচ্ছে।”[৩৬] তারা জবাব দিল, “না, বরং আমরা তাই এনেছি যার আসার ব্যাপারে এরা সন্দেহ করছিল। আমরা তোমাকে যথার্থই বলছি, আমরা সত্য সহকারে তোমার কাছে এসেছি। কাজেই এখন তুমি কিছু রাত থাকতে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে যাও এবং তুমি তাদের পেছনে পেছনে চলো।[৩৭] তোমাদের কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়।[৩৮] ব্যাস, সোজা চলে যাও যেদিকে যাবার জন্য তোমাদের হুকুম দেয়া হচ্ছে।” আর তাকে আমি এ ফায়সালা পৌঁছিয়ে দিলাম যে, সকাল হতে হতেই এদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

৩০. এখানে যে উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম এবং তার সাথে সাথে লূতের সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনানো হচ্ছে তা অনুধাবন করার জন্য এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো সামনে থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিকে ৭ ও ৮ আয়াতে কাফেরদের এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো ঃ “যদি তুমি সাচ্চা নবী হয়ে থাকো তাহলে ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে আনছো না কেন?” সেখানে এ প্রশ্নটির নিছক একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল ঃ “ফেরেশতাদেরকে আমি এমনি অযথা পাঠাই না যখনই তাদেরকে পাঠাই সত্য সহকারে পাঠাই।” এখন এখানে এর বিস্তারিত জবাব এ দু’টি কাহিনীর আকারে দেয়া হচ্ছে। এখানে তাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, একটি “সত্য” নিয়ে ফেরেশতারা ইবরাহীমের কাছে এসেছিল আবার অন্য একটি “সত্য” নিয়ে তারা এসেছিল লূতের সম্প্রদায়ের কাছে। এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নাও, ঐ দু’টি সত্যের মধ্য থেকে কোন্‌টি নিয়ে ফেরেশতারা তোমাদের কাছে আসতে পারে? একথা সুস্পষ্ট যে, ইবরাহীমের কাছে যে সত্য নিয়ে তারা এসেছিল সেটি লাভ করার যোগ্যতা তোমাদের নেই। এখন কি যে সত্যটি নিয়ে তারা লূতের সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি সহকারে তোমরা তাদেরকে আনতে চাও?

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾ قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٦٩﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِىْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧١﴾

ইত্যবসরে নগরবাসীরা মহা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে লূতের বাড়ি চড়াও হলো।[৩৯] *লূত বললো, "ভাইয়েরা আমার! এরা হচ্ছে আমার মেহমান, আমাকে বে–ইজ্জত করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে লাঞ্ছিত করো না।" তারা বললো, "আমরা না তোমাকে বারবার মানা করেছি, সারা দুনিয়ার ঠিকেদারী নিয়ো না?" লূত লাচার হয়ে বললো, "যদি তোমাদের একান্তই কিছু করতেই হয় তাহলে এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে।*[৪০]

৩১. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা হূদের ৭ রুকূ' টীকা সহকারে দেখুন।

৩২. অর্থাৎ হযরত ইসহাকের (আ) জন্মের সুসংবাদ। সূরা হূদে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৩. হযরত ইবরাহীমের (আ) এ প্রশ্নটি থেকে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, ফেরেশতারা সবসময় অস্বাভাবিক অবস্থায়ই মানুষের আকৃতি ধরে আসেন এবং বড় বড় ও গুরুতর ধরনের অভিযানেই তাদেরকে পাঠানো হয়।

৩৪. এ ধরনের সংক্ষিপ্ত ইংগিত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, লূতের সম্প্রদায়ের অপরাধের পেয়ালা তখন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। যার ফলে হযরত ইবরাহীমের (আ) মত সজাগ ও অভিজ্ঞ লোকের সামনে তার নাম উচ্চারণ করার আদৌ প্রয়োজনই হয়নি। কাজেই শুধুমাত্র "একটি অপরাধী সম্প্রদায়" বলাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে।

৩৫. তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য সূরা 'আরাফের ১০ রুকূ' এবং সূরা হূদের ৭ রুকূ' দেখুন।

৩৬. এখানে বক্তব্য সংক্ষেপ করা হয়েছে। সূরা হূদে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের আগমনে হযরত লূত (আ) অত্যন্ত ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর মন ভীষণভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাদেরকে দেখার সাথে সাথেই তিনি মনে মনে বলতে থাকেন আজ বড় কঠিন সময় এসেছে। তাঁর এ ভয়ের কারণ হিসেবে কুরআনের বর্ণনা থেকে যে ইংগিত এবং হাদীস থেকে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, এ ফেরেশতারা অত্যন্ত সুশ্রী কিশোরদের আকৃতি ধরে হযরত লূতের কাছে এসেছিলেন। এদিকে হযরত লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি আগত মেহমানদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারছিলেন না আবার নিজের সম্প্রদায়ের বদমায়েশদের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করাও তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। তাই তিনি বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

৩৭. অর্থাৎ নিজের পরিবারবর্গের পেছনে পেছনে এ জন্য চলো যেন তাদের কেউ থেকে যেতে না পারে।

৩৮. এর মানে এ নয় যে, পেছন ফিরে তাকালেই তোমরা পাথর হয়ে যাবে, যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে। বরং এর মানে হচ্ছে, পেছনের আওয়াজ, শোর গোল শুনে তামাশা দেখার জন্য থেমে যেয়ো না। এটা তামাশা দেখার সময় নয় এবং অপরাধী জাতির ধ্বংসক্রিয়া দেখে অশ্রুপাত করার সময়ও নয়। এক মুহূর্ত যদি তোমরা আযাব প্রাপ্ত জাতির এলাকায় থেমে যাও তাহলে ধ্বংস–বৃষ্টির কিছুটা তোমাদের ওপরও বর্ষিত হতে পারে এবং তাতে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারো।

৩৯. এ থেকে এ জাতির ব্যভিচারবৃত্তি কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। জনপদের এক ব্যক্তির বাড়িতে কয়েকজন সুশ্রী অতিথি এসেছেন. ব্যাস, আর যায় কোথায় অমনি তার বাড়িতে বিপুল সংখ্যক দুর্বৃত্ত চড়াও হয় এবং তার অতিথিদের কাছে প্রকাশ্যে দাবী জানাতে থাকে যে, তার অতিথিদেরকে এ দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিতে হবে, যাতে তারা তাদের সাথে ব্যভিচার করতে পারে। তাদের সারা জনপদে তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত কেউ ছিল না। তাদের জাতির নৈতিক চেতনাও খতম হয়ে গিয়েছিল ফলে লোকেরা প্রকাশ্যে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করতে লজ্জাবোধ করতো না' হযরত লূতের (আ) মত পবিত্রাত্মা ও নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের গৃহে যখন বদমায়েশদের এমন নির্লজ্জ হামলা হতে পারে তখন এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এসব জনবসতিতে সাধারণ মানুষদের সাথে কোন্ ধরনের ব্যবহার করা হতো।

তালমূদে এ জাতির যে অবস্থা লিখিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরছি এ থেকে এ জাতিটি নৈতিক অধোপতনের কোন্ প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তার কিছুটা বিস্তারিত সংবাদ জানা যাবে। তালমূদে বলা হয়েছে ঃ একবার আইলাম এলাকার একজন মুসাফির এ জাতিটির এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। পথে রাত হয়ে গেল, ফলে তাকে বাধ্য হয়ে তাদের সাদুম নগরীতে অবস্থান করতে হলো। তার সাথে ছিল তার নিজের পাথেয়। কারোর কাছে সে অতিথি হবার আবেদন জানালো না। সে একটি গাছের নীচে বসে পড়লো। কিন্তু একজন সাদুমবাসী পীড়াপীড়ি করে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। রাত্রে তাকে নিজের কাছে রাখলো এবং প্রভাত হবার আগেই তার গাধাটি তার জীন ও বাণিজ্যিক মালপত্রসহ লোপাট করে দিল। বিদেশী লোকটি শোরগোল করলো কিন্তু কেউ তার ফরিয়াদ শুনলো না। বরং জনবসতির লোকেরা তার অন্যান্য মালপত্রও লুট করে নিয়ে তাকে বাইরে বের করে দিল।

একবার হযরত সারা হযরত লূতের পরিবারের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য নিজের গোলাম ইলিয়াযিরকে সাদুমে পাঠালেন। ইলিয়াযির নগরীতে প্রবেশ করে দেখলেন, একজন সাদুমী একজন বিদেশীকে মারছে। ইলিয়াযির সাদুমীকে বললো, তোমার লজ্জা হয় না তুমি একজন অসহায় মুসাফিরের সাথে এ ব্যবহার করছো? কিন্তু জবাবে সর্বসমক্ষে ইলিয়াযিরের মাথা ফাটিয়ে দেয়া হলো।

একবার এক গরীব লোক কোথাও থেকে তাদের শহরে এলো। কেউ তাকে খাবার দাবারের জন্য কিছু দিল না। সে ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে এক জায়গায় মাটিতে পড়েছিল। এ

অবস্থায় হযরত লূতের (আ) মেয়ে তাকে দেখতে পেলেন। তিনি তার কাছে খাবার পৌছে দিলেন। এ জন্য হযরত লূত (আ) ও তাঁর মেয়েকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হলো এবং তাদেরকে এই বলে হুমকি দেয়া হলো যে, এ ধরনের কাজ করতে থাকলে তোমরা আমাদের জনবসতিতে থাকতে পারবে না।

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণনা করার পর তালমূদ রচয়িতা লিখছেন, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এ লোকেরা ছিল বড়ই জালেম, ধোঁকাবাজ এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে অসৎ। কোন মুসাফির তাদের এলাকা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারতো না। তাদের লোকালয় থেকে কোন গরীব ব্যক্তি এক টুকরো রুটি সংগ্রহ করতে পারতো না। বহুবার এমন দেখা গেছে বাইরের কোন লোক তাদের এলাকায় প্রবেশ করে অনাহারে মারা গেছে এবং তারা তার গায়ের পোশাক খুলে নিয়ে তার লাশকে উলংগ অবস্থায় দাফন করে দিয়েছে। বাইরের ব্যবসায়ীরা দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে পৌছে গেলে সর্বসমক্ষে তাদের মালামাল লুট করে নেয়া হতো এবং তাদের ফরিয়াদের জবাবে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা হতো। নিজেদের উপত্যকাকে তারা একটি উদ্যান বানিয়ে রেখেছিল। মাইলের পর মাইল ব্যাপী ছিল এ উদ্যান। তারা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে এ উদ্যানে ব্যভিচারমূলক কুকর্ম করতো। একমাত্র লূত আলাইহিস সালাম ছাড়া তাদের এসব কাজের প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না। এ সমগ্র কাহিনীকে সংক্ষেপ করে কুরআন মজীদে শুধুমাত্র দু’টি বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ

“তারা আগে থেকেই অনেক খারাপ কাজ করে আসছিল।” (হূদঃ ৭৮)

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ

“তোমরা পুরুষদের দ্বারা যৌন কামনা পূর্ণ করো, মুসাফিরদের মালপত্র লুটপাট করো এবং নিজেদের মজলিসসমূহে প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম করো।” (আনকাবুতঃ ২৯)।

৪০. সূরা হূদের ৮৭ টীকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে কেবল এতটুকুন ইংগিতই যথেষ্ট যে, একথাগুলো একজন ভদ্রলোকের মুখ থেকে এমন সময় বের হয়েছে যখন তিনি একেবারেই লাচার হয়ে গিয়েছিলেন এবং বদমায়েশরা তাঁর কোন ফরিয়াদ ও আবেদন নিবেদনে কান না দিয়ে তাঁর মেহমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল।

এ সুযোগে একটি কথা পরিষ্কার করে দেয়া প্রয়োজন। সূরা হূদে ঘটনাটি যে ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, বদমায়েশদের এ হামলার সময় পর্যন্তও হযরত লূত (আ) একথা জানতেন না যে, তাঁর মেহমানরা আসলে আল্লাহর ফেরেশতা। তখনো পর্যন্ত তিনি মনে করছিলেন, এ ছেলে কয়টি মুসাফির এবং এরা তাঁর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বদমায়েশদের দল যখনই মেহমানদের অবস্থান স্থলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং হযরত লূত (আ) অস্থির হয়ে বলে উঠলেন,

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

তোমার জীবনের কসম হে নবী! সে সময় তারা যেন একটি নেশায় বিভোর হয়ে মাতালের মত আচরণ করে চলছিল।

অবশেষে প্রভাত হতেই একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং আমি সেই জনপদটি ওলট পালট করে রেখে দিলাম আর তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম।[৪১]

প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ লোকদের জন্য এ ঘটনার মধ্যে বিরাট নিদর্শন রয়েছে। আর সেই এলাকাটি (যেখানে এটা ঘটেছিল) লোক চলাচলের পথের পাশে অবস্থিত।[৪২] *ঈমানদার লোকদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষার বিষয় রয়েছে।*

আর আইকাবাসীরা[৪৩] *জালেম ছিল। কাজেই দেখে নাও আমিও তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর এ উভয় সম্প্রদায়ের বিরাণ এলাকা প্রকাশ্য পথের ধারে অবস্থিত।*[৪৪]

(হায়, যদি আমার তোমাদের মোকাবিলা করার শক্তি থাকতো অথবা আমার সাহায্য–সহযোগিতা গ্রহণ করার মতো কোন সহায় থাকতো!) তখনই মেহমানরা নিজেদের ফেরেশতা হবার কথা প্রকাশ করলো। এরপর ফেরেশতারা তাঁকে বললো, এখন আপনি নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যান এবং এদের সাথে বোঝাপড়া করার জন্য আমাদের ছেড়ে দেন। ঘটনাবলীর এ ধারাবাহিকতা সামনে রাখার পর কোন্ সংকটপূর্ণ অবস্থায় একেবারে লাচার হয়ে হযরত লূত (আ) একথা বলেছিলেন তা পুরোপুরি অনুমান করা যেতে পারে। ঘটনাগুলো যে ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছিল এ সূরায় সেগুলো বর্ণনা করার সময় যেহেতু সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়নি বরং যে বিশেষ দিকটি শ্রোতাদের মনে বদ্ধমূল করার জন্য এ কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটিকে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করাই এখানে কাম্য। তাই একজন সাধারণ পাঠক এ ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে যে, ফেরেশতারা শুরুতেই হযরত লূতের কাছে নিজেদের

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا
عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾
فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ
وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾

৬ রুকূ’

হিজ্‌রবাসীরাও[৪৫] রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। আমি তাদের কাছে আমার নিদর্শন পাঠাই, নিশানী দেখাই কিন্তু তারা সবকিছু উপেক্ষা করতে থাকে। তারা পাহাড় কেটে কেটে গৃহ নির্মাণ করতো এবং নিজেদের বাসস্থানে একেবারেই নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রভাত হতেই একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাদেরকে আঘাত হানলো এবং তাদের উপার্জন তাদের কোন কাজে লাগলো না।[৪৬]

আমি পৃথিবী ও আকাশকে এবং তাদের মধ্যকার সকল জিনিসকে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে সৃষ্টি করিনি[৪৭] এবং ফায়সালার সময় নিশ্চিতভাবেই আসবে। কাজেই হে মুহাম্মাদ! (এই লোকদের আজেবাজে আচরণগুলোকে) ভদ্রভাবে উপেক্ষা করে যাও।

পরিচয় দিয়েছিল এবং এখন নিজের মেহমানদের ইজ্জত–আব্রু বাঁচাবার জন্য তাঁর এ সমস্ত ফরিয়াদ ও আবেদন নিবেদন নিছক নাটুকেপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪১. এ পোড়া মাটির পাথর বৃষ্টি হতে পারে উল্‌কাপাত ধরনের কিছু। আবার আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে তা মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয়ে তাদের ওপর চতুরদিক থেকে বৃষ্টির মত বর্ষিত হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া একটি মারাত্মক ধরনের ঘূর্ণি ঝড়ও তাদের ওপর এ পাথর বৃষ্টি করতে পারে।

৪২. অর্থাৎ হেজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যাবার পথে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাটি পড়ে। সাধারণত বাণিজ্য যাত্রীদল এ ধ্বংসের নিদর্শনগুলো দেখে থাকে। আজো সমগ্র এলাকা জুড়ে এ ধ্বংসাবশেষগুলো ছড়িয়ে আছে। এ এলাকাটির অবস্থান লূত সাগরের (Dead sea) পূর্বে ও দক্ষিণে। বিশেষ করে এর দক্ষিণ অংশ সম্পর্কে

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّٰقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ
إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

নিশ্চিতভাবে তোমার রব সবার স্রষ্টা এবং সবকিছু জানেন।[৪৮] আমি তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি, যা বারবার আবৃত্তি করার মত[৪৯] এবং তোমাকে দান করেছি মহান কুরআন।[৫০] আমি তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের দুনিয়ার যে সম্পদ দিয়েছি সেদিকে তুমি চোখ উঠিয়ে দেখো না এবং তাদের অবস্থা দেখে মনঃক্ষুণ্ণও হয়ো না।[৫১] তাদেরকে বাদ দিয়ে মুমিনদের প্রতি ঘনিষ্ঠ হও এবং (অমান্যকারীদেরকে) বলে দাও—আমিতো প্রকাশ্য সতর্ককারী।

ভূগোলবিদগণের বর্ণনা হচ্ছে, এ এলাকাটি এত বেশী বিধ্বস্ত যার নজীর দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না।

৪৩. অর্থাৎ হযরত শো'আয়েবের (আ) সম্প্রদায়ের লোক। এ সম্প্রদায়টির নাম ছিল বনী মাদ্‌ইয়ান। তাদের এলাকার কেন্দ্রীয় শহরেরও নাম ছিল মাদ্‌ইয়ান এবং সমগ্র এলাকাটিকেও মাদ্‌ইয়ান বলা হতো। আর "আইকা" ছিল তাবুকের প্রাচীন নাম। এ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঘন জংগল। বর্তমানে একটি পাহাড়ী ঝরণার নাম আইকা। এটি জাবালে নূরে উৎপন্ন হয়ে আফাল উপত্যকায় এসে পড়ছে। (ব্যাখ্যার জন্য সূরা শূ'আরার ১১৫ টীকা দেখুন)

৪৪. মাদ্‌ইয়ান ও আইকাবাসীদের এলাকাও হেজায থেকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে পড়ে।

৪৫. এটি ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় শহর। মদীনার উত্তর পশ্চিমে বর্তমান আল'উলা শহরের কয়েক মাইল দূরে এ শহরটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। মদীনা থেকে তাবুক যাবার সময় প্রধান সড়কের ওপরই এ জায়গাটি পড়ে। এ উপত্যকাটির মধ্য দিয়ে কাফেলা এগিয়ে যায়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী কেউ এখানে অবস্থান করে না। হিজরী আট শতকে পর্যটক ইবনে বতুতা হজ্জে যাবার পথে এখানে এসে পৌছেন। তিনি লেখেন ঃ "এখানে লাল রংয়ের পাহাড়গুলোতে সামুদ জাতির ইমারতগুলো রয়েছে। এগুলো তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে নির্মাণ করেছিল। এ গৃহগুলোর কারুকাজ এখনো এমন উজ্জ্বল ও তরতাজা আছে যেন মনে হয় আজই এগুলো খোদাই করা হয়েছে। পচাগলা মানুষের হাড় এখনো এখানকার ঘরগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়।" (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা আ'রাফের ৫৭ টীকা দেখুন)।

৪৬. অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে কেটে তার মধ্যে যেসব আলীশান ইমারত নির্মাণ করেছিল সেগুলো তাদেরকে কোন প্রকারে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্তনা দেবার জন্য একথা বলা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে বাতিলের যে আপাত পরাক্রম ও বিজয় তুমি দেখতে পাচ্ছো এবং হকের পথে যেসব সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি তোমাকে হতে হচ্ছে এতে ভয় পেলে চলবে না। এটি একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। এ অবস্থা সবসময় এবং চিরকাল থাকবে না। কারণ পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র ব্যবস্থা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিলের ওপর নয়। বিশ্ব জাহানের প্রকৃতি হকের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বাতিলের সাথে নয়। কাজেই এখানে যদি অবস্থান ও স্থায়িত্বের অবকাশ থাকে তাহলে তা আছে হকের জন্য, বাতিলের জন্য নয়।

৪৮. অর্থাৎ স্রষ্টা হিসেবে তিনি নিজের সৃষ্টির ওপর পূর্ণ প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। আবার এই সংগে তিনি পুরোপুরি সজাগ ও সচেতনও। তুমি এদের সংশোধনের জন্য যা কিছু করছো তাও তিনি জানেন এবং যেসব চক্রান্ত দিয়ে এরা তোমার সংস্কার কার্যাবলীকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কেও তিনি অবগত। কাজেই তোমার ঘাবড়াবার এবং অধৈর্য হবার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিন্ত থাকো। সময় হলে ন্যায্য বিচার করে ফায়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে।

৪৯. অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। যদিও কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন দু' দু' শো আয়াত বিশিষ্ট সাতটি বড় বড় সূরা। অর্থাৎ আল বাকারাহ, আলে ইমরান, আন নিসা, আল মায়েদাহ, আল আন'আম, আল আ'রাফ ও ইউনুস অথবা আল আনফাল ও আত্‌তাওবাহ। কিন্তু পূর্ববর্তী আলেমগণের অধিকাংশই এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে সূরা ফাতিহার কথাই বলা হয়েছে। বরং খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি বারবার আবৃত্তি করার মত সূরা বলে যে সূরা ফাতিহার দিকে ইংগিত করেছেন এর প্রমাণ স্বরূপ ইমাম বুখারী দু'টি "মরফূ" হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

৫০. একথাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথিদেরকে সান্তনা দেবার জন্য বলা হয়েছে। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথিরা সবাই চরম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। নবুওয়াতের গুরু দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবার সাথে সাথেই নবী করীমের (সা) ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে দশ বারো বছরের মধ্যে হযরত খাদীজার (রা) সব সম্পদও খরচ হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে কিছু উঠতি যুবক ছিলেন। তাদেরকে অভিভাবকরা ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। কতক ছিলেন ব্যবসায়ী ও কারিগর। অনবরত অর্থনৈতিক বয়কটের আঘাতে তাদের কাজ কারবার একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর কতক দুর্ভাগ্য পীড়িত আগে থেকেই ছিলেন দাস বা মুক্ত দাস শ্রেণীভুক্ত। তাদের কোন অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডই ছিল না। এরপর দুর্ভাগ্যের ওপর দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে, নবী (সা) সহ সমস্ত মুসলমান মক্কা ও তার চারপাশের পল্লীগুলোতে চরম নির্যাতিতের জীবন যাপন করছিলেন। তারা ছিলেন সবদিক থেকে নিন্দিত ও ধিকৃত। সব জায়গায় তাঁরা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও হাসি-তামাশার খোরাক হয়েছিলেন। এই সংগে মানসিক ও আত্মিক মর্মজ্বালার সাথে সাথে তারা দৈহিক নিপীড়নের হাত থেকেও রেহাই পাননি। অন্যদিকে কুরাইশ সরদাররা

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ
بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾
الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ
السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

এটা ঠিক তেমনি ধরনের সতর্কীকরণ যেমন সেই বিভক্তকারীদের দিকে আমি পাঠিয়েছিলাম যারা নিজেদের কুরআনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে।[৫২] তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যি তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করবো, তোমরা কি কাজে নিয়োজিত ছিলে?

কাজেই হে নবী! তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হচ্ছে তা সরবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করো এবং শিরককারীদের মোটেই পরোয়া করো না। যেসব বিদ্রূপকারী আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও ইলাহ বলে গণ্য করে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য আমিই যথেষ্ট। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

আমি জানি, এরা তোমার সম্বন্ধে যেসব কথা বানিয়ে বলে তাতে তুমি মনে ভীষণ ব্যথা পাও। এর প্রতিকার এই যে, তুমি নিজের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করতে থাকো, তাঁর সকাশে সিজদাবনত হও এবং যে চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত সেই সময় পর্যন্ত নিজের রবের বন্দেগী করে যেতে থাকো।[৫৩]

পার্থিব অর্থ–সম্পদের ক্ষেত্রে সবরকমের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। এ অবস্থায় বলা হচ্ছে, তোমার মন হতাশাগ্রস্ত কেন? তোমাকে আমি এমন সম্পদ দান করেছি যার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ। তোমার এ জ্ঞানগত ও নৈতিক সম্পদ ঈর্ষার যোগ্য, ওদের বস্তুগত সম্পদ নয়। ওরা তো নানান হারাম উপায়ে এ সম্পদ আহরণ করছে এবং নানাবিধ হারাম পথে এ উপার্জিত সম্পদ নষ্ট করছে। শেষ পর্যন্ত ওরা একদম কপর্দক শূন্য ও কাংগাল হয়ে নিজেদের রবের সামনে হাযির হবে।

৫১. অর্থাৎ তারা যে নিজেদের কল্যাণকামীকে নিজেদের শত্রু মনে করছে, নিজেদের ভ্রষ্টতা ও নৈতিক ত্রুটিগুলোকে নিজেদের গুণাবলী মনে করছে, নিজেরা এমন পথে এগিয়ে চলছে এবং নিজেদের সমগ্র জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার নিশ্চিত পরিণাম ধ্বংস এবং যে ব্যক্তি তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখাচ্ছে তার সংস্কার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাচ্ছে, তাদের এ অবস্থা দেখে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।

৫২. সেই বিভক্তকারী দল বলতে এখানে ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে বিভক্তকারী এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে। তার কিছু কথা মেনে নিয়েছে এবং কিছু কথা মেনে নেয়নি। এ ছাড়া তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাটছাঁট ও পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে অসংখ্য ফের্‌কার জন্ম দিয়েছে। তাদের "কুরআন" বলতে তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। এ কিতাবটি তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে দেয়া হয়েছিল যেমন উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে কুরআন দেয়া হয়। আর এ কুরআনকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলার কথা বলে ঠিক এমন ধরনের একটি কর্মের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যেমন সূরা আল বাকারার ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু কথা মেনে নেবে এবং কিছু কথা অস্বীকার করবে?

তারপর যে কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে আজ এই যে সতর্ক করা হচ্ছে এটা ঠিক তেমনি ধরনের সতর্কীকরণ যেমন ইতিপূর্বে ইহুদীদেরকে করা হয়েছিল,—মূলত ইহুদীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করানোই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইহুদীরা আল্লাহর পাঠানো সতর্ক সংকেত থেকে গাফেল থাকার ফলে যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এখন ভেবে দেখো, তোমারাও কি এই একই পরিণাম দেখতে চাও?

৫৩. অর্থাৎ সত্যের বাণী প্রচার এবং সংস্কার প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষেত্রে তোমাকে অশেষ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এগুলোর মোকাবিলা করার শক্তি তুমি একমাত্র নামায ও আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করতে পারো। এ জিনিসটি তোমার মনকে প্রশান্তিতে ভরে তুলবে, তোমার মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্ম দেবে, তোমার সাহস ও হিম্মত বাড়িয়ে দেবে এবং তোমাকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে যার ফলে সারা দুনিয়ার মানুষের গালিগালাজ নিন্দাবাদ ও প্রতিরোধের মুখে তুমি দৃঢ়ভাবে এমন দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে যার মধ্যে তোমার রবের রেজামন্দি রয়েছে।

আন্ নাহ্ল

১৬

নামকরণ

৬৮ আয়াতের وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ বাক্যাংশ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। এও নিছক আলামত ভিত্তিক, নয়তো নাহ্ল বা মৌমাছি এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য–প্রমাণ এর নাযিল হওয়ার সময়–কালের ওপর আলোকপাত করে। যেমন,

৪১ আয়াতের وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا বাক্যাংশ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সময় হাবশায় হিজরত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১০৬ আয়াতের مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ বাক্য থেকে জানা যায়, এ সময় জুলুম–নিপীড়নের কঠোরতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল এবং এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি নির্যাতনের আধিক্যে বাধ্য হয়ে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে ফেলে তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কি হবে।

১১২–১১৪ আয়াতগুলোর – ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً .... اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ বাক্যগুলো পরিষ্কার এদিকে ইংগিত করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর মক্কায় যে বড় আকারের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ সূরার ১১৫ আয়াতটি এমন একটি আয়াত যার বরাত দেয়া হয়েছে সূরা আন'আমের ১১৯ আয়াতে। আবার সূরা আন'আমের ১৪৬ আয়াতে এ সূরার ১১৮ আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সূরা দুটির নাযিলের মাঝখানে খুব কম সময়ের ব্যবধান ছিল।

এসব সাক্ষ–প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, এ সূরাটিও মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়। সূরার সাধারণ বর্ণনাভংগীও একথা সমর্থন করে।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়

শিরককে বাতিল করে দেয়া, তাওহীদকে সপ্রমাণ করা, নবীর আহবানে সাড়া না দেবার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়া এবং হকের বিরোধিতা ও

তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন করা এ সূরার মূল বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়।

আলোচনা

কোন ভূমিকা ছাড়াই আকস্মিকভাবে একটি সতর্কতামূলক বাক্যের সাহায্যে সূরার সূচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফেররা বারবার বলতো, "আমরা যখন তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছি এবং প্রকাশ্যে তোমার বিরোধিতা করছি তখন তুমি আমাদের আল্লাহর যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো তা আসছে না কেন?" তাদের এ কথাটি বারবার বলার কারণ ছিল এই যে, তাদের মতে এটিই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী না হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর জবাবে বলা হয়েছে, নির্বোধের দল, আল্লাহর আযাব তো তোমাদের মাথার ওপর একেবারে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তা কেন দ্রুত তোমাদের ওপর নেমে পড়ছে না এ জন্য হৈ চৈ করো না। বরং তোমরা যে সামান্য অবকাশ পাচ্ছো তার সুযোগ গ্রহণ করে আসল সত্য কথাটি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এরপর সংগে সংগেই বুঝাবার জন্য ভাষণ দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু একের পর এক একাধিকবার সামনে আসতে শুরু করেছে।

(১) হৃদয়গ্রাহী যুক্তি এবং জগত ও জীবনের নিদর্শনসমূহের সুস্পষ্ট সাক্ষ–প্রমাণের সাহায্যে বুঝানো হয়েছে যে, শিরক মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।

(২) অস্বীকারকারীদের সন্দেহ, সংশয়, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার প্রত্যেকটির জবাব দেয়া হয়েছে।

(৩) মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরার গোয়ার্তুমি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকার ও আস্ফালনের অশুভ পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা এনেছেন, মানুষের জীবনে যে সব নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে চায় সেগুলো সংক্ষেপে কিন্তু হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তারা যে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেবার দাবী করে থাকে এটা নিছক বাহ্যিক ও অন্তসারশূন্য দাবী নয় বরং এর বেশ কিছু চাহিদাও রয়েছে। তাদের আকীদা–বিশ্বাস, নৈতিক–চারিত্রিক ও বাস্তব জীবনে এগুলোর প্রকাশ হওয়া উচিত।

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের মনে সাহস সঞ্চার করা হয়েছে এবং সংগে সংগে কাফেরদের বিরোধিতা, প্রতিরোধ সৃষ্টি ও জুলুম–নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি কি হতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে।

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (১) يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ (২) خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (৩)

এসে গেছে আল্লাহর ফায়সালা।[১] এখন আর একে ত্বরান্বিত করতে বলো না। পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করছে তার উর্ধে তিনি অবস্থান করেন।[২] তিনি এ রূহকে[৩] তাঁর নির্দেশানুসারে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার ওপর চান নাযিল করেন।[৪] (এ হেদায়াত সহকারে যে, লোকদের) "জানিয়ে দাও, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো"[৫] তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এরা যে শিরক করছে তাঁর অবস্থান তার অনেক উর্ধে।[৬]

১. অর্থাৎ তা একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার প্রকাশ ও প্রয়োগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। ব্যাপারটা একেবারেই অবধারিত ও সুনিশ্চিত অথবা একান্ত নিকটবর্তী এ ধারণা দেবার জন্য ব্যাক্যটি অতীতকালের ক্রিয়াপদের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। কিংবা কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের সবরের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল এবং শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছিল বলেই অতীতকালের ক্রিয়াপদ দ্বারা একথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন জাগে, এ "ফায়সালা" কি ছিল এবং কোন্ আকৃতিতে এসেছে? আমরা মনে করি (তবে আল্লাহই সঠিক খবর ভাল জানেন) এ ফায়সালা বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে হিজরতকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিলের কিছুদিন পরেই এ হিজরতের হুকুম দেয়া হয়। কুরআন অধ্যয়নে জানা যায়, যে সমাজে নবীর আগমন ঘটে তাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলেই নবীকে হিজরতের

হুকুম দেয়া হয়। এ হুকুম উল্লেখিত সমাজের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। এরপর হয় তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক আযাব এসে যায় অথবা নবী ও তাঁর অনুসারীদের হাত দিয়ে তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়া হয়। ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায়। হিজরত সংঘটিত হবার পর মক্কার কাফেররা মনে করলো ফায়সালা তাদের পক্ষেই হয়েছে। কিন্তু আট দশ বছরের মধ্যেই দুনিয়াবাসীরা দেখে নিল, শুধুমাত্র মক্কা থেকেই নয়, সমগ্র আরব ভূখণ্ড থেকেই শিরক ও কুফরীকে শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে।

২. প্রথম বাক্য ও দ্বিতীয় বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করার জন্য এর পটভূমি সামনে রাখা প্রয়োজন। কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছিল যে, তুমি আল্লাহর যে ফায়সালার কথা বলে আমাদের ভয় দেখিয়ে থাকো তা আসছে না কেন? তাদের এ চ্যালেঞ্জের পিছনে আসলে যে চিন্তাটি সক্রিয় ছিল তা ছিল এই যে, তাদের মুশরিকী ধর্মই সত্য এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামাখা আল্লাহর নামে একটি ভ্রান্ত ধর্ম পেশ করছেন। আল্লাহ এ ধর্মকে অনুমোদন দান করেননি। তাদের যুক্তি ছিল, আমরা যদি আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকি এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পাঠানো নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করছি তাতে আমাদের সর্বনাশ হওয়া উচিত ছিল না কি? কিন্তু তা হচ্ছে না, এটা কেমন করে সম্ভব? তাই আল্লাহর ফায়সালার ঘোষণা দেবার সাথে সাথেই বলা হয়েছে, এ ফায়সালার প্রয়োগ বিলম্বিত হবার যে কারণ তোমরা মনে করছো তা মোটেই সঠিক নয়। আল্লাহর সাথে কারো শরীক হবার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সত্তা এর অনেক উর্ধে এবং এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৩. অর্থাৎ নবুওয়াতের রূহ। এ রূহ বা প্রাণসত্তায় উজ্জীবিত হয়েই নবী কাজ করেন ও কথা বলেন। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবনে প্রাণের যে মর্যাদা এ অহী ও নবুওয়াতী প্রাণসত্তা নৈতিক জীবনে সেই একই মর্যাদার অধিকারী। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার জন্য 'রূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ সত্যটি না বুঝার কারণে ঈসায়ীগণ রূহুল কদুস (Holy Ghost)-কে তিন খোদার এক খোদা বানিয়ে নিয়েছেন।

৪. ফায়সালা কার্যকর করাবার দাবী জানিয়ে কাফেররা যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল তার পেছনে যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের অস্বীকৃতিও কার্যকর ছিল, তাই শিরক খণ্ডনের পরপরই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা বলতো, এ ব্যক্তি যা বলছে, এসব মিথ্যা ও বানোয়াট। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন, এ ব্যক্তি হচ্ছে আমার পাঠানো রূহ। এ রূহ ও প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়েই সে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে।

তারপর তিনি যে বান্দার ওপর চান এ রূহ নাযিল করেন —একথার মাধ্যমে নবী করীমের (সা) বিরুদ্ধে উত্থাপিত কাফেরদের একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। কাফেররা আপত্তি করে বলতো, আল্লাহর যদি নবী পাঠাবার দরকার হয়ে থাকে তাহলে কেবলমাত্র আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদই (সা) কি এ কাজের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিল? মক্কা ও তায়েফের সমস্ত বড় বড় সরদাররা কি মরে গিয়েছিল? তাদের কারোর ওপর আল্লাহর দৃষ্টি পড়েনি? এ ধরনের অর্থহীন ও অযৌক্তিক আপত্তির জবাব এ ছাড়া আর কি হতে পারতো? এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর এ জবাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ④ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ
لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ⑥ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ
لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ ⑦ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ⑧ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ⑨

তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ছোট্ট একটি ফোঁটা থেকে। তারপর দেখতে দেখতে সে এক কলহপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।[৭] তিনি পশু সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য পোশাক, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ উপকারিতাও। তাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য যখন সকালে তোমরা তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠাও এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনো। তারা তোমাদের জন্য বোঝা বহন করে এমন সব জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর প্রাণান্ত পরিশ্রম না করে পৌঁছুতে পারো না। আসলে তোমার রব বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়। তোমাদের আরোহণ করার এবং তোমাদের জীবনের শোভা–সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। তিনি (তোমাদের উপকারার্থে) আরো অনেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো তোমরা জানোই না।[৮] আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে সেখানে সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তেছে।[৯] তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্য–সোজা পথে পরিচালিত করতেন।[১০]

আল্লাহ নিজের কাজ সম্পর্কে নিজেই অবগত আছেন। তাঁর কাজের ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে তাঁর পরামর্শ নেবার প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই সংগত মনে করেন নিজের কাজের জন্য নির্বাচিত করে নেন।

৫. এই বাক্যের মাধ্যমে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, নবুওয়াতের রূহ যেখানেই যে ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সেখানেই তিনি এ একটিই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন যে, সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত এবং একমাত্র তাঁকেই

ভয় করতে হবে, তিনি একাই এর হকদার। তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় এমন কোন সত্তা নেই যার অসন্তুষ্টির ভয়, যার শাস্তির আশংকা এবং যার নাফরমানির অশুভ পরিণামের আতংক মানবিক চরিত্র ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রক এবং মানবিক চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

৬. অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নবী যে শির্‌ক পরিহার করার এবং তাওহীদ বিশ্বাসী হবার দাওয়াত দেন, পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র সৃষ্টি কারখানাই তার সাক্ষ দিয়ে চলছে। এ কারখানা কোন কাল্পনিক গোলক ধাঁধাঁ নয় বরং একটি পুরোপুরি বাস্তব সত্য ব্যবস্থা। এর যেদিকে ইচ্ছা তাকিয়ে দেখো কোথাও থেকে শির্‌কের সাক্ষ–প্রমাণ পাওয়া যাবে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সার্বভৌম কর্তৃত্ব কোথাও প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে না। কোন বস্তুর গঠন প্রণালী একথা প্রমাণ করবে না যে, তার অস্তিত্ব অন্য কারোর দান। কাজেই যেখানে এ বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা নির্ভেজাল তাওহীদের নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে সেখানে তোমার এ শির্‌কের চিন্তাধারা—যার মধ্যে ধারণা ও অনুমান ছাড়া বাস্তব সত্যের গন্ধমাত্রও নেই—কোথায় জারী হতে পারে? এরপর বিশ্বজগতের নিদর্শনাবলী এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে এমন সব সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করা হয় যা একদিকে তাওহীদ এবং অন্যদিকে রিসালাতের প্রমাণ পেশ করে।

৭. এর দুই অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত এখানে এ দুই অর্থই প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ একটি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে এমন মানুষ তৈরী করেছেন যে বিতর্ক ও যুক্তি প্রদর্শন করার যোগ্যতা রাখে এবং নিজের বক্তব্য ও দাবীর পক্ষে সাক্ষ–প্রমাণ পেশ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যে মানুষকে আল্লাহ শুক্রবিন্দুর মত নগণ্য জিনিস থেকে তৈরী করেছেন তার অহংকারের বাড়াবাড়িটা দেখো, সে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মোকাবিলায় নিজেকে পেশ করার জন্য বিতর্কে নেমে এসেছে। প্রথম অর্থটির প্রেক্ষিতে সামনের দিকে একের পর এক কয়েকটি আয়াতে যে দলীল পেশ করা হয়েছে এ আয়াতটি তারই একটি সূত্র। (এ বর্ণনা ধারার শেষ পর্যায়ে আমরা এর ব্যাখ্যা করবো) আর দ্বিতীয় অর্থটির প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয় যে, বড় বড় বুলি আওড়ানোর আগে নিজের সত্তার দিকে একবার তাকাও। কোন্ আকারে কোথা থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় এসে পৌঁছেছো? কোথায় তোমার প্রতিপালনের সূচনা হয়েছিল? তারপর কোন্ পথ দিয়ে বের হয়ে তুমি দুনিয়ায় এসেছো? তারপর কোন্ কোন্ পর্যায় অতিক্রম করে তুমি যৌবন বয়সে পৌঁছেছো এবং এখন নিজেকে বিস্মৃত হয়ে কার মুখের ওপর কথার তুবড়ি ছোটাচ্ছো?

৮. অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ জিনিস এমন আছে যা মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। অথচ কোথায় কত সেবক তার সেবা করে যাচ্ছে এবং কি সেবা করছে সে সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।

৯. তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এখানে ইংগিতে নবুওয়াতের পক্ষেও একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এ যুক্তির সংক্ষিপ্তসার হচ্ছেঃ

দুনিয়ায় মানুষের জন্য চিন্তা ও কর্মের অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং কার্যত আছেও। এসব পথ তো আর একই সংগে সত্য হতে পারে না। সত্য একটিই এবং যে জীবনাদর্শটি এ সত্য অনুযায়ী গড়ে ওঠে সেটিই একমাত্র সত্য জীবনাদর্শ। অন্যদিকে

কর্মেরও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পথ থাকা সম্ভব এবং এ পথগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক জীবনাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় সেটিই একমাত্র সঠিক পথ।

এ সঠিক আদর্শ ও সঠিক কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বরং এটিই তার আসল মৌলিক প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য সমস্ত জিনিস তো মানুষের শুধুমাত্র এমন সব প্রয়োজন পূর্ণ করে যা একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী হওয়ার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। কিন্তু এ একটিমাত্র প্রয়োজন শুধুমাত্র মানুষ হবার কারণে তার জন্য অপরিহার্য হয়। এটি যদি পূর্ণ না হয় তাহলে এর মানে দাঁড়ায় এই যে, মানুষের সমস্ত জীবনটাই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এখন ভেবে দেখো, যে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্বদান করার আগে তোমাদের জন্য এতসব সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং যিনি অস্তিত্ব দান করার পর তোমাদের প্রাণী–জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূর্ণ করার এমন সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা কি তাঁর কাছে এটা আশা করো যে, তিনি তোমাদের মানবিক জীবনের এই সবচেয়ে বড় ও আসল প্রয়োজনটি পূর্ণ করার ব্যবস্থা না করে থাকবেন?

নবুওয়াতের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাটিই তো করা হয়েছে। যদি তুমি নবুওয়াত না মানো তাহলে বলো তোমার মতে মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ অন্য কি ব্যবস্থা করেছেন? এর জবাবে তুমি একথা বলতে পারো না যে, পথের সন্ধান করার জন্য আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে রেখেছেন। কারণ মানবিক বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি ইতিপূর্বেই এমন অসংখ্য পথ উদ্ভাবন করে ফেলেছে যা তার সত্য–সরল পথের সঠিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আবার তুমি একথাও বলতে পারো না যে, আল্লাহ আমাদের পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করেননি। কারণ আল্লাহর ব্যাপারে এরচেয়ে বড় আর কোন কুধারণা হতেই পারে না যে, প্রাণী হবার দিক দিয়ে তোমাদের প্রতিপালন ও বিকাশ লাভের এতসব বিস্তারিত ও পূর্ণাংগ ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন অথচ মানুষ হবার দিক দিয়ে তোমাদের একেবারে অন্ধকারের বুকে পথ হারিয়ে উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াবার ও পদে পদে ঠোকর খাবার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আর রহমানের ২–৩ টীকা দেখুন)।

১০. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ সমস্ত মানুষকে অন্যান্য সকল ক্ষমতাসীন সৃষ্টির মতো জন্মগতভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করে নিজের এ দায়িত্বটি (যা তিনি মানুষকে পথ দেখাবার জন্য নিজেই নিজের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলেন) পালন করতে পারতেন। কিন্তু এটি তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টির উদ্ভব ঘটানো যে নিজের পছন্দ ও বাছ–বিচারের মাধ্যমে সঠিক ও ভ্রান্ত সব রকমের পথে চলার স্বাধীনতা রাখে। এ স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য তাকে জ্ঞানের উপকরণ, বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা ও সংকল্পের শক্তি দান করা হয়েছে। তাকে নিজের ভিতরের ও বাইরের অসংখ্য জিনিস ব্যবহার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।। তার ভিতরে ও বাইরে সবদিকে এমন সব অসংখ্য কার্যকারণ ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা তার জন্য সঠিক পথ পাওয়া ও ভুল পথে পরিচালিত হওয়া উভয়টিরই কারণ হতে পারে। যদি তাকে জন্মগতভাবে

هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِیْهِ تُسِیْمُوْنَ ﴿۱۰﴾ یُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُوْنَ وَالنَّخِیْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

২ রুকূ'

তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যও খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানাবিধ ফল জন্মান। এর মধ্যে যারা চিন্তা–ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে একটি বড় নিদর্শন।

তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন এবং সমস্ত তারকাও তাঁরই হুকুমে বশীভূত রয়েছে। যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে এর মধ্যে প্রচুর নিদর্শন। আর এই যে বহু রং বেরংয়ের জিনিস তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন এগুলোর মধ্যেও অবশ্যি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

সঠিক পথানুসারী করে দেয়া হতো তাহলে এসবই অর্থহীন হয়ে যেতো এবং উন্নতির এমন সব উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছানো মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না, যা কেবলমাত্র স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে পথ দেখাবার জন্য জোরপূর্বক সঠিক পথে পরিচালিত করার পদ্ধতি পরিহার করে রিসালাতের পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এভাবে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ন থাকবে, তেমনি তার পরীক্ষার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং সত্য–সরল পথ ও সর্বোত্তম যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে তার সামনে পেশ করে দেয়া যাবে।

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥﴾ وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

তিনিই তোমাদের জন্য সাগরকে করায়ত্ব করে রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোশ্‌ত নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অংগের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো, সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এ জন্য, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো[১১] এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।

তিনি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ গেঁড়ে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে।[১২] তিনি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং প্রাকৃতিক পথনির্মাণ করেছেন,[১৩] যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌঁছতে পারো। তিনি ভূপৃষ্ঠে পথনির্দেশক চিহ্নসমূহ রেখে দিয়েছেন[১৪] এবং তারকার সাহায্যেও মানুষ পথনির্দেশ পায়।[১৫]

১১. অর্থাৎ হালাল পথে নিজের রিযিক সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।

১২. এ থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠে পর্বত শ্রেণী স্থাপনের উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে পৃথিবীর আবর্তন ও গতি সুষ্ঠু ও সুশৃংখল হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের এ উপকারিতা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, পাহাড়ের অন্য যে সমস্ত উপকারিতা আছে সেগুলো একেবারেই গৌণ। মূলত মহাশূন্যে আবর্তনের সময় পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে রক্ষা করাই ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৩. অর্থাৎ নদ–নদীর সাথে যে পথ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকাসমূহে এসব প্রাকৃতিক পথের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্যি সমতল ভূমিতেও এগুলোর গুরুত্ব কম নয়।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীটাকে একই ধারায় সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেকটি এলাকাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এর অন্যান্য বিভিন্ন উপকারিতার মধ্যে একটি অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য আলাদাভাবে চিনে নেয়। এ নিয়ামতের মর্যাদা মানুষ তখনই অনুধাবন করতে পারে যখন ঘটনাক্রমে এমন

কোন বালুকাময় মরু প্রান্তরে তাকে যেতে হয় যেখানে এ ধরনের বৈশিষ্টমূলক চিহ্নের প্রায় কোন অস্তিত্বই থাকে না এবং মানুষ প্রতি মুহূর্তে পথ হারিয়ে ফেলার ভয় করতে থাকে। সামুদ্রিক সফরে মানুষ এর চেয়ে আরো বেশী মারাত্মকভাবে এ বিরাট নিয়ামতটি অনুভব করতে থাকে। কারণ সেখানে পথের নিশানী প্রায় একেবারেই থাকে না। কিন্তু মরুভূমি ও সমুদ্রের বুকেও আল্লাহ মানুষের পথ দেখাবার জন্য একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেখানে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্তও মানুষ তারকার সাহায্যে পথের সন্ধান করে আসছে।

এখানে আবার তাওহীদ, রহমত ও রবুবীয়াতের যুক্তির মাঝখানে রিসালাতের যুক্তির দিকে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। এ স্থানটি পড়তে গিয়ে মন আপনা আপনি এই বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিষ্ট হয়ে যায় যে, যে আল্লাহ তোমাদের বস্তুগত জীবনে পথনির্দেশনার জন্য এতসব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি কি তোমাদের নৈতিক জীবনের ব্যাপারে এতই বেপরোয়া হয়ে যেতে পারেন যে, এখানে তোমাদের পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থাই করবেন না? একথা সুস্পষ্ট, বস্তুগত জীবনে পথভ্রষ্ট হবার সবচেয়ে বড় ক্ষতি নৈতিক জীবনে পথভ্রষ্ট হবার ক্ষতির তুলনায় অতি সামান্যই বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, মহান করুণাময় রব যখন আমাদের বৈষয়িক জীবনকে সহজ ও সফল করার জন্য পাহাড়ের মধ্যে আমাদের জন্য পথ তৈরী করেন, সমতল ক্ষেত্রে পথের চিহ্ন স্থাপন করেন, মরুভূমি ও সাগরের বুকে আমাদের দিকনির্দেশনার জন্য আকাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন তখন তাঁর সম্পর্কে আমরা কেমন করে এ কুধারণা পোষণ করতে পারি যে, তিনি আমাদের নৈতিক সাফল্য ও কল্যাণের জন্য কোন পথই তৈরী করেননি, সেই পথকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য কোন চিহ্নও দাঁড় করাননি এবং তাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার জন্য কোন উজ্জ্বল প্রদীপও জ্বালাননি?

১৫. এ পর্যন্ত বিশ্বজাহান ও প্রাণী জগতের বহু নিশানী একের পর এক বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ তার নিজের সত্তা থেকে নিয়ে আসমান ও যমীনের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই যেদিকে চায় দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখুক, সেখানে প্রত্যেকটি জিনিসই নবীর বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং কোথাও থেকেও শিরক ও নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে একটি সাক্ষ–প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে তিনি নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে বাকশক্তিসম্পন্ন এবং যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন করে বিতর্ককারী মানুষ তৈরী করেছেন, তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করার জন্য এমন বহু জীব–জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন যাদের চুল, চামড়া, রক্ত, দুধ, গোশ্‌ত ও পিঠের মধ্যে মানবিক প্রকৃতির বহুতর চাহিদা এমনকি তার সৌন্দর্যপ্রিয়তার দাবী পূরণেরও উপাদান রয়ে গেছে। এই যে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করার এবং ভূপৃষ্ঠে নানা জাতের ফুল, ফল, শস্য ও উদ্ভিদ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন, যার অসংখ্য বিভাগ পরস্পরের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে এবং সেগুলো মানুষের প্রয়োজনও পূর্ণ করে। এ রাত ও দিনের নিয়মিত আসা যাওয়া এবং চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির চরম নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল আবর্তন, পৃথিবীর উৎপন্ন ফসল ও মানুষের জীবন–জীবিকার সাথে যার গভীরতম সম্পর্ক বিদ্যমান। এই যে পৃথিবীতে সমুদ্রের অস্তিত্ব এবং তার মধ্যে মানুষের বহু প্রাকৃতিক ও সৌন্দর্য প্রীতির চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই যে পানির কতিপয় বিশেষ আইনের শৃংখলে বাঁধা থাকা এবং তারপর

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

তাহলে ভেবে দেখতো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান?[১৬] তোমরা কি সজাগ হবে না? যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না। আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১৭] অথচ তিনি তোমাদের প্রকাশ্যও জানেন এবং গোপনও জানেন।[১৮]

আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব সত্তাকে লোকেরা ডাকে তারা কোন একটি জিনিসেরও স্রষ্টা নয় বরং তারা নিজেরাই সৃষ্টি। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তারা কিছুই জানেনা তাদেরকে কবে (পুনর্বার জীবিত করে) উঠানো হবে।[১৯]

তার এ উপকারিতা যে মানুষ সমুদ্রের মতো ভয়াবহ বস্তুর বুক চিরে তার মধ্যে নিজের জাহাজ চালায় এবং দেশ থেকে দেশান্তরে সফর ও বাণিজ্য করে। এই যে পৃথিবীর বুকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি এবং মানুষের অস্তিত্বের জন্য তাদের অপরিহার্যতা। এই যে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে অসীম মহাশূন্যের বুক পর্যন্ত অসংখ্য চিহ্ন ও বিশেষ নিশানীর বিস্তার এবং তারপর এসব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকা। এসব জিনিসই পরিষ্কার সাক্ষ দিচ্ছে যে, একটি সত্তাই এ পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। তিনি একাই নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী এসবের ডিজাইন তৈরী করেছেন। তিনিই এ ডিজাইন অনুযায়ী তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রতি মুহূর্তে এ দুনিয়ায় নিত্য নতুন জিনিস তৈরী করে করে এমনভাবে সামনে আনছেন যার ফলে সমগ্র পরিকল্পনা ও তার নিয়ম–শৃংখলায় সামান্যতম ফারাকও আসছে না। আর তিনি একাই পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত এ সুবিশাল কারখানাটি চালাচ্ছেন। একজন নির্বোধ বা হঠকারী ছাড়া আর কে–ইবা একথা বলতে পারে যে, এসব কিছুই একটি আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়? অথবা এ চরম সুশৃংখল, সুসংবদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বজাহানের বিভিন্ন কাজ বা বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন খোদার সৃষ্ট এবং বিভিন্ন খোদার পরিচালনাধীন?

১৬. অর্থাৎ যদি তোমরা একথা মানো (যেমন বাস্তবে মক্কার কাফেররাও এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশ্‌রিকরাও মানতো) যে, একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা এবং এ বিশ্বজগতে তোমাদের উপস্থাপিত শরীকদের একজনও কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি করা ব্যবস্থায় অস্রষ্টাদের মর্যাদা কেমন করে স্রষ্টার সমান অথবা কোনভাবেই তাঁর মতো

হতে পারে? নিজের সৃষ্ট জগতে স্রষ্টা যেসব ক্ষমতা–ইখ্‌তিয়ারের অধিকারী অ–স্রষ্টারাও তার অধিকারী হবে এবং স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিলোকের ওপর যেসব অধিকার রাখেন অ–স্রষ্টারাও তাই রাখবে, এটা কেমন করে সম্ভব? স্রষ্টা ও অ–স্রষ্টার গুণাবলী একই রকম হবে অথবা তারা একই প্রজাতিভুক্ত হবে, এমনকি তাদের মধ্যে পিতা–পুত্রের সম্পর্ক হবে, এটা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে?

১৭. প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে একটি বিরাট অকথিত কাহিনী রয়ে গেছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, সেটি এতই সুস্পষ্ট যে, এখানে তার জের টানার কোন প্রয়োজন নেই। তার প্রতি এ সামান্যমাত্র ইংগিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পরপরই তাঁর ক্ষমাশীল ও করুণাময় হবার কথা উল্লেখ করতে হবে। এ থেকে জানা যায়, যে মানুষের সমগ্র সত্তা ও সারাটা জীবন আল্লাহর অনুগ্রহের সূতোয় বাঁধা সে কেমন সব অকৃতজ্ঞতা, অবিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে নিজের উপকারীর উপকার ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের জবাব দিয়ে যাচ্ছে? অন্যদিকে তার এ উপকারী ও অনুগ্রহদাতা এমন ধরনের করুণাশীল ও সহিষ্ণু যে, এমন সব কার্যকলাপের পরও তিনি বছরের পর বছর একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এবং শত শত বছর একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান জাতিকে নিজের অনুগ্রহদানে আপ্লুত করে চলেছেন। এখানে দেখা যাবে, এক ব্যক্তি প্রকাশ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং তারপরও তার প্রতি প্রবল ধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে আবার এক ব্যক্তি স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সব কিছুতেই অ–স্রষ্টা সত্তাদেরকে শরীক করে চলছে এবং দানের জন্য দানকারীর পরিবর্তে অ–দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এরপরও এখানে দেখা যাবে দাতা–হস্ত দান করতে বিরত হচ্ছে না। এখানে এ দৃশ্যও দেখা যাবে যে, এক ব্যক্তি স্রষ্টাকে স্রষ্টা ও অনুগ্রহদাতা হিসেবে মেনে নেয়ার পরও তাঁর মোকাবিলায় বিদ্রোহ ও নাফরমানী করা নিজের অভ্যাসে পরিণত এবং তাঁর আনুগত্যের শৃংখল গলায় থেকে নামিয়ে দেয়াকে নিজের নীতি ও বিধি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এরপরও সারাজীবন স্রষ্টার অপরিসীম অনুগ্রহের ধারায় সে আপ্লুত হয়ে চলেছে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার এবং শির্‌ক ও গোনাহের কাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহের সিলসিলা বন্ধ না হওয়ার কারণ আল্লাহ লোকদের কার্যকলাপের কোন খবর রাখেন না,—কোন নির্বোধ যেন একথা মনে না করে বসে। এটা অজ্ঞতার কারণে আন্দাজে ভাগ বাঁটোয়ারা করার বা ভুলে কাউকে দান করে দেবার ব্যাপার নয়। এটা তো সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার ব্যাপার। অপরাধীদের গোপন ভেদ বরং তাদের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা সংকল্পগুলোর বিস্তারিত চেহারা জানার পরও এ ধরনের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এটা এমন পর্যায়ের সৌজন্য, দানশীলতা ও ঔদার্য যে একমাত্র রব্বুল আলামীনের পক্ষেই এটা শোভা পায়।

১৯. এ শব্দগুলো পরিষ্কার একথা ঘোষণা করছে যে, এখানে বিশেষভাবে যেসব বানোয়াট মাবুদদের প্রতিবাদ করা হচ্ছে তারা ফেরেশতা, জিন, শয়তান বা কাঠ–পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে কবরবাসী। কারণ ফেরেশতা ও শয়তানরা তো জীবিত আছে, তাদের প্রতি أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ (জীবিত নয় মৃত) শব্দাবলী প্রযোজ্য হতে পারে না। আর

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

এক ইলাহই তোমাদের আল্লাহ। কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তাদের অন্তরে অস্বীকৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে।[২০] নিসন্দেহে আল্লাহ তাদের সমস্ত কার্যকলাপ জানেন, যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। তিনি তাদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না যারা আত্মগরিমায় ডুবে থাকে।

আর[২১] যখন কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের রব এ কী জিনিস নাযিল করেছেন? তারা বলে, "জ্বী, ওগুলো তো আগের কালের বস্তাপচা গপ্‌পো।"[২২] এসব কথা তারা এজন্য বলছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝা পুরোপুরি উঠাবে আবার সাথে সাথে তাদের বোঝাও কিছু উঠাবে যাদেরকে তারা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট করছে। দেখো, কেমন কঠিন দায়িত্ব, যা তারা নিজেদের মাথায় নিয়ে নিচ্ছে।

কাঠ–পাথরের মূর্তির ক্ষেত্রে তো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (তারা জানে না তাদের কবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে) ধরনের শব্দাবলীর ব্যবহার তাদেরকেও আলোচনার বাইরে রেখে দেয়। এখন এ আয়াতে الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ (আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব সত্তাকে লোকেরা ডাকে) এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে নবী, আউলিয়া, শহীদ, সৎ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য অসাধারণ লোকদের কথাই বলা হয়েছে। অতি ভক্তের দল এসব সত্তাকে সংকট নিরসনকারী, অভিযোগের প্রতিকারকারী, দরিদ্রের সহায়, ধনদাতা এবং নাজানি আরো কত কিছু মনে করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ডাকতে থাকে। এর জবাবে যদি কেউ বলেন, আরবে এ ধরনের মাবুদ বা দেব–দেবী পাওয়া যেতো না তাহলে আমি বলবো এটা তার আরবীয় জাহেলিয়াতের ইতিহাস না জানার প্রমাণ। লেখাপড়া জানা লোকদের কে–ইবা একথা জানে না যে, বারী'আহ, কাল্‌ব, তাগ্‌লাব, কুদা'আহ, কিনানাহ, হার্‌স, কা'ব, কিন্‌দাহ ইত্যাদি বহু আরব গোত্রে বিপুল সংখ্যক খৃস্টান ও ইহুদী ছিল। আর এ দু'টি

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

তাদের আগেও বহু লোক (সত্যকে খাটো করে দেখাবার জন্য) এমনি ধরনের চক্রান্ত করেছিল। তবে দেখে নাও, আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারত সমূলে উৎপাটিত করেছেন এবং তার ছাদ ওপর থেকে তাদের মাথার ওপর ধ্বসে পড়ছে এবং এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এসেছে যেদিক থেকে তার আসার কোন ধারণাই তাদের ছিল না। তারপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে বলবেন, "বলো, এখন কোথায় গেলো আমার সেই শরীকরা যাদের জন্য তোমরা (সত্যপন্থীদের সাথে) ঝগড়া করতে?"—যারা[২৩] দুনিয়ায় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল তারা বলবে, "আজ কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য।"

ধর্মের লোকেরা ব্যাপকভাবে নবী, আউলিয়া ও শহীদদের পূজা করতো। তাছাড়া মৃত লোকরাই ছিল আরব মুশরিকদের অধিকাংশের না হলেও বহু লোকের উপাস্য। পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তী মৃত লোকদেরকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : ওয়াদ্দা, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক, নাস্‌র—এগুলো ছিল পূর্বকালের সৎলোকদের নাম। পরবর্তীকালের লোকেরা তাদের দেব মূর্তি নির্মাণ করে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : ইসাফ ও নায়েলাহ উভয়ই মানুষ ছিল। এ ধরনের বর্ণনা লাত, মানাত ও উয্‌যা সম্পর্কেও পাওয়া যায়। হাদীসে মুশরিকদের এ আকীদাও বর্ণিত হয়েছে যে, লাত ও উয্‌যা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ফলে তিনি শীতকালটি লাতের কাছে এবং গ্রীষ্মকালটি উয্‌যার কাছে কাটাতেন। سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ (আল্লাহর প্রতি তারা যে দোষারোপ করে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র)।

২০. অর্থাৎ আখেরাত অস্বীকৃতি তাদেরকে এতই দায়িত্বহীন, বেপরোয়া ও পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে মত্ত করে দিয়েছে যে এখন যে কোন সত্য অস্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। তাদের কাছে কোন সত্যের কদর নেই। তারা নিজেরা কোন নৈতিক বাঁধন

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

হ্যাঁ,[২৪] এমন কাফেরদের জন্য, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে পাকড়াও হয়[২৫] তখন সংগে সংগেই (অবাধ্যতা ত্যাগ করে) আত্মসমর্পণ করে এবং বলে, "আমরা তো কোন দোষ করছিলাম না।" ফেরেশতারা জবাব দেয়, "কেমন করে দোষ করছিলে না! তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। এখন যাও, জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো, ওখানেই তোমাদের থাকতে হবে চিরকাল।"[২৬] সত্য বলতে কি, অহংকারীদের এই ঠিকানা বড়ই নিকৃষ্ট।

মেনে চলতে প্রস্তুত নয়। তারা যে পথে চলছে সেটি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কিনা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখা ও বিচার–বিশ্লেষণ করার কোন পরোয়াই তাদের নেই।

২১. এখান থেকে ভাষণের মোড় অন্যদিকে ফিরে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলায় মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব শয়তানী কাজ–কারবার চালানো হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হচ্ছিল, ঈমান না আনার জন্য যেসব বাহানাবাজী করা হচ্ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি আনা হচ্ছিল, —সবগুলোকে এক একটি করে পর্যালোচনা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে উপদেশ দান, ভয় দেখানো ও নসিহত করা হয়েছে।

২২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের চর্চা যখন চারদিকে হতে লাগলো তখন মক্কার লোকেরা যেখানেই যেতো সেখানেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের ওখানে যে ব্যক্তি নবী হয়ে এসেছেন তিনি কি শিক্ষা দেন? কুরআন কোন্‌ ধরনের কিতাব তার মধ্যে কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মক্কার কাফেররা সবসময় এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতো যাতে প্রশ্নকারীর মনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে কিতাবটি এনেছেন সে সম্পর্কে কোন না কোন সন্দেহ জাগতো অথবা কমপক্ষে তার মনে নবীর বা তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সকল প্রকার আগ্রহ খতম হয়ে যেতো।

২৩. আগের বাক্যটি এবং এ বাক্যটির মাঝখানে একটি সূক্ষ্মতর ফাঁক রয়ে গেছে। শ্রোতা নিজেই সামান্য চিন্তা–ভাবনা করে এ ফাঁকটুকু পূর্ণ করতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে, মহান আল্লাহ যখন এ প্রশ্ন করবেন তখন হাশরের ময়দানে চারদিকে গভীর নীরবতা বিরাজ করবে। কাফের ও মুশরিকদের কন্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব থাকবে না। তাই তারা নির্বাক হয়ে যাবে এবং তত্ব–জ্ঞানীরা পরস্পর এসব কথা বলাবলি করতে থাকবে।

২৪. তত্ত্ব–জ্ঞানীদের উক্তির সাথে একথাটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহ নিজেই ব্যাখ্যামূলকভাবে বলছেন। যারা এটাকেও তত্ত্ব–জ্ঞানীদের উক্তি মনে করেছেন তাদের এক্ষেত্রে বড়ই জটিল ব্যাখ্যা তৈরী করতে হয়েছে এবং তারপরও তাদের কথা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারেনি।

২৫. অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলো তাদের দেহ পিঞ্জর থেকে বের করে নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেয়।

২৬. এ আয়াত এবং এর পরবর্তী যে আয়াতে মৃত্যুর পর মুত্তাকী ও ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজীদের এমন ধরনের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্টভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে। হাদীসে "আলমে বর্‌যখ"–এর জন্য কবর শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে এর অর্থ হয় এমন একটি জগত যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যু লাভ করার পর থেকে নিয়ে পরবর্তী পুনরুত্থান লাভ করার প্রাক্কালে প্রথম ধাক্কা খাওয়া পর্যন্ত মানবিক রূহগুলো অবস্থান করবে। হাদীস অস্বীকারকারীদের জোর বক্তব্য হচ্ছে, এ জগতটি একটি নিরেট শূন্যতার জগত ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে কারো কোন অনুভূতি ও চেতনা থাকবে না এবং কোন আযাব বা সওয়াবও কারো হবে না। কিন্তু এখানে দেখুন, কাফেরদের মৃত্যু হবার পর তাদের রূহগুলো মৃত্যু পারের জগতে গিয়ে সেখানকার অবস্থা নিজেদের প্রত্যাশার বিপরীত পেয়ে হতবাক হয়ে যায় এবং সংগে সংগেই ফেরেশতাদেরকে অভিবাদন করে এ মর্মে নিশ্চয়তা দান করার চেষ্টা করতে থাকে যে, তারা কোন খারাপ কাজ করছিল না। জবাবে ফেরেশতারা তাদেরকে ধমক দেন এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার আগাম খবর দিয়ে দেন। অন্যদিকে মুত্তাকীদের মৃত্যুর পর ফেরেশতারা তাদের রূহকে সালাম করেন এবং তাদেরকে জান্নাতী হবার জন্য আগাম মোবারকবাদ দেন। বর্‌যখের জীবন, অনুভূতি, চেতনা, আযাব ও সওয়াবের জন্য কি এরচেয়ে বেশী প্রমাণের প্রয়োজন আছে? সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াতে প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তুর আলোচনা এসেছে। সেখানে যেসব মুসলমান হিজরত করেনি তাদের মৃত্যুর পর তাদের রূহের সাথে ফেরেশতাদের কথাবার্তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আবার সূরা মু'মিনের ৪৫–৪৬ আয়াতে এসবের চাইতে বেশী সুস্পষ্ট ভাষায় বর্‌যখের আযাবের কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ ফেরাউন ও ফেরাউনের পরিবারবর্গ সম্পর্কে বলেছেন, "একটি কঠিন আযাব তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ সকাল–সাঁঝে তাদেরকে আগুনের সামনে নিয়ে আসা হয়। তারপর যখন কিয়ামতের সময় এসে যাবে তখন হুকুম দেয়া হবে—ফেরাউনের পরিবারবর্গকে কঠিনতম আযাবের মধ্যে ঠেলে দাও।"

মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের অবস্থাটি সম্পর্কে আসলে কুরআন ও হাদীস উভয় থেকে একই চিত্র পাওয়া যায়। এ চিত্রটি হচ্ছে ঃ মৃত্যু নিছক দেহ ও রূহের আলাদা হয়ে যাবার নাম,—সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নাম নয়। দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবার পর রূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না বরং দুনিয়াবী জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানসিক ও নৈতিক উপার্জনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার সবটুকু সহকারে জীবিত থাকে। এ অবস্থায় রূহের চেতনা অনুভূতি, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অবস্থা অনেকটা স্বপ্নের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। একটি অপরাধী রূহকে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর তার আযাব ও

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوْا خَيْرًا ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۭ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۤءُوْنَ ۭ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

অন্যদিকে যখন মুত্তাকীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কী নাযিল হয়েছে, তারা জবাব দেয়, "সর্বোত্তম জিনিস নাযিল হয়েছে।"[২৭] এ ধরনের সৎকর্মশীলদের জন্য এ দুনিয়াতেও মংগল রয়েছে এবং আখেরাতের আবাস তো তাদের জন্য অবশ্যি উত্তম। বড়ই ভালো আবাস মুত্তাকীদের, চিরন্তন অবস্থানের জান্নাত, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী এবং সব কিছুই সেখানে তাদের কামনা অনুযায়ী থাকবে।[২৮] এ পুরস্কার দেন আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে।

যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে যাওয়া এবং তাকে দোযখের সামনে উপস্থাপিত করা —এসব কিছু এমন একটি অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে যা একজন খুনের আসামীকে ফাঁসী দেবার তারিখের একদিন আগে একটি ভয়ংকর স্বপ্নের আকারে তার কাছে উপস্থিত হয়। অনুরূপভাবে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ রূহের সম্বর্ধনা, তারপর তার জান্নাতের সুখবর শোনা এবং জান্নাতের বাতাস ও খোশবুতে আপ্লুত হওয়া—এসব কিছুও এমন একজন কর্মচারীর স্বপ্নের সাথে মিলে যায় যে সুচারুরূপে নিজের কাজ সম্পন্ন করার পর সরকারের ডাঁকে হেড কোয়ার্টারে হাযির হয় এবং সাক্ষাতকারের জন্য চুক্তিবদ্ধ তারিখের একদিন আগে ভবিষ্যত পুরস্কারের প্রত্যাশাদীপ্ত একটি মধুর স্বপ্ন দেখে। শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকারে এ স্বপ্ন হঠাৎ ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। এবং অকস্মাত নিজেদেরকে দেহ ও রূহ সহকারে হাশরের ময়দানে জীবিত অবস্থায় পেয়ে অপরাধীরা অবাক হয়ে বলবে, يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا (আরে, আমাদের শয়নগৃহ থেকে আমাদের উঠিয়ে আনলো কে?)। কিন্তু ঈমানদাররা পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে বলবে, هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ (করুণাময় আল্লাহ এ জিনিসেরই ওয়াদা করেছিলেন এবং রসূলদের বর্ণনা সঠিক ছিল)। অপরাধীদের তাৎক্ষণিক অনুভূতি তখন এ হবে যে, তারা নিজেদের শয়নগৃহে (দুনিয়ায় মৃত্যুর বিছানায় যেখানে তারা প্রাণ ত্যাগ করেছিল) সম্ভবত ঘন্টাখানেকের মতো সময় শয়ন করে থাকবে এবং হঠাৎ এ দুর্ঘটনায় চোখ খোলার সাথে সাথেই কোথাও দৌড়ে চলছে। অন্যদিকে ঈমানদাররা পূর্ণ মানসিক ধৈর্য সহকারে বলবে :

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

এমন মুত্তাকীদেরকে, যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা যখন মৃত্যু ঘটায় তখন বলে, "তোমাদের প্রতি শান্তি, যাও নিজেদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করো।"

হে মুহাম্মাদ! এখন যে এরা অপেক্ষা করছে, এ ক্ষেত্রে এখন ফেরেশ্তাদের এসে যাওয়া অথবা তোমার রবের ফায়সালা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কী বাকি রয়ে গেছে?[২৯] *এ ধরনের হঠকারিতা এদের আগে আরো অনেক লোক করেছে। তারপর তাদের সাথে যা কিছু হয়েছে তা তাদের ওপর আল্লাহর জুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই জুলুম ছিল যা তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছিল। তাদের কৃতকর্মের অনিষ্টকারিতা শেষপর্যন্ত তাদের ওপরই আপতিত হয়েছে এবং যেসব জিনিসকে তারা ঠাট্টা করতো সেগুলোই তাদের ওপর চেপে বসেছে।*

"আল্লাহর দফতরে তোমরা তো হাশরের দিন পর্যন্ত অবস্থান করতে থেকেছো, আর এ সেই হাশরের দিন কিন্তু তোমরা এ জিনিসটি জানতে না।"

২৭. অর্থাৎ মক্কার বাইরের লোকেরা যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি যে শিক্ষা এনেছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তাদের জবাব মিথ্যুক ও অবিশ্বাসী কাফেরদের জবাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়। তারা মিথ্যা প্রচারণা চালায় না। তারা জনগণকে ধোঁকা দেবার ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে না। তারা নবীর এবং তিনি যে শিক্ষা এনেছেন তার প্রশংসা করে এবং সঠিক পরিস্থিতি লোকদেরকে জানায়।

২৮. এ হচ্ছে জান্নাতের আসল সংজ্ঞা। সেখানে মানুষ যা চাইবে তা পাবে। তার ইচ্ছা ও পছন্দ বিরোধী কোন কাজই সেখানে হবে না। দুনিয়ায় কোন প্রধান ব্যক্তি, কোন প্রধান নেতা এবং কোন বিশাল রাজ্যের অধিকারী বাদশাহও কোন দিন এ নিয়ামত লাভ করেনি। দুনিয়ায় এ ধরনের নিয়ামত লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৫ রুকূ'

এ মুশরিকরা বলে, "আল্লাহ চাইলে তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত আমরাও করতামনা, আমাদের বাপ–দাদারাও করতো না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতো না।"[৩০] এদের আগের লোকেরাও এমনি ধরনের বাহানাবাজীই চালিয়ে গেছে।[৩১] তাহলে কি রসূলদের ওপর সুস্পষ্ট বাণী পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব আছে? প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী পরিহার করো।"[৩২] এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে।[৩৩] তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[৩৪]

জান্নাতের প্রত্যেক অধিবাসীই সেখানে আনন্দ ও উপভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যাবে। তার জীবনে সর্বক্ষণ সবদিকে সবকিছু হবে তার ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী। তার প্রত্যেকটি আশা সফল হবে, প্রত্যেকটি কামনা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং প্রত্যেকটি ইচ্ছা ও আকাংখা বাস্তবায়িত হবে।

২৯. উপদেশ ও সতর্কবাণী হিসেবে একথা কয়টি বলা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে, যতদূর বুঝাবার ব্যাপার ছিল তুমি তো প্রত্যেকটি সত্যকে উন্মুক্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছো। যুক্তির সাহায্যে তার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছো। বিশ্বজাহানের সমগ্র ব্যবস্থা থেকে এর পক্ষে সাক্ষ উপস্থাপন করেছো। কোন বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শিরকের ওপর অবিচল থাকার কোন অবকাশই রাখোনি। এখন এরাই একটি সরল সোজা কথা মেনে নেবার

ব্যাপারে ইতস্তত করছে কেন? এরা কি মউতের ফেরেশতার অপেক্ষায় আছে? এ ফেরেশতা সামনে এসে গেলে তখন জীবনের শেষ মুহূর্তে কি এরা তা মেনে নেবে? অথবা আল্লাহর আযাব সামনে এসে গেলে তার প্রথম আঘাতের পর তা মেনে নেবে?

৩০. সূরা আন'আমের ১৪৮—১৪৯ আয়াতেও মুশরিকদের এ যুক্তি উত্থাপন করে এর জবাব দেয়া হয়েছে। সেই আয়াতগুলো এবং সেখানে বর্ণিত টীকা সামনে থাকলে এ বিষয়টি অনুধাবন করা বেশী সহজ হবে। (দেখুন সূরা আন'আম ১২৪—১২৬ টীকা)।

৩১. অর্থাৎ এটা কোন নতুন কথা নয়। আজ তোমরা আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের কারণ হিসেবে পেশ করছো। এটা অতি পুরাতন যুক্তি। বিভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের বিবেককে ধোঁকা দেবার এবং উপদেশদাতাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এ যুক্তি আউড়ে আসছে। এটা হচ্ছে মুশরিকদের যুক্তির প্রথম জবাব। এ জবাবটির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে একথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে যে, মাত্র এখনই কয়েক লাইন আগেই "ওগুলো তো পুরাতন যুগের বস্তাপচা কাহিনী" বলে কুরআনের বিরুদ্ধে মুশরিকদের প্রচারণার উল্লেখ এসে গেছে। অর্থাৎ নবীর বিরুদ্ধে তাদের যেন এ আপত্তি ছিল যে, ইনি আবার নতুন কথাই বা কি বলছেন, সেই পুরানো কথাই তো বলে চলছেন। নূহের প্লাবনের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হাজার বার একথা বলা হয়েছে। এর জবাবে তাদের যুক্তি (যাকে তারা বড়ই শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে পেশ করতো) উদ্ধৃত করার পর এ সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, মহোদয়গণ। আপনারাই বা কোন্ অত্যাধুনিক? আপনারা এই যে চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন এতেও আদতেই কোন অভিনবত্ব নেই। এটিও বহুকালের বাসি–বস্তাপচা খোঁড়া যুক্তি। হাজার বছর থেকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টরা এ একই গীত গেয়ে আসছে। আপনারাও সেই পচা গীতটিই গেয়ে উঠেছেন।

৩২. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শিরক এবং নিজেদের তৈরী হালাল–হারামের বিধানের পক্ষে আমার ইচ্ছাকে কেমন করে বৈধতার ছাড়পত্র দানকারী হিসেবে পেশ করতে পারো? আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে নিজের রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের মাধ্যমে লোকদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আমার বন্দেগী করা। তাগুতের বন্দেগী করার জন্য তোমাদের পয়দা করা হয়নি। এভাবে আমি যখন পূর্বাহ্নেই ন্যায়সংগত পদ্ধতিতে তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি যে, তোমাদের এসব বিভ্রান্ত কাজ কারবারের পক্ষে আমার সমর্থন নেই তখন এরপর আমার ইচ্ছাকে ঢাল বানিয়ে তোমাদের নিজেদের ভ্রষ্টতাকে বৈধ গণ্য করা পরিষ্কারভাবে একথাই ব্যক্ত করছে যে, তোমরা চাচ্ছিলে আমি উপদেশদাতা রসূল পাঠাবার পরিবর্তে এমন রসূল পাঠাতাম যিনি তোমাদের হাত ধরে ভুল পথ থেকে টেনে সরিয়ে নিতেন এবং জোর করে তোমাদেরকে সত্য সঠিক পথে পরিচালিত করতেন। (আল্লাহর অনুমতিদান ও পছন্দ করার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করার জন্য সূরা আন'আমের ৮০ এবং সূরা যুমারের ২০ টীকা দেখুন)।

৩৩. অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর আগমনের পর তাঁর জাতি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একদল তাঁর কথা মেনে নিয়েছে (আল্লাহ তাদেরকে এ মেনে নেয়ার তাওফীক দিয়েছিলেন) এবং অন্য দলটি নিজেদের গোমরাহীর ওপর অবিচল থেকেছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন'আম ২৮ টীকা)।

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

হে মুহাম্মাদ! তুমি এদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য যতই আগ্রহী হও না কেন, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে আর সঠিক পথে পরিচালিত করেন না আর এ ধরনের লোকদের সাহায্য কেউ করতে পারে না।

এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, "আল্লাহ কোন মৃতকে পুনর্বার জীবিত করে উঠাবেন না।"—কেন উঠাবেন না? এতো একটি ওয়াদা, যেটি পুরা করা তিনি নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না, আর এটি হওয়া এ জন্য প্রয়োজন যে, এরা যে সত্যটি সম্পর্কে মতবিরোধ করছে আল্লাহ সেটি এদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন এবং সত্য অস্বীকারকারীরা জানতে পারবে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।[৩৫] (এর সম্ভাবনার ব্যাপারে বলা যায়) কোন জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই "হয়ে যাও" এবং তা *হয়ে যায়।*

৩৪. অর্থাৎ নিশ্চয়তা লাভ করার জন্য অভিজ্ঞতার চাইতে আর কোন বড় নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নেই। এখন তুমি নিজেই দেখে নাও, মানব ইতিহাসের একের পর এক অভিজ্ঞতা কি প্রমাণ করছে? আল্লাহর আযাব কার ওপর এসেছে– ফেরাউন ও তার দলবলের ওপর, না মূসা ও বনী ইসরাঈলের ওপর? সালেহকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের ওপর, না তাঁকে যারা মেনে নিয়েছিল তাদের ওপর? হূদ, নূহ ও অন্যান্য নবীদেরকে যারা অমান্য করেছিল তাদের ওপর, না মু'মিনদের ওপর? এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাগুলোর ফল কি এই দাঁড়িয়েছে যে, আমার ইচ্ছার কারণে যারা শিরক করার ও শরীয়াত গঠনের সুযোগ লাভ করেছিল তাদের প্রতি আমার সমর্থন ছিল? বরং বিপরীত পক্ষে এ ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে একথা প্রমাণ করছে যে, উপদেশ ও অনুশাসন সত্ত্বেও যারা এসব গোমরাহীর ওপর ক্রমাগত জোর দিয়ে চলেছে। আমার ইচ্ছাশক্তি

তাদেরকে অপরাধ করার অনেকটা সুযোগ দিয়েছে। তারপর তাদের নৌকা পাপে ভরে যাবার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩৫. এ বক্তব্য থেকে মৃত্যুর পরের জীবন এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অপরিহার্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। দুনিয়ায় যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সত্য সম্পর্কে অসংখ্য মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এসব মতবিরোধের ভিত্তিতে বংশ, গোত্র, জাতি ও পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোরই ভিত্তিতে বিভিন্ন মতাদর্শের ধারকরা নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা তৈরী অথবা গ্রহণ করে নিয়েছে। এক একটি মতাদর্শের সমর্থন ও পক্ষপাতিত্বে হাজার হাজার লাখো লাখো লোক বিভিন্ন সময় ধন, প্রাণ, ইজ্জত-আবরু সব কিছু কুরবানী করে দিয়েছে। আর এ মতাদর্শের সমর্থকদের মধ্যে বহু সময় এমন মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছে যে, তারা একদল অন্যদলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করেছে এবং যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল তারা এ অবস্থায়ও নিজেদের দৃষ্টিভংগী পরিহার করেনি। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর মননশীল মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এই যে, এক সময় না এক সময় সঠিক ও নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হোক যথার্থই তাদের মধ্যে হক কি ছিল এবং বাতিল কি ছিল, কে সত্যপন্থী ছিল এবং কে মিথ্যাপন্থী। এ দুনিয়ায় এ যবনিকা সরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাই এমন যে, এখানে সত্য কোনদিন পরদার বাইরে আসতে পারে না। কাজেই বিবেকের এ দাবী পূরণ করার জন্য ভিন্ন আরেকটি জগতের প্রয়োজন।

আর এটি শুধুমাত্র বিবেক-বুদ্ধির দাবীই নয় বরং নৈতিকতারও দাবী। কেননা, এসব মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে বহুদল অংশ নিয়েছে। কেউ জুলুম করেছে এবং কেউ জুলুম সহ্য করেছে। কেউ কুরবানী দিয়েছে এবং কেউ সেই কুরবানী আদায় করে নিয়েছে। প্রত্যেকে নিজের মতাদর্শ অনুযায়ী একটি নৈতিক দর্শন ও একটি নৈতিক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছে এবং তা থেকে কোটি কোটি মানুষের জীবন ভালো বা মন্দ প্রভাব গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি সময় অবশ্যি হওয়া উচিত যখন এদের সবার নৈতিক ফলাফল ভালো বা মন্দের আকারে প্রকাশিত হবে। এ দুনিয়ার ব্যবস্থা যদি সঠিক ও পূর্ণাংগ নৈতিক ফলাফলের প্রকাশকে ধারণ করতে অপারগ হয় তাহলে অবশ্যি অন্য একটি দুনিয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত যেখানে এ ফলাফলের প্রকাশ সম্ভব হতে পারে।

৩৬. অর্থাৎ লোকেরা মনে করে, মরার পর মানুষকে পুনরবার সৃষ্টি করা এবং সামনের পেছনের সমগ্র মানব-কূলকে একই সংগে পুনরুজ্জীবিত করা বড়ই কঠিন কাজ। অথচ আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। নিজের কোন সংকল্প পূর্ণ করার জন্য তাঁর কোন সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ ও পরিবেশের আনুকুল্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশেই পূর্ণ হয়। তাঁর নির্দেশই সাজ-সরঞ্জামের জন্ম দেয়। তাঁর নির্দেশেই উপায়-উপকরণের উদ্ভব হয়। তাঁর নির্দেশই তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবেশ তৈরী করে। বর্তমানে যে দুনিয়ার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, এটিও নিছক হুকুম থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং অন্য দুনিয়াটিও মুহূর্তকালের মধ্যে শুধুমাত্র একটি হুকুমেই জন্ম লাভ করতে পারে।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৬ রুকূ'

যারা জুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই ভালো আবাস দেবো এবং আখেরাতের পুরস্কার তো অনেক বড়।[৩৭] *হায়! যে মজলুমরা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে কাজ করছে তারা যদি জানতো (কেমন চমৎকার পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে)।*

হে মুহাম্মাদ! তোমার আগে আমি যখনই রসূল পাঠিয়েছি, মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি নিজের অহী প্রেরণ করতাম।[৩৮] *যদি তোমরা নিজেরা না জেনে থাকো তাহলে বাণীওয়ালাদেরকে জিজ্ঞেস করো।*[৩৯]

৩৭. যেসব মুহাজির কাফেরদের অসহনীয় জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে হাবশায় (ইথিয়োপিয়া) হিজরত করেছিলেন এখানে তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আখেরাত অস্বীকারকারীদের কথার জবাব দেবার পর অকস্মাত হাবশার মুহাজিরদের প্রসংগ উত্থাপন করার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় নিহিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মক্কার কাফেরদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, ওহে জালেমের দল! এ ধরনের জুলুম নির্যাতন চালাবার পর এখন তোমরা মনে করছো তোমাদেরকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং মজলুমদের প্রতিশোধ নেবার সময় কখনো আসবে না।

৩৮. এখানে মক্কার মুশরিকদের একটি আপত্তি উদ্ধৃত না করেই তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ আপত্তিটি ইতিপূর্বে সকল নবীর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়েছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীনরাও তাঁর কাছে বারবার এ আপত্তি জানিয়েছিল। এ আপত্তিটি ছিল এই যে, আপনি আমাদের মতই একজন মানুষ, তাহলে আল্লাহ আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন আমরা একথা কেমন করে মেনে নেবো?

৩৯. "বাণী ওয়ালা" অর্থাৎ আহলি কিতাবদের আলেম সমাজ এবং আরো এমন সব লোক যারা নাম-করা আলেম না হলেও মোটামুটি আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা এবং পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন বৃত্তান্ত জানেন।

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾ اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

আগের রসূলদেরকেও আমি উজ্জ্বল নিদর্শন ও কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং এখন এ বাণী তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো। যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে ৪০ *এবং যাতে লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা–ভাবনা করে।*

তারপর যারা (নবীর দাওয়াতের বিরোধিতায়) নিকৃষ্টতম চক্রান্ত করছে তারা কি এ ব্যাপারে একেবারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব আসবে না যেদিক থেকে তার আসার ধারণা–কল্পনাও তারা করেনি?

৪০. ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ শুধু মুখে নয় বরং নিজের কাজের মাধ্যমেও এবং নিজের নেতৃত্বে একটি মুসলিম সমাজ গঠন করেও আর এই সংগে 'আল্লাহর যিকির' তথা কিতাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ সমাজ পরিচালনা করেও।

এভাবে একজন মানুষকেই নবী বানিয়ে পাঠানোর পেছনে যে নিগূঢ় যৌক্তিকতা নিহিত ছিল মহান আল্লাহ সে যৌক্তিকতাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। 'যিকির' বা আল্লাহর বাণী ফেরেশতাদের মাধ্যমেও পাঠানো যেতো। সরাসরি ছাপিয়ে প্রত্যেকটি মানুষের হাতেও পৌঁছানো যেতে পারতো। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ স্বীয় সুগভীর প্রজ্ঞা, করুণা ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের আলোকে এ যিকির বা অহী অবতারণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন শুধুমাত্র ছাপানো একখানা গ্রন্থ বা পুস্তিকা পাঠিয়ে দিলেই সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারতো না। এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যা অপরিহার্য ছিল তা হলো একজন যোগ্যতম মানুষ তা সাথে করে নিয়ে আসবেন, তিনি তাকে একটু একটু করে লোকদের সামনে পেশ করবেন। যারা এর কোন কথা বুঝতে পারবে না তাদেরকে তার অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। যাদের এর কোন ব্যাপারে সন্দেহ থাকবে তাদের সন্দেহ দূর করে দেবেন। যাদের কোন ব্যাপারে আপত্তি ও প্রশ্ন থাকবে তাদের আপত্তি ও প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবেন। যারা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং এর বিরোধিতা করতে ও একে বাধা দিতে এগিয়ে আসবে তাদের মোকাবিলায় তিনি এমন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করবেন, যা এই যিকির বা আল্লাহর বাণীর ধারকদের উপযোগী। যারা মেনে নেবে তাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে পথনির্দেশনা দান করবেন।

নিজের জীবনকে তাদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করবেন। তাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে অনুশীলন দান করে সারা দুনিয়ার সামনে এমন একটি সমাজকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরবেন যার সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা হবে "যিকির" এর উদ্দেশ্যের বাস্তব ব্যাখ্যা।

যেসব নবুওয়াত অস্বীকারকারী আল্লাহর "যিকির" মানুষের মাধ্যমে আসাকে মেনে নিতে পারেনি তাদের জবাব হিসেবে এ আয়াতটি যেমন চূড়ান্ত তেমনি যেসব হাদীস অস্বীকারকারী নবীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া শুধুমাত্র "যিকির"-কে গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্যও এটি চূড়ান্ত জবাব। তাদের দাবি যদি এ হয়ে থাকে যে, নবী কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি, শুধুমাত্র যিকির পেশ করেছিলেন, অথবা নবীর ব্যাখ্যা নয় শুধুমাত্র যিকিরই গ্রহণযোগ্য, কিংবা এখন আমাদের জন্য শুধুমাত্র যিকির যথেষ্ট, নবীর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই, অথবা এখন একমাত্র 'যিকির'ই নির্ভরযোগ্য অবস্থায় টিকে রয়েছে, নবীর ব্যাখ্যা টিকে নেই আর টিকে থাকলেও তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়— এ চারটি বক্তব্যের মধ্যে যে কোনটিতেই তারা বিশ্বাসী হোক না কেন তাদের এ মতবাদ কুরআনের এ আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল।

যদি তারা প্রথম মতটির প্রবক্তা হয় তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, যে উদ্দেশ্যে যিকিরকে ফেরেশতাদের হাত দিয়ে পাঠাবার বা সরাসরি লোকদের কাছে পৌছিয়ে দেবার পরিবর্তে নবীকে প্রচারের মাধ্যম করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্যই তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

আর যদি তারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় মতটির প্রবক্তা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ নিজেই নিজের "যিকির" একজন নবীর মাধ্যমে পাঠিয়ে একটা বাজে কাজ করেছেন। কারণ যিকিরকে শুধুমাত্র মুদ্রিত আকারে নবী ছাড়াই সরাসরি পাঠালে যে ফল হতো নবী আগমনের ফলও তার চাইতে ভিন্ন কিছু নয়।

আর যদি তারা চতুর্থ কথাটির প্রবক্তা হয় তাহলে এটি আসলে কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত উভয়টিকেই নাকচ করে দেবার ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর যারা একটি নতুন নবুওয়াত ও নতুন অহীর প্রবক্তা একমাত্র তাদের মতবাদ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত মতামত থাকে না। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ নিজেই কুরআন মজীদের নাযিলের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নবীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে অপরিহার্য গণ্য করছেন আবার নবী যিকিরের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করবেন একথা বলে নবীর প্রয়োজন প্রমাণ করছেন। এখন যদি হাদীস অস্বীকারকারীরা একথা বলে যে, নবীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান নেই তাহলে স্পষ্টতই এ বক্তব্য থেকে দু'টো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথম সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত খতম হয়ে গেছে এবং এখন আমাদের সম্পর্ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শুধুমাত্র তেমন পর্যায়ের রয়ে গেছে যেমন আছে হূদ (আ), সালেহ (আ) ও শোআইব (আ)-এর সাথে। আমরা তাঁদেরকে সত্য নবী বলে মানি তাঁদের প্রতি ঈমান আনি কিন্তু তাঁদের এমন কোন অনুকরণীয় আদর্শ আমাদের কাছে নেই যা আমরা মেনে চলতে পারি। এ যুক্তি মেনে নিলে একটি নতুন নবুওয়াতের প্রয়োজন আপনা থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর কেবলমাত্র একজন নির্বোধই খতমে নবুওয়াতের জন্য পীড়াপীড়ি করতে পারে। এর দ্বিতীয় ফলটি হচ্ছে,

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾ সেজদা

অথবা আচমকা চলাফেরার মধ্যে তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? কিংবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না যখন তারা নিজেরাই আগামী বিপদের জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাবে এবং তার হাত থেকে বাঁচার চিন্তায় সতর্ক হবে? তিনি যাই কিছু করতে চান তারা তাঁকে নিষ্ক্রিয় করার ক্ষমতা রাখে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তোমাদের রব বড়ই কোমল হৃদয় ও করুণাময়।

আর তারা কি আল্লাহর সৃষ্ট কোন জিনিসই দেখে না, কিভাবে তার ছায়া ডাইনে বাঁয়ে ঢলে পড়ে আল্লাহকে সিজদা করছে?[৪১] সবাই এভাবে দীনতার প্রকাশ করে চলছে। পৃথিবী ও আকাশে যত সৃষ্টি আছে প্রাণসত্তা সম্পন্ন এবং যত ফেরেশতা আছে তাদের সবাই রয়েছে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত।[৪২] তারা কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করে না। ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের ওপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে।

যেহেতু নবীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআন একা তার প্রেরণকারীর বক্তব্য অনুযায়ী পথপ্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়, তাই কুরআনের ভক্তরা যতই জোরেশোরে চিৎকার করে শুধুমাত্র একাকী কুরআনকে যথেষ্ট বলুক না কেন, মূল দাবীদারের দাবী যখন দুর্বল, তখন সাক্ষীদের সাক্ষ যত সবলই হোক না কেন, তা কোন কাজেই লাগতে পারে না। এ অবস্থায় স্বতস্ফূর্তভাবে একটি নতুন কিতাব নাযিল হবার প্রয়োজন কুরআনের দৃষ্টিতেই প্রমাণ হয়ে যায়। আল্লাহ এহেন উদ্ভট বক্তব্যের প্রবক্তাদেরকে ধ্বংস করুন। এভাবে তারা হাদীস অস্বীকারের মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে মূলত দীন ইসলামের শিকড় কাটছে।

৪১. অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট সমস্ত জিনিসের ছায়া থেকে এ আলামতই জাহির হচ্ছে যে, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ সবাই একটি বিশ্বজনীন আইনের

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰـهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥١﴾ وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৭ রুকূ'

আল্লাহর ফরমান হলো, দুই ইলাহ গ্রহণ করো না,[৪৩] ইলাহ তো মাত্র একজন, কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো। সবকিছুই তাঁরই, যা আকাশে আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই দীন (সমগ্র বিশ্ব জাহানে) চলছে।[৪৪] এরপর কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে?[৪৫]

তোমরা যে নিয়ামতই লাভ করেছো তাতো আল্লাহরই পক্ষ থেকে, তারপর যখন তোমরা কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হও তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াতে থাকো।[৪৬]

শৃংখলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সবার কপালে আঁকা আছে বন্দেগী ও দাসত্বের টিকা। আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে কারোর সামান্যতম অংশও নেই। কোন জিনিসের ছায়া থাকলে বুঝতে হবে, সেটি একটি জড় বস্তু। আর জড় বস্তু হওয়ার অর্থ হলো, সেটি একটি সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার অনুগত গোলাম। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

৪২. অর্থাৎ শুধু পৃথিবীরই নয়, আকাশেরও এমন সব বস্তু, পিণ্ড বা সত্ত্বা যাদেরকে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষ দেব-দেবী এবং আল্লাহর আত্মীয়-স্বজন গণ্য করে এসেছে, তারা আসলে গোলাম ও তাবেদার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মধ্যেও কারোর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় কোন অংশ নেই।

পরোক্ষভাবে এ আয়াত থেকে এদিকে একটি ইংগিত এসেছে যে, প্রাণসত্তা সম্পন্ন সৃষ্টি কেবলমাত্র দুনিয়াতেই নয় বরং মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও আছে। একথাটিই সূরা শূরার ২৯ আয়াতেও বলা হয়েছে।

৪৩. দুই ইলাহ বা খোদা নাকচ করে দেবার মধ্য দিয়ে দু'য়ের অধিক ইলাহকেও আপনা আপনিই নাকচ করা হয়ে যায়।

৪৪. অন্য কথায় তাঁর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতেই এ সৃষ্টি জগতের সমগ্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

কিন্তু যখন আল্লাহ সেই সময়কে হটিয়ে দেন তখন সহসাই তোমাদের একটি দল নিজেদের রবের সাথে অন্যকে (এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে) শরীক করতে থাকে,[৪৭] যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করা যায়। বেশ, ভোগ করে নাও শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

এরা যাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেনা,[৪৮] আমার দেয়া রিযিক থেকে তাদের অংশ নির্ধারণ করে[৪৯]—আল্লাহর কসম, অবশ্যি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেমন করে তোমরা এ মিথ্যা রচনা করেছিলে?

এরা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান,[৫০] সুবহানাল্লাহ! এবং নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে তাদের কাছে যা কাংখিত[৫১] যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে, কারণ এই দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? —দেখো, কেমন খারাপ কথা যা এরা আল্লাহর ওপর আরোপ করে।[৫২] যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারাই তো খারাপ গুণের অধিকারী হবার যোগ্য। আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে মহত্তম গুণাবলী, তিনিই তো সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের বাড়াবাড়ি করার জন্য সংগে সংগে পাকড়াও করতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন একটি জীবকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। তারপর যখন সেই সময়টি এসে যায় তখন তা থেকে এক মুহূর্তও আগে পিছে হতে পারে না। আজ এরা দু'টি জিনিস আল্লাহর জন্য স্থির করছে যা এরা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে। আর এদের কণ্ঠ মিথ্যা উচ্চারণ করে যে, এদের জন্য শুধু মংগলই মংগল। এদের জন্য তো শুধু একটি জিনিসই আছে এবং তা হচ্ছে দোযখের আগুন। নিশ্চয়ই এদেরকে সবার আগে তার মধ্যে পৌঁছানো হবে।

৪৫. অন্য কথায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর ভীতি এবং অন্য কারোর অসন্তোষ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রবণতা কি তোমাদের জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হবে?

৪৬. অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিরাজমান এটি তাওহীদের একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ। কঠিন বিপদের মুহূর্তে যখন সমস্ত মনগড়া চিন্তা-ভাবনার রঙীন প্রলেপ অন্তর্হিত হয় তখন কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের যে আসল প্রকৃতি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ইলাহ, রব, মালিক ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের অধিকারী বলে মানে না তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আন'আমের ২৯ ও ৪১ টীকা এবং সূরা ইউনুসের ৩১ টীকা)।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে কোন বুযর্গ বা দেব-দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতারও নযরানা পেশ করতে থাকে এবং নিজেদের প্রত্যেকটি কথা থেকে একথা প্রকাশ করতে থাকে যে, তাদের মতে আল্লাহর এ মেহেরবানীর মধ্যে উক্ত

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾

আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মাদ! তোমার আগেও বহু জাতির মধ্যে আমি রসূল পাঠিয়েছি। (এর আগেও এ রকমই হতো) শয়তান তাদের খারাপ কার্যকলাপকে তাদের সামনে সুশোভন করে দেখিয়েছে (এবং রসূলদের কথা তারা মানেনি)। সেই শয়তানই আজ এদেরও অভিভাবক সেজে বসে আছে এবং এরা মর্মন্তুদ শাস্তির উপযুক্ত হচ্ছে। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব এ জন্য অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি এ মতভেদের তাৎপর্য এদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরো। যার মধ্যে এরা ডুবে আছে। এ কিতাব পথনির্দেশ ও রহমত হয়ে নাযিল হয়েছে তাদের জন্য যারা একে মেনে নেবে।[৫৩]

(তুমি দেখছো প্রত্যেক বর্ষাকালে) আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং তার বদৌলতে তিনি সহসাই মৃত জমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে যারা শোনে তাদের জন্য।[৫৩ক]

বুযর্গ বা দেব–দেবীর মেহেরবানীও অন্তরভুক্ত ছিল বরং তারাই মেহেরবানী করে আল্লাহকে মেহেরবানী করতে উদ্বুদ্ধ না করলে আল্লাহ কখনোই মেহেরবানী করতেন না।

৪৮. অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের মাধ্যমে তারা এ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেনি যে, আল্লাহ সত্যি তাদেরকে তাঁর শরীক করে রেখেছেন এবং নিজের প্রভুত্বের কিছু কাজ অথবা নিজের রাজ্যের কিছু এলাকা তাদের হাতে সোপর্দ করেছেন।

৪৯. অর্থাৎ তাদের জন্য নযরানা, ভেঁট ও অর্ঘ-পেশ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপার্জন ও কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে রাখতো।

৫০. আরব মুশরিকদের মাবুদদের মধ্যে দেবতাদের সংখ্যা ছিল কম, দেবীদের সংখ্যা ছিল বেশী। আর এ দেবীদের সম্পর্কে তাদের আকীদা ছিল এই যে, তারা আল্লাহর মেয়ে। এভাবে ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর মেয়ে গণ্য করতো।

৫১. অর্থাৎ পুত্র।

৫২. অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য এত বেশী লজ্জাজনক মনে করে থাকে, সেই কন্যা সন্তানকে আল্লাহর জন্য মনোনীত করতে তাদের কোনই দ্বিধা হয় না। অথচ আল্লাহর আদৌ কোন সন্তান থাকতে পারে এরূপ ধারণা করা একটি মহামূর্খতা ও চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই নয়। আরব মুশরিকদের এ কর্মনীতিকে এখানে একটি বিশেষ দিক দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ সম্পর্কে তাদের নিম্নমুখী চিন্তা-ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং তাদেরকে একথা বলে দেয়া যে, মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস আল্লাহর ব্যাপারে তাদেরকে দুঃসাহসী ও ঔদ্ধত্যশালী বানিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা এতই বিকারগ্রস্ত ও অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে যে, এ ধরনের কথা বলা তারা একটুও দোষণীয় মনে করে না।

৫৩. অন্য কথায় এ কিতাব নাযিল হওয়ার কারণে এরা একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে। কল্পনা, ভাব-বিলাস, কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের ভিত্তিতে যে অসংখ্য ও বিভিন্ন মতবাদ ও ধর্মে এরা বিভক্ত হয়ে গেছে সেগুলোর পরিবর্তে সবাই একমত হতে পারে সত্যের এমন একটি স্থায়ী বুনিয়াদ এদের নাগালের ভেতরে এসে গেছে। এখন এ নিয়ামতটি এসে যাওয়ার পরও যারা অতীতের অবস্থাকেই প্রাধান্য দিয়ে যাওয়ার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছে তাদের পরিণাম ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যারা এ কিতাবকে মেনে নেবে একমাত্র তারাই সত্য-সরল পথ পাবে এবং তারাই অঢেল বরকত ও রহমতের অধিকারী হবে।

৫৩ ক. অর্থাৎ প্রতি বছর তোমাদের চোখের সামনে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে, পৃথিবী একটি নিরস বিশুষ্ক প্রান্তরের মত পড়ে আছে। সেখানে জীবনের স্পন্দন নেই। ঘাস-লতা-গুল্ম-ফুল-পাতা-সবুজের চিহ্নই নেই। নেই কোন ধরনের পোকা মাকড়ের অস্তিত্ব। এ সময় এসে গেলো বর্ষার মওসুম। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে আসতেই এ মরা যমীনের বুক চিরে জীবনের তরংগ জেগে উঠতে থাকে। যমীনের বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা অসংখ্য বীজ সহসাই জেগে ওঠে। তাদের প্রত্যেকের মধ্য থেকে গত বর্ষায় জন্মলাভ করার পর মরে যাওয়া উদ্ভিদগুলো আবার মাথা চাড়া দেয়। গরমের মওসুমে নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল এমন সব অগণিত মৃত্তিকার কীট অকস্মাত আবার দেখা যায় যেমন বিগত বর্ষায় দেখা গিয়েছিল। নিজেদের জীবনে তোমরা এসব বারবার দেখতে থাকো। এরপরও নবীর মুখ থেকে একথা শুনে অবাক হয়ে যাও যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে পুনরবার জীবিত করবেন। এ অবাক হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তোমাদের পর্যবেক্ষণ বুদ্ধি-জ্ঞানহীন পশুদের পর্যবেক্ষণের মতই। তোমরা বিশ্বজাহানের বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব দেখো কিন্তু তার পেছনে স্রষ্টার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনগুলো দেখো না। অন্যথায় নবীর বর্ণনা শোনার পর তোমাদের মন অনিবার্যভাবে চিৎকার করে বলে উঠতো যে, 'এসব নিদর্শন যথার্থই নবীর বর্ণনাকে সমর্থন করে'।

৯ রুকূ'

আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর ও রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই, অর্থাৎ নির্ভেজাল দুধ,[৫৪] *যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর।*

(অনুরূপভাবে) খেজুর গাছ ও আংগুর লতা থেকেও আমি একটি জিনিস তোমাদের পান করাই, যাকে তোমরা মাদকেও পরিণত করো এবং পবিত্র খাদ্যেও।[৫৫] *বুদ্ধিমানদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি নিশানী।*

আর দেখো তোমার রব মৌমাছিদেরকে একথা অহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন ঃ[৫৬] *তোমরা পাহাড়–পর্বত, গাছপালা ও মাচার ওপর ছড়ানো লতাগুল্মে নিজেদের চাক নির্মাণ করো।*

৫৪. "গোবর ও রক্তের মধ্যস্থিত"–এর অর্থ হচ্ছে, পশু যে খাদ্য খায় তা থেকে তো একদিকে রক্ত তৈরী হয় এবং অন্যদিকে তৈরী হয় মলমূত্র। কিন্তু এ পশুদের স্ত্রী জাতির মধ্যে আবার এ একই খাদ্য থেকে তৃতীয় একটি জিনিসও তৈরী হয়। বর্ণ, গন্ধ, গুণ, উপকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে আগের দু'টি থেকে এটি সম্পূর্ণ আলাদা। তারপর বিশেষ করে গবাদি পশুর মধ্যে এর উৎপাদন এত বেশী হয় যে, তারা নিজেদের সন্তানদের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর মানুষের জন্যও এ উৎকৃষ্টতম খাদ্য বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করতে থাকে।

৫৫. এখানে আনুসংগিকভাবে এ ব্যাপারেও একটি পরোক্ষ আভাস দেয়া হয়েছে যে, ফলের এ রসের মধ্যে এমন উপাদানও রয়েছে যা মানুষের জন্য জীবনদায়ী খাদ্যে পরিণত হতে পারে, আবার এমন উপাদানও আছে যা পচে মাদক দ্রব্যে পরিণত হয়। এখন মানুষ এ উৎসটি থেকে পাকপবিত্র রিযিক গ্রহণ করবে, না বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে বিনষ্টকারী মদ গ্রহণ করবে, তা তার নিজের নির্বাচন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শরাব বা মদ যে পাক–পবিত্র রিযিক নয়, এখানে তাও জানা গেলো এবং এটি তার হারাম হওয়ার দিকে আর একটি পরোক্ষ ইংগিত।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

তারপর সব রকমের ফলের রস চোসো এবং নিজের রবের তৈরী করা পথে চলতে থাকো।[৫৭] এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রংগের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে নিরাময় মানুষের জন্য।[৫৮] অবশ্যি এর মধ্যেও একটি নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা–ভাবনা করে।[৫৯]

আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যুদান করেন,[৬০] আবার তোমাদের কাউকে নিকৃষ্টতম বয়সে পৌছিয়ে দেয়া হয়, যখন সবকিছু জানার পরেও যেন কিছুই জানে না।[৬১] প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহই জ্ঞানেও পরিপূর্ণ এবং ক্ষমতায়ও।

৫৬. অহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সূক্ষ্ম ও গোপন ইশারা, যা ইশারাকারী ও ইশারা গ্রহণকারী ছাড়া তৃতীয় কেউ টের পায় না। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শব্দটি ‘ইল্‌কা’ (মনের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা) ও ইল্‌হাম (গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যে শিক্ষা দান করেন তা যেহেতু কোন মক্‌তব, স্কুল বা শিক্ষায়তনে দেয়া হয় না বরং এমন সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে দেয়া হয় যে, বাহ্যত কাউকে শিক্ষা দিতে এবং কাউকে শিক্ষা নিতে দেখা যায় না, তাই একে কুরআনে অহী, ইল্‌কা ও ইল্‌হাম শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন এ তিনটি শব্দ আলাদা আলাদা পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। অহী শব্দটি নবীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ইল্‌হামকে আউলিয়া ও বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর ইল্‌কা শব্দটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থবোধক এবং সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু কুরআনে এ পারিভাষিক অর্থের পার্থক্যটা পাওয়া যায় না। এখানে আকাশের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সেই অনুযায়ী তার সব ব্যবস্থা পরিচালিত হয় (وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا - حم السجدة) পৃথিবীর ওপরও অহী নাযিল হয় এবং এর ইংগিত পাওয়ার সাথে সাথেই সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকে (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا - الزلزال) ফেরেশ্‌তাদের ওপরও অহী নাযিল হয় এবং সেই মোতাবেক

তারা কাজ করে (اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ - الانفال) মৌমাছিদেরকে তাদের সমস্ত কাজ অহীর (প্রকৃতিগত শিক্ষা) মাধ্যমে শেখানো হয়। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টিই দেখা যাচ্ছে। আর এই অহী কেবলমাত্র মৌমাছি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নেই বরং মাছের সাঁতার কাটা, পাখির উড়ে চলা, নবজাত শিশুর দুধ পান করার বিষয়টাও আল্লাহর অহীই শিক্ষা দান করে। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-অনুসন্ধান ছাড়াই একজন মানুষকে যে অব্যর্থ কৌশল বা নির্ভুল মত অথবা চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথ বুঝানো হয় তাও অহী। (وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوْسَى اَنْ اَرْضِعِيْهِ - القصص) এ অহী থেকে কোন একজন মানুষও বঞ্চিত নয়। দুনিয়ায় যত নতুন নতুন উদ্ভাবন ও কল্যাণকর আবিষ্কার হয়েছে যত বড় বড় শাসক, বিজেতা, চিন্তানায়ক ও লেখক যুগান্তকারী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদন করেছেন তার সবের পেছনেই এ অহীর কার্যকারিতা দেখা যায়। বরং সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা হচ্ছে এই যে, কখনো বসে বসে একটি কথা মনে হলো অথবা কোন কৌশল মাথায় এলো কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখা গেলো এবং পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেলো যে, অদৃশ্য থেকে পাওয়া সেটি তার জন্য একটি সঠিক পথনির্দেশনা ছিল।

এ বিভিন্ন ধরনের অহীর মধ্যে নবীদেরকে যে অহী করা হতো সেটি ছিল একটি বিশেষ ধরনের অহী। এ অহীটির বৈশিষ্ট অন্যান্য অহী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এতে যাকে অহী করা হয় সে এ অহী আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও নিশ্চিত থাকে। এ অহী হয় আকীদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও নির্দেশাবলী সংক্রান্ত। আর নবী এ অহীর মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ দেবেন এটিই হয় এর নাযিল করার উদ্দেশ্য।

৫৭. 'রবের তৈরী করা পথে' বলে মৌমাছিদের একটি দল যে ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতির আওতাধীনে কাজ করে সেই সমগ্র ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে। মৌচাকের আকৃতি ও কাঠামো তাদের দল গঠন প্রক্রিয়া, তাদের বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে কর্মবন্টন, তাদের আহার সংগ্রহের জন্য অবিরাম যাওয়া আসা এবং তাদের নিয়ম মাফিক মধু তৈরী করে তা ক্রমাগত গুদামে সঞ্চয় করতে থাকা—এসব হচ্ছে সেই পথ যা তাদের রব তাদের কাজ করার জন্য এমনভাবে সুগম করে দিয়েছেন যে, তাদের কখনো এ ব্যাপারে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয় না। এটা একটা নির্ধারিত ব্যবস্থা। এরি ভিত্তিতে একটি বাঁধাধরা নিয়মে এ অগণিত চিনিকলগুলো হাজার হাজার বছর ধরে কাজ করে চলেছে।

৫৮. মধু যে একটি উপকারী ও সুস্বাদু খাদ্য তা কারোর অজানা নেই। তাই একথাটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে তার মধ্যে যে রোগ নিরাময় শক্তি আছে একথাটা তুলনামূলকভাবে একটি অজানা বিষয়। এ জন্য একথাটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। মধু প্রথমত কোন কোন রোগে এমনিতেই উপকারী। কেননা, তার মধ্যে রয়েছে ফুল ও ফলের রস এবং তাদের উন্নত পর্যায়ের গ্লুকোজ। তারপর মধুর একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা নিজে কখনো পচে না এবং অন্য জিনিসকেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের মধ্যে পচন থেকে সংরক্ষিত রাখে। এর ফলে ঔষধ তৈরী করার জন্য তার সাহায্য গ্রহণ করার মত যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্যই ঔষধ নির্মাণ শিল্পে আল-কোহলের পরিবর্তে মধুর ব্যবহার

শত শত বছর থেকে চলে আসছে। তাছাড়া মৌমাছি যদি এমন কোন এলাকায় কাজ করে যেখানে কোন বিশেষ ধরনের বনৌষধি বিপুল পরিমাণ পাওয়া যায় তাহলে সেই এলাকার মধু নিছক মধুই হয় না বরং তা ঐ ঔষধির সর্বোত্তম উপাদান ধারণ করে এবং যে রোগের ঔষধ আল্লাহ্ ঐ ঔষধির মধ্যে তৈরী করেছেন তার জন্যও তা উপকারী হয়। যদি যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী মৌমাছিদের সাহায্যে এ কাজ করানো হয় এবং বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষের উপাদান তাদের সাহায্যে বের করে তাদের মধু আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষিত হয় তাহলে আমাদের মতে এ মধু ল্যাবরেটরীতে তৈরী উপাদানের চেয়ে বেশী উপকারী প্রমাণিত হবে।

৫৯. এ গোটা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের দ্বিতীয় অংশের সত্যতা সপ্রমাণ করা। দু'টি কারণেই কাফের ও মুশরিকরা তাঁর বিরোধিতা করতো। এক, তিনি পরকালীন জীবনের ধারণা পেশ করেন। এ ধারণা চরিত্র ও নৈতিকতার সমগ্র নকশাটাই বদলে দেয়। দুই, তিনি কেবলমাত্র এক আল্লাহকেই মাবুদ, আনুগত্য করার যোগ্য, সংকট থেকে উদ্ধারকারী ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী গণ্য করেন। এর ফলে শিরক ও নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমগ্র জীবন ব্যবস্থাটাই ভ্রান্ত গণ্য হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের উপরোক্ত দু'টি অংশকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এখানে বিশ্বজাহানের নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, নিজের চারপাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখো, সর্বত্র এই যে চিহ্নগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলো কি নবীর বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে, না তোমাদের কাল্পনিক চিন্তা–ভাবনা ও কুসংস্কারকে সত্য প্রমাণ করছে? নবী বলেন, মরার পর তোমাদের আবার জীবিত করা হবে। তোমরা নবীর একথাকে একটি অসম্ভব কথা বলে গণ্য করছো। কিন্তু প্রতি বর্ষাকালে পৃথিবী এর প্রমাণ পেশ করে। সৃষ্টির পুনরাবর্তন কেবল সম্ভবই নয় বরং প্রতি বর্ষাকালে তোমাদের চোখের সামনে ঘটছে। নবী বলেন, এ বিশ্বজাহান আল্লাহ বিহীন নয়। তোমাদের নাস্তিকরা একথাকে একটি প্রমাণহীন দাবী মনে করছে। কিন্তু গবাদি পশুর গঠনাকৃতি, খেজুর ও আংগুরের উৎপাদন এবং মৌমাছিদের সৃষ্টি কৌশল একথার সাক্ষ দিচ্ছে যে, একজন প্রাজ্ঞ ও করুণাময় রব এ জিনিসগুলোর নকশা তৈরী করেছেন। অন্যথায় এতগুলো পশু, এতসব গাছপালা এবং এত বিপুল সংখ্যক মৌমাছি মিলেমিশে মানুষের জন্য এ নানাবিধ উন্নতমানের, উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও লাভজনক জিনিস প্রতিদিন যথা নিয়মে তৈরী করে যাচ্ছে, এটা কেমন করে সম্ভব ছিল? নবী বলেন, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কেউ উপাস্য, মাবুদ এবং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের হকদার নেই। তোমাদের মুশরিকরা একথায় নাক সিটকায় এবং নিজেদের বহু সংখ্যক উপাস্যের পূজাবেদীতে অর্ঘ ও উপঢৌকনাদি নিবেদন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তোমরা নিজেরাই বলো, এ দুধ, খেজুর, আংগুর ও মধু এগুলো তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, এ নিয়ামতগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের দান করেছেন? কোন্ দেবী, দেবতা বা অলী তোমাদের আহার পৌঁছাবার এ ব্যবস্থা করেছেন?

৬০. অর্থাৎ আসল ব্যাপার শুধু এতটুকুই নয় যে, তোমাদের প্রতিপালন ও খাদ্য সংস্থানের এ সমগ্র ব্যবস্থাপনাটিই আল্লাহর হাতে রয়েছে বরং প্রকৃত সত্য এটাও যে, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু দু'টোই আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। অন্য কেউ তোমাদের জীবনও দান করতে পারে না, আর মৃত্যুও ঘটাতে পারে না।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۚ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

১০ রুকূ'

আর দেখো, আল্লাহ তোমাদের একজনকে আর একজনের ওপর রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তারপর যাদেরকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা এমন নয় যে নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে, যাতে উভয়ে এ রিযিকে সমান অংশীদার হয়ে যায়। তাহলে কি এরা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ মেনে নিতে অস্বীকার করে?[৬২]

৬১. অর্থাৎ এ জ্ঞানবত্তা যা নিয়ে তোমরা গর্ব ও অহংকার করে বেড়াও এবং যার বদৌলতে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর ওপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তাও আল্লাহর দান। তোমরা নিজেদের চোখে নিজেদের জীবনের একটি বিস্ময়কর শিক্ষণীয় দৃশ্য দেখে থাকো। যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ দীর্ঘায়ু দান করেন, অনেক বেশী বয়স হয়ে যায়, তখন এ ব্যক্তিই যে কখনো তার যৌবনকালে অন্যকে জ্ঞান দিতো, সে কেমন একটা লোলচর্ম বৃদ্ধে এবং অথর্ব–অক্ষম একটা নিরেট মাংস পিণ্ডে পরিণত হয়, যার কোন হুঁশ–জ্ঞান থাকে না।

৬২. বর্তমানকালে এ আয়াত থেকে বড়ই অদ্ভুত ও উদ্ভট অর্থ বের করা হয়েছে। কুরআনের আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি আয়াতের আলাদা আলাদা অর্থ করলে কেমন অন্তহীন অপব্যাখ্যার দরজা খুলে যায় এটা হচ্ছে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা এ আয়াতটিকে ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের বুনিয়াদ এবং অর্থনৈতিক বিধি–ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা গণ্য করেছেন। তাদের মতে আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, যাদেরকে আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাদের নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া উচিত। যদি বিলিয়ে দেয়া না হয় তাহলে তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে। অথচ এ সমগ্র আলোচনার মধ্যে কোথাও অর্থনৈতিক বিধি–ব্যবস্থা বর্ণনার আদৌ কোন সুযোগই নেই। প্রথম থেকে সমগ্র ভাষণটিই চলছে শিরককে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও তাওহীদকে সত্য প্রমাণ করার জন্য এবং সামনের দিকেও এ একই বিষয়বস্তুই একের পর এক এগিয়ে চলছে। এ আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ অর্থনৈতিক বিধি–ব্যবস্থার একটি ধারা বর্ণনা করার কোন সুযোগই কি এখানে আছে? আয়াতকে তার প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রেখে বিচার করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এখানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়বস্তুরই আলোচনা চলছে। এখানে একথা

প্রমাণ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদে যখন নিজেদের গোলাম ও চাকর বাকরদেরকে সমান মর্যাদা দাও না—অথচ এ সম্পদ আল্লাহর দেয়া—তখন তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতাহীন গোলামদেরকেও শরীক করা এবং ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ গোলামদেরকেও তাঁর সাথে সমান অংশীদার গণ্য করাকে তোমরা কেমন করে সঠিক মনে করো?

সূরা রূমের ২৮ আয়াতে এ একই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানে এর শব্দগুলো হচ্ছে :

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ، هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ، كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"আল্লাহ তোমাদের সামনে একটি উপমা তোমাদের সত্তা থেকেই পেশ করেন। আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তাতে কি তোমাদের গোলাম তোমাদের সাথে শরীক আছে? আর এভাবে শরীক বানিয়ে তোমরা ও তারা কি সমান সমান হয়ে গিয়েছ? এবং তোমরা কি তাদেরকে ঠিক তেমনি ভয় পাও যেমন তোমাদের সমপর্যায়ের লোকদেরকে ভয় পাও? এভাবে আল্লাহ খুলে খুলে নিশানী বর্ণনা করেন তাদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।"

দু'টি আয়াতের তুলনামূলক আলোচনা করলে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় স্থানেই একই উদ্দেশ্যে একই উপমা বা দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এদের একটি অন্যটির ব্যাখ্যা করছে।

সম্ভবত اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ বাক্যাংশ থেকেই ঐ বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। উপমা বর্ণনার পর সাথে সাথেই এ বাক্যাংশটি দেখে তারা মনে করেছে নিশ্চয়ই এর অর্থ এই হবে যে অধীনস্থদের মধ্যে রিযিক বিলিয়ে না দেয়াটাই মূলত আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি। অথচ যে ব্যক্তি কুরআনে সামান্য পারদর্শিতাও রাখেন তিনিই জানেন যে আল্লাহর নিয়ামতের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য সত্তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো এ কিতাবের দৃষ্টিতে আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়টির কুরআনে এত বেশী পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে, তিলাওয়াত ও চিন্তা-গবেষণায় অভ্যস্ত লোকেরা এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন না। অবশ্যি সূচীপত্রের সাহায্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ রচনাকারীগণ এ ব্যাপারটি নাও জানতে পারেন।

আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকৃতির এই তাৎপর্যটি অনুধাবন করার পর এ বাক্যাংশের অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, এরা যখন প্রভু ও গোলামের পার্থক্য ভাল করেই জানে এবং নিজেদের জীবনে সর্বক্ষণ এ পার্থক্যের দিকে নজর রাখে তখন একমাত্র আল্লাহর ব্যাপারেই কি এরা এত অবুঝ হয়ে গেছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ মনে করার এবং তাঁর কাছ থেকে এরা যেসব নিয়ামত লাভ করেছে সেগুলোর জন্য তাঁর বান্দাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোকে জরুরী মনে করে?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾

আর আল্লাহই তোমাদের জন্য তোমাদের সমজাতীয় স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এ স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভাল ভাল জিনিস তোমাদের খেতে দিয়েছেন। তারপর কি এরা (সবকিছু দেখার ও জানার পরও) বাতিলকে মেনে নেয়[৬৩] এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে? আর তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার পূজা করে যাদের না আকাশ থেকে তাদের কিছু রিযিক দেবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, না পৃথিবী থেকে[৬৪]? কাজেই আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরী করো না,[৬৫] আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

৬৩. 'বাতিলকে মেনে নেয়' অর্থাৎ এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য ভাঙা-গড়া, আশা-আকাংখা পূর্ণ করা, সন্তান দেয়া, রুজি-রোজগার দেয়া, বিচার-আচার ও মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ করানো এবং রোগ-শোক থেকে বাঁচানোর ব্যাপারটি কতিপয় দেব-দেবী, জিন এবং অতীতের বা পরবর্তীকালের কোন মহাপুরুষের হাতে রয়েছে।

৬৪. এসব নিয়ামত আল্লাহর দেয়া, একথা যদিও মক্কার মুশরিকরা অস্বীকার করতো না এবং এসব নিয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ মেনে নিতেও তারা গররাযী ছিল না কিন্তু তারা যে ভুলটা করতো সেটা ছিল এ যে, এই নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সাথে সাথে তারা নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে এমন বহু সত্তার কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো যাদেরকে তারা কোন প্রকার প্রমাণ ও সনদপত্র ছাড়াই এ নিয়ামতগুলো প্রদানের ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল। এ জিনিসটিকেই কুরআন "আল্লাহর অনুগ্রহের অস্বীকৃতি" বলে গণ্য করছে। যে উপকার করলো, তার উপকারের জন্য যে উপকার করেনি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মূলত উপকারীর উপকার অস্বীকৃতিরই নামান্তর, কুরআনে এ কথাটিকে একটি সাধারণ নীতি হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন একথাটিকেও একটি মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করছে যে, বিনা যুক্তি-প্রমাণে উপকারী সম্পর্কে ধারণা করা যে, তিনি নিজ অনুগ্রহ ও দয়ার বশে এ উপকার করেননি বরং অমুক ব্যক্তির অছিলায় বা অমুক ব্যক্তির সুবিধার্থে

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

আল্লাহ একটি উপমা দিচ্ছেন।[৬৬] একজন হচ্ছে গোলাম, যে অন্যের অধিকারভুক্ত এবং নিজেও কোন ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয়জন এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে ভাল রিযিক দান করেছি এবং সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খুব খরচ করে। বলো, এরা দু'জন কি সমান? —আলহামদুল্লিাহ,[৬৭] কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ সোজা কথাটি) জানে না।[৬৮]

অথবা অমুক ব্যক্তির সুপারিশক্রমে কিংবা অমুকের হস্তক্ষেপ করার কারণে এ উপকার করেছেন, এটাও মূলত তার উপকারের প্রতি অস্বীকৃতিরই শামিল।

ইনসাফ ও সাধারণ বিবেক–বুদ্ধি এ মৌলিক কথা দু'টিকে পুরোপুরি সমর্থন করে। সামান্য চিন্তা–ভাবনা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিই এর যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারে। মনে করুন, কোন অভাবী ব্যক্তির প্রতি করুণা করে আপনি তাকে সাহায্য করলেন এবং সে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে এমন এক ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো যার এ সাহায্যে কোন হাতই ছিল না। এ অবস্থায় আপনি নিজের উদার মনোবৃত্তির কারণে তার এ অবাঞ্ছিত আচরণকে যতই উপেক্ষা করুন না কেন এবং আগামীতে নিজের সাহায্য যতই জারী রাখুন না কেন, তবুও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাববেন, এ লোকটি আসলে বড়ই নির্লজ্জ ও অকৃতজ্ঞ। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি আপনি জানতে পারেন, তার এ কাজটি করার কারণ এই ছিল যে, সে মনে করে, আপনি তাকে যা কিছু সাহায্য করেছেন তার পেছনে আপনার সততা ও দানশীলতার মনোবৃত্তি কার্যকর ছিল না বরং সবকিছু করেছিলেন ঐ ব্যক্তির খাতিরে, অথচ আসল ঘটনা তা ছিল না, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই একে নিজের অপমান মনে করবেন। আপনার কাছে তার এ উদ্ভট ব্যাখ্যার অর্থ এ হবে যে, সে আপনার সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণা রাখে এবং আপনাকে দয়ার্দ্র ও স্নেহশীল মানুষ বলে মনে করে না। বরং আপনাকে মনে করে একজন বন্ধু বৎসল লোক। বন্ধুর কথায় আপনি ওঠা বসা করেন। কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর মাধ্যমে যদি কেউ এসে যায় তাহলে আপনি সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের খাতিরে তাকে সাহায্য করেন অন্যথায় আপনার আঙুলের ফাঁক দিয়ে দানের একটা সিকিও গলতে পারে না।

৬৫. 'আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরী করো না'— অর্থাৎ আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা–মহারাজা ও বাদশাহ–শাহানশাহদের সমপর্যায়ে রেখে বিচার করো না। রাজা–বাদশাহদের অনুচর, সভাসদ ও মোসাহেবদের মাধ্যম ছাড়া তাদের কাছে কেউ নিজের আবেদন নিবেদন পৌঁছাতে পারে না। ঠিক তেমনি আল্লাহর ব্যাপারেও তোমরা এ ধারণা করতে থাকো যে, তিনি নিজের শাহী মহলে ফেরেশতা, আউলিয়া ও অন্যান্য সভাসদ পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন এবং এদের মাধ্যমে ছাড়া তাঁর কাছে কারোর কোন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

আল্লাহ আর একটি উপমা দিচ্ছেন। দু'জন লোক। একজন বধির ও বোবা, কোন কাজ করতে পারে না। নিজের প্রভুর ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে আছে। যেদিকেই তাকে পাঠায় কোন ভাল কাজ তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়জন ইনসাফের হুকুম দেয় এবং নিজে সত্য সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত আছে। বলো, এরা দু'জন কি সমান?[৬৯]

৬৬. অর্থাৎ যদি উপমার সাহায্যে কথা বুঝতে হয় তাহলে আল্লাহ সঠিক উপমা দিয়ে তোমাদের সত্য বুঝিয়ে দেন। তোমরা যেসব উপমা দিচ্ছো সেগুলো ভুল। তাই তোমরা সেগুলো থেকে ভুল ফলাফল গ্রহণ করে থাকো।

৬৭. প্রশ্ন ও আলহাম্‌দুলিল্লাহ এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ফাঁক রয়ে গেছে। এ ফাঁক পূরণ করার জন্য আলহাম্‌দুলিল্লাহ এর মধ্যেই একটি তাৎপর্যময় ইংগিত রয়ে গেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, নবীর মুখ থেকে একথা শুনে মুশরিকদের পক্ষে এ দু'টি সমান এ ধরনের জবাব দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। নিশ্চয়ই এর জবাবে কেউ না কেউ পরিষ্কারভাবে একথা স্বীকার করে থাকতে পারে যে, আসলে দু'টি সমান নয়, আবার কেউ এ ভয়ে নীরবতা অবলম্বন করে থাকতে পারে যে, স্বীকারোক্তিমূলক জবাব দেবার মাধ্যমে তার অনিবার্য ফলাফলকেও স্বীকার করে নিতে হবে এবং এর ফলে স্বতস্ফূর্তভাবেই তাদের শির্‌ক বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই নবী উভয়ের জবাব পেয়ে বললেন, আলহাম্‌দুলিল্লাহ। স্বীকারকারীদের স্বীকারোক্তির পরও আলহামদুলিল্লাহ এবং নীরবতা পালনকারীদের নীরবতার ওপরও আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম অবস্থাটিতে এর অর্থ হয়, "আল্লাহর শোকর, অন্তত এতটুকু কথা তো তোমরা বুঝতে পেরেছো।" দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হয়, "নীরব হয়ে গেছে? আলহাম্‌দুলিল্লাহ, নিজেদের সমস্ত হঠকারিতা সত্ত্বেও দুটি অবস্থা সমান বলে দেবার হিম্মত তোমাদেরও নেই।"

৬৮. অর্থাৎ যদিও তারা মানুষের মধ্যে ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাধরের মধ্যকার পার্থক্য অনুভব করে এবং এ পার্থক্য সামনে রেখেই প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা আচরণ করে, তবুও তারা এমনি মূর্খ ও অবুঝ সেজে আছে যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না। স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, অধিকার, শক্তিমত্তা সবকিছুতেই তারা সৃষ্টিকে শরীক মনে করছে এবং সৃষ্টির সাথে এমন আচরণ করছে যা একমাত্র স্রষ্টার সাথেই করা যেতে পারে। উপায় উপকরণের ওপর নির্ভরশীল এ জগতে কারোর কাছে কোন জিনিস চাইতে হলে আমরা গৃহস্বামীর কাছেই চেয়ে থাকি, চাকর বাকরদের কাছে চাই না। কিন্তু সমগ্র দয়া-দাক্ষিণ্যের উৎস যেই সত্তা, তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٧٧﴾

১১ রুকূ'

আর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গোপন সত্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে[৭০] এবং কিয়ামত সংঘটিত হবার ব্যাপারটি মোটেই দেরী হবে না, চোখের পলকেই ঘটে যাবে বরং তার চেয়েও কম সময়ে।[৭১] আসলে আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন।

পূর্ণ করার জন্য যখন সচেষ্ট হই, তখন সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিককে বাদ দিয়ে তাঁর বান্দাদের কাছে হাত পাতি।

৬৯. প্রথম উপমায় আল্লাহ ও বানোয়াট মাবুদদের পার্থক্যটা কেবলমাত্র ক্ষমতা ও অক্ষমতার দিক দিয়ে সুস্পষ্ট করা হয়েছিল। এখন এ দ্বিতীয় উপমায় সেই পার্থক্যটিকে আরো বেশী সুস্পষ্ট করে গুণাবলীর দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ও এ বানোয়াট মাবুদদের মধ্যে ফারাক শুধুমাত্র এতটুকুই নয় যে, একজন ক্ষমতাধর মালিক এবং অন্যজন ক্ষমতাহীন গোলাম বরং এ ছাড়াও তাদের মধ্যে এ ফারাকটিও রয়েছে যে, এ গোলাম তোমাদের ডাকও শোনে না, তার জবাবও দিতে পারে না এবং নিজের ক্ষমতাবলে কোন একটা কাজও করতে পারে না। তার নিজের সারাটি জীবন তার মালিক ও প্রভুর সত্তার ওপর নির্ভরশীল। আর প্রভু যদি তার ওপর কোন কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে সে কিছুই করতে পারে না। অন্যদিকে প্রভুর অবস্থা হচ্ছে এই যে, তিনি কেবল বক্তাই নন বরং জ্ঞানী বক্তা। তিনি দুনিয়াকে ইনসাফের হুকুম দেন। তিনি কেবল কাজ করার ক্ষমতাই রাখেন না বরং যা করেন তা সঠিক ও ন্যায়সংগতভাবেই করেন, সততা ও নির্ভুলতার সাথে করেন। তাহলে বলো, এ ধরনের প্রভু ও গোলামকে তোমরা সমান মনে করো কেমন করে? এটা তোমাদের কোন্ ধরনের বুদ্ধিমত্তা?

৭০. পরবর্তী বাক্য থেকে বুঝা যায়, এটি আসলে মক্কার কাফেরদের একটি প্রশ্নের জবাব। তারা প্রায়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের আগমনের খবর দিচ্ছো তা যদি সত্যি সত্যিই আসে, তাহলে তা কবে কোন্ তারিখে আসবে? এখানে তাদের প্রশ্ন উদ্ধৃত না করে তার জবাব দেয়া হচ্ছে।

৭১. অর্থাৎ কিয়ামত আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কোন দীর্ঘ কালীন পর্যায়ে সংঘটিত হবে না। তার আসার আগে তোমরা দূর থেকে তাকে আসতে দেখবে না এবং এর মাঝখানে তোমরা নিজেদেরকে সামলে নিয়ে তার জন্য কিছু প্রস্তুতিও করতে পারবে না। যেকোন দিন যেকোন মুহূর্তে চোখের পলকে বা তার চেয়েও কম সময়ে তা এসে যাবে। কাজেই যে চিন্তা–ভাবনা করতে চায় তার গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করা উচিত এবং নিজের

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেছেন এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার মত হৃদয় দিয়েছেন,[৭২] যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।[৭৩]

এরা কি কখনো পাখিদের দেখেনি, আকাশ নিঃসীমে কিভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য।

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে বানিয়েছেন শান্তির আবাস। তিনি পশুদের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমনসব ঘর তৈরী করে দিয়েছেন[৭৪] যেগুলোকে তোমরা সফর ও স্বগৃহে অবস্থান উভয় অবস্থায়ই সহজে বহন করতে পারো।[৭৫] তিনি পশুদের পশম, লোম ও চুল থেকে তোমাদের জন্য পরিধেয় ও ব্যবহার-সামগ্রীসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগবে।

মনোভাব ও কর্মনীতি সম্পর্কে যে ফায়সালাই করতে হয় শীঘ্রই করা দরকার। "এখন তো কিয়ামত অনেক দূরে, যখন তা আসতে থাকবে তখনই আল্লাহর সাথে একটা মিটমাট করে নেবো," কারো এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করে তার ওপর ভরসা করে বসে থাকা উচিত নয়। তাওহীদ সম্পর্কে ভাষণ দিতে দিতে তার মাঝখানে হঠাৎ এভাবে কিয়ামতের আলোচনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, লোকেরা যেন তাওহীদ ও শিরকের মাঝখানে কোন

তিনি নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য আশ্রয় তৈরী করেছেন এবং তোমাদের এমন পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদের গরম থেকে বাঁচায়[৭৬] আবার এমন কিছু অন্যান্য পোশাক তোমাদের দিয়েছেন যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে।[৭৭] এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করেন,[৭৮] হয়তো তোমরা অনুগত হবে।

একটি আকীদা নির্বাচন করার ব্যাপারটিকে নিছক একটি তাত্ত্বিক ব্যাপার মনে না করে বসে। তাদের এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে যে কোন সময় হঠাৎ একটি ফায়সালার সময় এসে যাবে এবং সে সময় এ নির্বাচনের সঠিক বা ভুল হওয়ার ওপর মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করবে। এ সতর্কবাণীর পর আবার আগে থেকে চলে আসা সেই একই আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

৭২. অর্থাৎ এমনসব উপকরণ যার সাহায্যে তোমরা দুনিয়ায় সব রকমের জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কাম চালাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছো। জন্মকালে মানব সন্তান যত বেশী অসহায় ও অজ্ঞ হয় এমনটি অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় না। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপকরণাদির (শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বিবেক ও চিন্তাশক্তি) সাহায্যেই সে উন্নতি লাভ করে পৃথিবীর সকল বস্তুর ওপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তাদের ওপর রাজত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করে।

৭৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমাদের এসব অগণিত নিয়ামত দান করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এ নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশী অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে যে, এ কান দিয়ে মানুষ সব কিছু শোনে কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর কথা শোনে না, এ চোখ দিয়ে সবকিছু দেখে কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে না এবং এ মস্তিষ্ক দিয়ে সবকিছু চিন্তা করে কিন্তু শুধুমাত্র একথা চিন্তা করে না যে, আমার যে অনুগ্রহকারী আমার প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছেন তিনি কে?

৭৪. অর্থাৎ পশুচর্মের তাঁবু। আরবে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

৭৫. অর্থাৎ যখন কোথাও রওয়ানা হয়ে যেতে চাও তখন তাকে সহজে গুটিয়ে ভাঁজ করে নিয়ে বহন করতে পারো। আবার যখন কোথাও অবস্থান করতে চাও তখন অতি সহজেই ভাঁজ খুলে খাটিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলতে পারো।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَٰفِرُونَ ﴿٨٣﴾

এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে হে মুহাম্মাদ! পরিষ্কারভাবে সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া তোমার আর কোন দায়িত্ব নেই। এরা আল্লাহর অনুগ্রহ জানে, কিন্তু সেগুলো অস্বীকার করে,[৭৯] আর এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক এমন যারা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

৭৬. ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার কথা না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, গরমের সময় কাপড়ের ব্যবহার মানব সভ্যতার পূর্ণতার পর্যায়ভুক্ত। আর পূর্ণতার পর্যায়ের উল্লেখ করার পর তার নিম্নবর্তী প্রাথমিক পর্যায়গুলোর উল্লেখের কোন প্রয়োজন থাকে না। অথবা একথাটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ জন্য যে, যেসব দেশে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের লু-হাওয়া চলে সেখানে শীতকালীন পোশাকের পরিবর্তে গ্রীষ্মকালীন পোশাকের গুরুত্ব হয় বেশী। এসব দেশে লোকেরা যদি মাথা, ঘাড়, কান ও সারা দেহ ভালভাবে না ঢেকে বাইরে বের হয় তাহলে গরম বাতাসে তাদের শরীর ঝলসে যাবে। বরং কোন কোন সময় তো তাদের শুধুমাত্র চোখ দু'টো বাদ দিয়ে সমস্ত চেহারাটাই ঢেকে নিতে হয়।

৭৭. অর্থাৎ বর্ম।

৭৮. নিয়ামত পূর্ণ বা সম্পূর্ণ করার মানে হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ জীবনের প্রতিটি বিভাগে মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন এবং তারপর এক একটি প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। যেমন এ বিষয়টিই ধরা যায়। বাইরের প্রভাব থেকে মানুষের দেহ সংরক্ষণ কাম্য ছিল। তাই আল্লাহ কোন্ কোন্ দিক থেকে কেমন ধরনের কি পরিমাণ উপকরণ তৈরী করে দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ যদি কেউ লিখতে বসে তাহলে একটি বই তৈরী হয়ে যাবে। এটি যেন পোশাক ও বাসস্থানের দিক দিয়ে আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা। অথবা যেমন খাদ্যোপকরণের ব্যাপারটিই ধরা যায়। এ জন্য কত বিশাল পর্যায়ে কত বৈচিত্র সহকারে কেমন ধরনের সব ছোটখাটো প্রয়োজনের প্রতিও নজর রেখে মহান আল্লাহ অসংখ্য অগণিত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। যদি কেউ এগুলো পর্যালোচনা করতে চায় তাহলে হয়তো শুধুমাত্র খাদ্যের প্রকারভেদ এবং খাদ্য বস্তুগুলোর তালিকা তৈরী করার জন্য একটি বিপুলাকার গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এটি যেন খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ামতের পূর্ণতা। এভাবে মানব জীবনের এক একটি ক্ষেত্র ও বিভাগ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন।

৭৯. অস্বীকার বলতে সেই একই আচরণের কথা বুঝানো হয়েছে, যার উল্লেখ আমরা আগেই করে এসেছি। মক্কার কাফেররা একথা অস্বীকার করতো না যে, এ সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহ তাদের প্রতি করেছেন। কিন্তু তাদের আকীদা ছিল, তাদের বুযর্গ ও দেবতাদের

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ
قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ ۖ
فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

১২ রুকূ'

(সেদিন কি ঘটবে, সে ব্যাপারে এদের কি কিছুমাত্র হুঁশও আছে) যেদিন আমি উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী[৮০] দাঁড় করাবো, তারপর কাফেরদের যুক্তি–প্রমাণ ও সাফাই পেশ করার সুযোগও দেয়া হবে না।[৮১] আর তাদের কাছে তাওবা ও ইস্‌তিগ্‌ফারেরও দাবী জানানো হবে না।[৮২] জালেমরা যখন একবার আযাব দেখে নেবে তখন তাদের আযাব আর হাল্‌কা করা হবে না এবং তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য বিরামও দেয়া হবে না। আর দুনিয়ায় যারা শির্‌ক করেছিল তারা যখন নিজেদের তৈরী করা শরীকদেরকে দেখবে তখন বলবে, "হে আমাদের রব! এরাই হচ্ছে আমাদের তৈরী করা শরীক, যাদেরকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে ডাকতাম।" একথায় তাদের ঐ মাবুদরা তাদের পরিষ্কার জবাব দিয়ে বলবে, "তোমরা মিথ্যুক।"[৮৩] সে সময় এরা সবাই আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে এবং এদের সমস্ত মিথ্যা উদ্ভাবন হাওয়া হয়ে যাবে, যা এরা দুনিয়ায় করে বেড়াতো।[৮৪]

হস্তক্ষেপের ফলে তাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করা হয়েছে। আর একারণেই তারা এসব অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময় ঐসব বুযর্গ ও দেবতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো বরং তাদের প্রতি কিছুটা বেশী করেই প্রকাশ করতো। একাজটিকেই আল্লাহ নিয়ামত অস্বীকৃতি এবং অকৃতজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৮০. অর্থাৎ সেই উম্মতের নবী বা এমন কোন ব্যক্তি নবীর তিরোধানের পর যিনি সেই উম্মতকে তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদেরকে শিরক ও মুশরিকী চিন্তা–ভাবনা, ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং কিয়ামতের ময়দানে জবাবদিহি করার ব্যাপারে সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষ দেবেন

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

যারা নিজেরাই কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েছে তাদেরকে আমি আযাবের পর আযাব দেবো,[৮৫] দুনিয়ায় তারা যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো তার বদলায়।

যে, তিনি তাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই যাকিছু তারা করেছে তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং জেনে বুঝেই করেছে।

৮১. এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে সাফাই পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অপরাধগুলো এমন অকাট্য ও অনস্বীকার্য সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তাদের সাফাই পেশ করার আর কোন অবকাশই থাকবে না।

৮২. অর্থাৎ সে সময় তাদেরকে একথা বলা হবে না যে, এখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি—অপরাধগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও। কারণ সেটা হবে ফায়সালার সময়। ক্ষমা চাওয়ার সময় তার আগে শেষ হয়ে যাবে। কুরআন ও হাদীস উভয় সূত্রই একথা পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ দুনিয়াতেই তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করতে হবে, আখেরাতে নয়। আবার দুনিয়াতেও এর সুযোগ শুধুমাত্র ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ মৃত্যুর চিহ্নগুলো ফুটে না ওঠে, যখন মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তার শেষ সময় পৌঁছে গেছে। এ সময় তার তওবা গ্রহণীয় নয়। মৃত্যুর সীমান্তে পৌঁছার সাথে সাথেই মানুষের কর্মের অবকাশ খতম হয়ে যায় এবং তখন শুধুমাত্র পুরস্কার ও শাস্তি দানের পাট বাকি থেকে যায়।

৮৩. এর মানে এই নয় যে, তারা মূল ঘটনাটি অস্বীকার করবে এবং বলবে যে, মুশরিকরা তাদেরকে সংকট উত্তরণকারী ও প্রয়োজন পূর্ণকারী বলে ডাকত না। বরং তারা আসলে এ ঘটনা সম্পর্কে তাদের নিজেদের জানা ও অবহিত থাকা এবং এর প্রতি তাদের সম্মতি ও দায়িত্ব অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমরা কখনো তোমাদের একথা বলিনি যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের ডাকো এবং তোমাদের এ কাজের প্রতি আমরা কখনো সন্তুষ্টও ছিলাম না। বরং তোমরা যে আমাদের ডেকে চলছো তাতো আমরা জানতামই না। তোমরা যদি প্রার্থনা শ্রবণকারী, প্রার্থনা পূরণকারী, হস্ত ধারণকারী ও সংকট নিরসনকারী বলে আমাদের মনে করে থেকে থাকো তাহলে তো এটা ছিল তোমাদের মনগড়া একটা সর্বৈব মিথ্যা কথা। কাজেই এর সব দায়-দায়িত্বই তোমাদের। এখন এ দায়িত্বের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছো কেন?

৮৪. অর্থাৎ তা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। দুনিয়ায় তারা যেসব নির্ভর বানিয়ে নিয়েছিল এবং তাদের ওপর ভরসা করতো, সেসব অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোন অভিযোগের

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

(হে মুহাম্মাদ! এদেরকে সেই দিন সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দাও) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করিয়ে দেবো, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে এবং এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবার জন্য আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। (আর এ সাক্ষের প্রস্তুতি হিসেবে) আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যা সব জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে[৮৬] এবং যা সঠিক পথনির্দেশনা, রহমত ও সুসংবাদ বহন করে তাদের জন্য যারা আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে। ৮৭

প্রতিকারকারীকে সেখানে অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য পাবে না। কোন সংকট নিরসনকারীকে তাদের সংকট নিরসন করার জন্য সেখানে পাওয়া যাবে না। কেউ সেখানে এগিয়ে এসে একথা বলবে না যে, এ ব্যক্তিকে কিছু বলো না এ আমার লোক ছিল।

৮৫. অর্থাৎ একটা আযাব হবে কুফরী করার জন্য এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়ার জন্য হবে আর একটা আযাব।

৮৬. অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে, যার ওপর হিদায়াত ও গোমরাহী এবং লাভ ও ক্ষতি নির্ভর করে, যা জানা সঠিক পথে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং যার মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভুলক্রমে কিছু কিছু তাফসীর লেখক تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ বাক্যাংশটি এবং এর সম-অর্থবোধক আয়াতগুলোর অর্থ করে এভাবে যে, কুরআনে সবকিছু বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর তারা নিজেদের এ বক্তব্য সত্য প্রমাণ করার জন্য কুরআন থেকে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়বস্তু টেনে বের করতে থাকে।

৮৭. অর্থাৎ যারা আজ এ কিতাবটি মেনে নেবে এবং আনুগত্যের পথ অবলম্বন করবে এ কিতাব জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে, একে অনুসরণ করে চলার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে এবং এ কিতাব তাদেরকে এ সুসংবাদ দেবে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার দিন আল্লাহর আদালত থেকে তারা সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে। অন্যদিকে যারা এ কিতাব মানবে না তারা যে কেবল হিদায়াত ও রহমত থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয় বরং কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর নবী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে দাঁড়াবেন তখন এ দলীলটিই হবে তাদের একটি জবরদস্ত প্রমাণ। কারণ নবী একথা প্রমাণ করে দেবেন যে, তিনি তাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছিলেন যার মধ্যে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

১৩ রুকূ'

আল্লাহ ন্যায়নীতি, পরোপকার ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার হুকুম দেন[৮৮] এবং অশ্লীলতা-নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার-বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন।[৮৯] তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করতে পারো।

৮৮. এ ছোট্ট বাক্যটিতে এমন তিনটি জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে যেগুলোর ওপর সমগ্র মানব সমাজের সঠিক অবকাঠামোতে ও চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভরশীল।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আদল বা ন্যায়পরতা। দু'টি স্থায়ী সত্যের সমন্বয়ে এর ধারণাটি গঠিত। এক, লোকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সমতা থাকতে হবে। দুই, প্রত্যেককে নির্দ্বিধায় তার অধিকার দিতে হবে। আমাদের ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য "ইনসাফ" শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে অনর্থক এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দু' ব্যক্তির মধ্যে "নিস্ফ" "নিসৃফ" বা আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টিত হতে হবে। তারপর এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। আসলে "আদল" সমতা বা সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় দাবী করে। কোন কোন দিক দিয়ে "আদল" অবশ্যই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আবার কোন কোন দিক দিয়ে সাম্য সম্পূর্ণ "আদল" বিরোধী। যেমন পিতা মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মজীবী ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মজীবীদের মধ্যে বেতনের সাম্য। কাজেই আল্লাহ যে জিনিসের হুকুম দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এ হুকুমের দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে ইহ্সান বা পরোপকার তথা সদাচার, ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার, সহানুভূতিশীল আচরণ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা দান, একজন অপর জনের মর্যাদা রক্ষা করা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কিছু কমে রাযী হয়ে যাওয়া —এ হচ্ছে আদলের অতিরিক্ত এমন একটি জিনিস যার গুরুত্ব সামষ্টিক জীবনে আদলের চাইতেও বেশী। আদল যদি হয় সমাজের বুনিয়াদ তাহলে ইহ্সান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে ইহ্সান তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের। কোন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বক্ষণ তার অধিকার কড়ায় গণ্ডায় মেপে মেপে

আদায় করতে থাকবে এবং তারপর ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার আদায় করে নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে, আবার অন্যদিকে অন্যদের অধিকারের পরিমাণ কি তা জেনে নিয়ে কেবলমাত্র যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই আদায় করে দেবে, এরূপ কট্টর নীতির ভিত্তিতে আসলে কোন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। এমনি ধরনের একটি শীতল ও কাঠখোট্টা সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকবে না ঠিকই কিন্তু ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য, ত্যাগ, আন্তরিকতা, মহানুভবতা ও মংগলাকাংখার মত জীবনের উন্নত মূল্যবোধগুলোর সৌন্দর্য সুষমা থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। আর এগুলোই মূলত এমন সব মূল্যবোধ যা জীবনে সুন্দর আবহ ও মধুর আমেজ সৃষ্টি করে এবং সামষ্টিক মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে।

তৃতীয় যে জিনিসটির এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আত্মীয়–স্বজনদেরকে দান করা এবং তাদের সাথে সদাচার করা। এটি আত্মীয়–স্বজনদের সাথে ইহ্‌সান করার একটি বিশেষ ধরন নির্ধারণ করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ নিজের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দুঃখে ও আনন্দে তাদের সাথে শরীক হবে এবং বৈধ সীমানার মধ্যে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে। বরং এও এর অর্থের অন্তরভুক্ত যে, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের ধন–সম্পদের ওপর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের সন্তান–সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করবে না বরং একই সংগে নিজের আত্মীয়–স্বজনদের অধিকারও স্বীকার করবে। আল্লাহর শরীয়াত প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তাদের পরিবারের অভাবী লোকেরা যেন অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তার দৃষ্টিতে কোন সমাজের এর চেয়ে বড় দুর্গতি আর হতেই পারে না যে, তার মধ্যে বসবাসকারী এক ব্যক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করে বিলাসী জীবন যাপন করবে এবং তারই পরিবারের সদস্য তার নিজের জ্ঞাতি ভাইয়েরা ভাত–কাপড়ের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকবে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গণ্য করে এবং এ ক্ষেত্রে এ মূলনীতি পেশ করে যে, প্রত্যেক পরিবারের গরীব ব্যক্তিবর্গের প্রথম অধিকার হয় তাদের পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর, তারপর অন্যদের ওপর তাদের অধিকার আরোপিত হয়। আর প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রথম অধিকার আরোপিত হয় তাদের গরীব আত্মীয়–স্বজনদের, তারপর অন্যদের অধিকার তাদের ওপর আরোপিত হয়। এ কথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই বিভিন্ন হাদীসে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম অধিকার তার পিতামাতার, তারপর স্ত্রী–সন্তানদের, তারপর ভাই–বোনদের, তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর এবং তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ইয়াতীম শিশুর চাচাত ভাইদেরকে তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অন্য একজন ইয়াতীমের পক্ষে ফায়সালা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদি এর কোন দূরতম আত্মীয়ও থাকতো তাহলে আমি তার ওপর এর লালন পালনের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিতাম। অনুমান করা যেতে পারে, যে সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি (Unit) এভাবে নিজেদের ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেয় সেখানে কতখানি অর্থনৈতিক

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۚ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٢﴾

আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো যখনই তোমরা তাঁর সাথে কোন অংগীকার করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর আবার তা ভেঙে ফেলো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত। তোমাদের অবস্থা যেন সেই মহিলাটির মত না হয়ে যায় যে নিজ পরিশ্রমে সূতা কাটে এবং তারপর নিজেই তা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলে।[৯০] তোমরা নিজেদের কসমকে পারস্পরিক ব্যাপারে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ারে পরিণত করে থাকো, যাতে এক দল অন্য দলের তুলনায় বেশী ফায়দা হাসিল করতে পারো। অথচ আল্লাহ এ অংগীকারের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।[৯১] আর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তিনি তোমাদের সমস্ত মত–বিরোধের রহস্য উন্মোচিত করে দেবেন।[৯২]

সচ্ছলতা, কেমন ধরনের সামাজিক মাধুর্য এবং কেমনতর নৈতিক ও চারিত্রিক পুতঃ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

৮৯. ওপরের তিনটি সৎ কাজের মোকাবিলায় আল্লাহ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। এ অসৎকাজগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গকে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়।

প্রথম জিনিসটি হচ্ছে অশ্লীলতা–নির্লজ্জতা (فحشاء) । সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তরভুক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার, উলংগতা, সমকামিতা, মুহাররাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সমক্ষে বেহায়াপনা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা–নির্লজ্জতার অন্তরভুক্ত। যেমন মিথ্যা

প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোপন অপরাধ জন সমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী–পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদের শারীরিক অংগভংগীর প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুষ্কৃতি (منكر) । এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কাজ যেগুলোকে মানুষ সাধারণভাবে খারাপ মনে করে থাকে, চিরকাল খারপ বলে আসছে এবং আল্লাহর সকল শরীয়াত যে কাজ করতে নিষেধ করেছে।

তৃতীয় জিনিসটি জুলুম–বাড়াবাড়ি (بغى) । এর মানে হচ্ছে, নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহর হোক বা বান্দার হোক লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা।

৯০. এখানে পর্যায়ক্রমে তিন ধরনের অংগীকারকে তাদের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করে সেগুলো মেনে চলার হুকুম দেয়া হয়েছে। এক, মানুষ আল্লাহর সাথে যে অংগীকার করেছে। এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। দুই, একজন বা একদল মানুষ অন্য একজন বা একদল মানুষের সাথে যে অংগীকার করেছে। এর ওপর আল্লাহর কসম খেয়েছে। অথবা কোন না কোনভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিজের কথার দৃঢ়তাকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ। তিন, আল্লাহর নাম না নিয়ে যে অংগীকার করা হয়েছে। এর গুরুত্ব উপরের দু' প্রকার অংগীকারের পরবর্তী পর্যায়ের। তবে উল্লিখিত সব কয়টি অংগীকারই পালন করতে হবে এবং এর মধ্য থেকে কোনটি ভেঙে ফেলা বৈধ নয়।

৯১. এখানে বিশেষ করে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের অংগীকার ভংগের নিন্দা করা হয়েছে। এ ধরনের অংগীকার ভংগ দুনিয়ায় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চ পর্যায়ের বড় বড় লোকেরাও একে সৎ কাজ মনে করেই করে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জাতি ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বাহ্‌বা কুড়ায়। জাতি ও দলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের ক্ষেত্রে প্রায়ই এমনটি হতে দেখা যায়। এক জাতির নেতা এক সময় অন্য জাতির সাথে একটি চুক্তি করে এবং অন্য সময় শুধুমাত্র নিজের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তা প্রকাশ্যে ভংগ করে অথবা পর্দান্তরালে তার বিরুদ্ধাচরণ করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সত্যনিষ্ঠ বলে যারা পরিচিত, তারাই সচরাচর এমনি ধরনের কাজ করে থাকে। তাদের এসব কাজের বিরুদ্ধে শুধু যে সমগ্র জাতির মধ্য থেকে কোন নিন্দাবাদের ধ্বনি ওঠে না তা নয় বরং সব দিক থেকে তাদেরকে বাহ্‌বা দেয়া হয় এবং এ ধরনের ঠগবাজী ও ধূর্তামীকে পাকাপোক্ত ডিপ্লোমেসী মনে করা হয়। আল্লাহ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, প্রত্যেকটি অংগীকার আসলে অংগীকারকারী ব্যক্তি ও জাতির চরিত্র ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা স্বরূপ। যারা এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে তারা আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

৯২. অর্থাৎ যেসব মতবিরোধের কারণে তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছে সেগুলোর ব্যাপারে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী তার ফায়সালা তো কিয়ামতের দিন হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই কেউ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং তার প্রতিপক্ষ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

যদি (তোমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ না হোক) এটাই আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করতেন।[৯৩] কিন্তু তিনি যাকে চান গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেন এবং যাকে চান সরল সঠিক পথ দেখান।[৯৪] আর অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(আর হে মুসলমানরা!) তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পরস্পরকে ধোকা দেবার মাধ্যমে পরিণত করো না। কোন পদক্ষেপ একবার দৃঢ় হবার পর আবার যেন পিছলে না যায় এবং তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছো এই অপরাধে যেন তোমরা অশুভ পরিণামের সম্মুখীন না হও এবং কঠিন শাস্তি ভোগ না করো।[৯৫]

পুরোপুরি গোমরাহ ও মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তার জন্য কখনো কোনভাবে নিজের গোমরাহ প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অংগীকার ভংগ, মিথ্যাচার ও প্রতারণার অস্ত্র ব্যবহার করা বৈধ হতে পারে না। যদি সে এ পথ অবলম্বন করে তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য প্রমাণিত হবে। কারণ সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা কেবলমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই সত্যবাদিতার দাবী করে না বরং কর্মপদ্ধতি ও উপায় উপকরণের ক্ষেত্রেও সত্য পথ অবলম্বন করতে বলে। বিশেষ করে যেসব ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রায়ই এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাকে যে, তারা যেহেতু আল্লাহর পক্ষের লোক এবং তাদের বিরোধী পক্ষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তাই সম্ভাব্য যেকোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অধিকার তাদের রয়েছে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এখানে একথা বলা হচ্ছে। তারা মনে করে থাকে, আল্লাহর অবাধ্য লোকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় সততা ও বিশ্বস্ততার পথ অবলম্বন এবং অংগীকার পালনের কোন প্রয়োজন পড়ে না, এটা তাদের অধিকার। আরবের ইহুদীরাও ঠিক একথাই বলতো। তারা বলতো لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ অর্থাৎ আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের হাত পা কোন বিধি–নিষেধের শৃংখলে বাঁধা নেই। তাদের সাথে সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করা যেতে পারে। যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে আল্লাহর প্রিয় পাত্রদের স্বার্থ উদ্ধার এবং কাফেরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

আল্লাহর অংগীকারকে[৯৬] সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ো না।[৯৭] যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা তোমাদের জন্য বেশী ভাল, যদি তোমরা জানতে। তোমাদের কাছে যা কিছু আছে খরচ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তাই স্থায়ী হবে এবং আমি অবশ্যই যারা সবরের পথ অবলম্বন করবে[৯৮] তাদের প্রতিদান তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী দেবো। পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো[৯৯] এবং (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।[১০০]

তা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ বৈধ। এ জন্য তাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ ও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না বলে তারা মনে করতো।

৯৩. এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ নিজেকে আল্লাহর পক্ষের লোক মনে করে ভাল-মন্দ উভয় পদ্ধতিতে নিজের ধর্মের (যাকে সে আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম মনে করছে) প্রসার এবং অন্যের ধর্মকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে তার এ প্রচেষ্টা হবে সরাসরি আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বিরোধী। কারণ মানুষের ধর্মীয় মতবিরোধের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে যদি সমস্ত মানুষকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় একটি ধর্মের অনুসারী বানানোই আল্লাহর উদ্দেশ্য হতো তাহলে এ জন্য আল্লাহর নিজের "তথাকথিত" পক্ষের লোকদের লেলিয়ে দেয়ার এবং তাদের নিকৃষ্ট অস্ত্রের সাহায্য নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ কাজ তো তিনি নিজের সৃজনী ক্ষমতার মাধ্যমে করতে পারতেন। তিনি সবাইকে মুমিন ও অনুগত হিসেবে সৃষ্টি করতেন এবং তাদের থেকে কুফরী ও গোনাহ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতেন। এরপর ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে একচুল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতা কারো থাকতো না।

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই মানুষকে নির্বাচন ও গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় মানুষদের পথ বিভিন্ন। কেউ গোমরাহীর দিকে যেতে চায় এবং আল্লাহ গোমরাহীর

তারপর যখন তোমরা কুরআন পড়ো তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর শরণ নিতে থাকো।[১০১] যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে তাদের ওপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য ও প্রতিপত্তি চলে তাদের ওপর যারা তাকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নেয় এবং তার প্ররোচনায় শিরক করে।

সমস্ত উপকরণ তার জন্য তৈরী করে দেন। কেউ সত্য–সঠিক পথের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে এবং আল্লাহ তাকে সঠিক পথনির্দেশনা দানের ব্যবস্থা করেন।

৯৫. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি একবার ইসলামের সত্যতা মেনে নেবার পর নিছক তোমাদের অসৎ আচরণের কারণে এ দীন থেকে সরে যাবে এবং মুমিনদের দলের অন্তরভুক্ত হতে সে শুধুমাত্র এ জন্য বিরত থাকবে যে, যাদের সাথে তার ওঠাবসা হয়েছে তাদেরকে সে আচার–আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফেরদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর পায়নি।

৯৬. অর্থাৎ যে অংগীকার তোমরা করেছো আল্লাহর নামে অথবা আল্লাহর দীনের প্রতিনিধি হিসেবে।

৯৭. এর অর্থ এ নয় যে, বড় লাভের বিনিময়ে তা বিক্রি করতে পারো। বরং এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার যে কোন লাভ বা স্বার্থ আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকারের তুলনায় সামান্যতম মূল্যের অধিকারী। তাই ঐ তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে এ মূল্যবান সম্পদটি বিক্রি করা যে কোন অবস্থায়ই ক্ষতির ব্যবসায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

৯৮. "সবরের পথ অবলম্বন কারীদেরকে" অর্থাৎ এমন সব লোকদেরকে যারা সকল প্রকার লোভ–লালসা ও কামনা–বাসনার মোকাবিলায় সত্য ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ দুনিয়ায় সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করলে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তা সবই যারা বরদাশ্‌ত করে নেয়। দুনিয়ায় অবৈধ পন্থা অবলম্বন করলে যেসব লাভ পাওয়া যেতে পারে তা সবই যারা দূরে নিক্ষেপ করে। যারা ভাল কাজের সুফল লাভ করার জন্য সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত থাকে, যে সময়টি বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসান ঘটার পর অন্য জগতে আসবে।

৯৯. এ আয়াতে মুমিন ও কাফের উভয় দলের এমন সব সংকীর্ণচেতা ও বেসবর লোকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে, যারা মনে করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা–পরিচ্ছন্নতার পথ অবলম্বন করলে মানুষের পরকালে সাফল্য অর্জিত হলেও তার পার্থিব জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের জবাবে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে শুধু পরকালীন জীবনই সুগঠিত হয় না, দুনিয়াবী জীবনও সুখী সমৃদ্ধিশালী হয়। যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার, পবিত্র–পরিচ্ছন্ন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও সৎ তাদের পার্থিব জীবন ও বেঈমান ও অসৎকর্মশীল লোকদের তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ভাল ও উন্নত হয়। নিজেদের নিষ্কলংক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তা অন্যেরা লাভ করতে পারে না। যেসব পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও উত্তম সাফল্য তারা লাভ করে থাকেন তাও অন্যেরা লাভ করতে পারে না। কারণ অন্যদের প্রতিটি সাফল্য হয় নোংরা ও ঘৃণিত পদ্ধতি অবলম্বনের ফসল। সৎলোকেরা ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করেও যে মানসিক প্রশান্তি ও চিন্তার স্থৈর্য লাভ করেন তার সামান্যতম অংশও প্রাসাদবাসী বেঈমান দুষ্কৃতিকারী লাভ করতে পারে না।

১০০. আখেরাতে তাদের মর্যাদা তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছোট বড় সব রকমের সৎকাজ করে থাকবে তাকে তার সবচেয়ে বড় সৎকাজের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতম মর্যাদা দান করা হবে।

১০১. এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সংগে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ভুল ও অনর্থক সন্দেহ–সংশয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কুরআনের প্রত্যেকটি কথাকে তার সঠিক আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার মিশ্রণে কুরআনের শব্দাবলীর এমন অর্থ করা যাবে না যা আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই সংগে মানুষের মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত থাকতে হবে যে, মানুষ যাতে কুরআন থেকে কোন পথনির্দেশনা লাভ করতে না পারে সে জন্যই শয়তান সবচেয়ে বেশী তৎপর থাকে। এ কারণে মানুষ যখনি এ কিতাবটির দিকে ফিরে যায় তখনি শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেবার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাই এ কিতাবটি অধ্যয়ন করার সময় মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে যাতে শয়তানের প্ররোচনা ও সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে এ হেদায়াতের উৎসটির কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। কারণ যে ব্যক্তি এখান থেকে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারেনি সে অন্য কোথা থেকেও সৎপথের সন্ধান পাবে না। আর যে ব্যক্তি এ কিতাব থেকে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস তাকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এ আয়াতটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এমনসব আপত্তির জবাব দেয়া হ্যাছে যেগুলো মক্কার মুশরিকরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করতো। তাই প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ বলা

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

১৪ রুকূ’

যখন আমি একটি আয়াতের জায়গায় অন্য একটি আয়াত নাযিল করি—আর আল্লাহ ভাল জানেন তিনি কি নাযিল করবেন—তখন এরা বলে, তুমি নিজেই এ কুরআন রচনা কর।[১০২] *আসলে এদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে,*[১০৩] *যাতে মুমিনদের ঈমান সুদৃঢ় করা যায়,*[১০৪] *অনুগতদেরকে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সোজা পথ দেখানো যায়*[১০৫] *এবং তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দান করা যায়।*[১০৬]

হয়েছে, কুরআনকে তার যথার্থ আলোকে একমাত্র সেই ব্যক্তিই দেখতে পারে যে শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে সজাগ–সতর্ক থাকে এবং তা থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। অন্যথায় শয়তান কখনো সোজাসুজি কুরআন ও তার বক্তব্যসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ মানুষকে দেয় না।

১০২. এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত নাযিল করার অর্থ একটি হুকুমের পরে অন্য একটি হুকুম পাঠানোও হতে পারে। কারণ কুরআন মজীদের বিধানগুলো পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে এবং বহুবার একই ব্যাপারে কয়েক বছর পরপর ধারাবাহিকভাবে, একটি করে, দুটি করে বা তিনটি করে হুকুম পাঠানো হয়েছে। যেমন মদের ব্যাপারে বা যিনার শাস্তির ব্যাপারে ঘটেছে। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে আমি ইতস্তত করছি এ জন্য যে, সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতটি মক্কী যুগে নাযিল হয়। আর যতদূর আমি জানি সে সময় নাযিলকৃত বিধিসমূহে এ পর্যায়ক্রমিক ধারা অবলম্বনের কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাই আমি এখানে “এক আয়াতের জায়গায় অন্য এক আয়াত নাযিল করা”র অর্থ এই মনে করি যে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে কখনো একটি বিষয়বস্তুকে একটি উপমা বা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে আবার কখনো ঐ একই বিষয়বস্তু বুঝাবার জন্য অন্য একটি দৃষ্টান্ত বা উপমার সাহায্য নেয়া হয়েছে। একই কাহিনী বারবার এসেছে এবং প্রত্যেক বারই তাকে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি বিষয়ের কখনো একটি দিক পেশ করা হয়েছে এবং কখনো সেই একই বিষয়ের অন্য একটি দিক সামনে আনা হয়েছে। একটি কথার জন্য কখনো একটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে আবার কখনো পেশ করা হয়েছে অন্য

একটি যুক্তি। একটি কথা এক সময় সংক্ষেপে বলা হয়েছে এবং অন্য সময় বলা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নাউযুবিল্লাহ, নিজেই এ কুরআন রচনা করেন বলে মক্কার কাফেররা যে কথা বলতো—এ জিনিসটিকেই তারা তার প্রমাণ গণ্য করতো। তাদের যুক্তি ছিল, আল্লাহর জ্ঞান যদি এ বাণীর উৎস হতো, তাহলে সব কথা একই সংগে বলে দেয়া হতো। আল্লাহ তো মানুষের মত অপরিপক্ক ও কম জ্ঞানের অধিকারী নন। কাজেই তিনি কেন চিন্তা করে করে কথা বলবেন, ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তথ্য জ্ঞান লাভ করতে থাকবেন এবং একটি কথা সঠিকভাবে খাপখেয়ে না বসতে পারলে অন্য এক পদ্ধতিতে কথা বলবেন? তোমার এ বাণীর মধ্যে তো মানবিক জ্ঞানের দুর্বলতা ধরা পড়ছে।

১০৩. "রূহুল কুদুস" এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে 'পবিত্র রূহ' বা 'পবিত্রতার রূহ।' পারিভাষিকভাবে এ উপাধিটি দেয়া হয়েছে হযরত জিব্রীল আলাইহিস সালামকে। এখানে অহী বাহক ফেরেশতার নাম না নিয়ে তার উপাধি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে এ সত্যটি জানানো যে, এমন একটি রূহ এ বাণী নিয়ে আসছেন যিনি সকল প্রকার মানবিক দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত। তিনি এমন পর্যায়ের অবিশ্বস্ত নন যে, আল্লাহ যা পাঠান, তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার সাথে অন্য কিছু মিশিয়ে দিয়ে তাকে অন্য কিছু বানিয়ে দেন। তিনি কোন দুরভিসন্ধিকারী বা কুচক্রী নন যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে ধোকাবাজী ও প্রতারণার আশ্রয় নেবেন। তিনি একটি নিখাদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রূহ। আল্লাহর কালাম পূর্ণ আমানতদারীর সাথে পৌছিয়ে দেয়াই তাঁর কাজ।

১০৪. অর্থাৎ তার পর্যায়ক্রমে এ বাণী নিয়ে আসার এবং একই সময় সবকিছু না নিয়ে আসার কারণ এ নয় যে, আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে, যেমন তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে বুঝে নিয়েছো। বরং এর কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বোধশক্তি ও গ্রহণ শক্তির মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, যে কারণে একই সংগে সে সমস্ত কথা বুঝতে পারে না এবং একই সময় বুঝানো সমস্ত কথা তার মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূলও হতে পারে না। তাই মহান আল্লাহ আপন প্রজ্ঞা বলে এ ব্যবস্থা করেন যে, রূহুল কুদুস এ কালামকে সামান্য সামান্য করে আনবেন। কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো বিস্তারিত বর্ণনার আশ্রয় নেবেন। কখনো এক পদ্ধতিতে বুঝাবেন আবার কখনো অন্য পদ্ধতিতে। কখনো এক বর্ণনা রীতি অবলম্বন করবেন আবার কখনো অবলম্বন করবেন অন্য বর্ণনা রীতি। একই কথাকে বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করবে, যাতে বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন সত্যানুসন্ধানীরা ঈমান আনতে পারে এবং ঈমান আনার পর তাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রত্যয়, বোধ ও দৃষ্টি পাকাপোক্ত হতে পারে।

১০৫. এটি হচ্ছে এ পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রমের দ্বিতীয় উপযোগিতা ও স্বার্থকতা। অর্থাৎ যারা ঈমান এনে আনুগত্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে তাদেরকে ইসলামী দাওয়াতের কাজে এবং জীবন সমস্যার ক্ষেত্রে যে সময় যে ধরনের পথনির্দেশনার প্রয়োজন হবে তা যথা সময়ে দেয়া হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, ঠিক সময়ের আগে তাদেরকে এ পথনির্দেশনা দেয়া সংগত হতে পারে না এবং একই সংগে সমস্ত পথনির্দেশনা দেয়া তাদের জন্য উপকারীও হবে না।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়।[১০৭] *অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে পরিষ্কার আরবী ভাষা। আসলে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মানে না আল্লাহ কখনো তাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার সুযোগ দেন না এবং এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (নবী মিথ্যা কথা তৈরী করে না বরং) মিথ্যা তারাই তৈরী করছে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ মানে না,*[১০৮] *তারাই আসলে মিথ্যেবাদী।*

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, (তাকে যদি) বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের ওপর নিশ্চিন্ত থাকে (তাহলে তো ভাল কথা), কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণ মানসিক তৃপ্তিবোধ ও নিশ্চিন্ততা সহকারে কুফরীকে গ্রহণ করে নিয়েছে তার ওপর আল্লাহর গযব আপতিত হয় এবং এ ধরনের সব লোকদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১০৯]

১০৬. এটি হচ্ছে তার তৃতীয় স্বার্থকতা। অর্থাৎ অনুগতদের যেসব বাধা বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেভাবে তাদেরকে নির্যাতন করা ও কষ্ট দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে সমস্যা ও সংকটের যেসব পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সবের কারণে বারবার সুসংবাদের মাধ্যমে তাদের হিম্মত ও সাহস বাড়ানো এবং শেষ পরিণতিতে তাদেরকে সুনিশ্চিত সফলতার আশ্বাস দেয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যাতে তারা আশাদীপ্ত হতে পারে এবং হতাশ ও বিষণ্ন বদনে তাদের দিন কাটাতে না হয়।

১০৭. হাদীসে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা তাদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে এ ধারণা করতো। এক হাদীসে তার নাম বলা হয়েছে 'জাবার।' সে ছিল আমের আল হাদ্‌রামীর রোমীয় ক্রীতদাস। অন্য এক হাদীসে খুয়াইতিব ইবনে আবদুল উয্‌যার এক গোলামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তার নাম ছিল 'আইশ বা ইয়া'ঈশ। তৃতীয় এক হাদীসে ইয়াসারের নাম নেয়া হয়েছে। তার ডাকনাম ছিল আবু ফুকাইহাহ্। সে ছিল মক্কার এক মহিলার ইহুদী গোলাম। অন্য একটি হাদীসে বাল্'আন বা বাল্'আম নামক এক রোমীয় গোলামের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা এদের মধ্য থেকে যেই হোক না কেন, মক্কার কাফেররা শুধুমাত্র এক ব্যক্তি তাওরাত ও ইন্‌জীল পড়ে এবং তার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাতও হয়েছে শুধুমাত্র এটা দেখেই নিসংকোচে এ অপবাদ তৈরী করে ফেললো যে, আসলে এ ব্যক্তিই এ কুরআন রচনা করছে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের পক্ষ থেকে এটিই পেশ করছেন। এ থেকে নবী করীমের (স) বিরোধিরা তাঁর ওপর দোষারোপ করার ব্যাপারে কত নির্লজ্জ নির্ভীক ছিল, কেবল তাই অনুমিত হয় না বরং নিজেদের সমকালীনদের মূল্য ও মর্যাদা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মানুষ যে কতটা ন্যায়নীতিহীন ও ইনসাফ বিবর্জিত হয়ে থাকে সে শিক্ষাও পাওয়া যায়। তাদের সামনে ছিল মানব ইতিহাসের এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব যার নজির সে সময় সারা দুনিয়ায় কোথাও ছিল না এবং আজ পর্যন্তও কোথাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্বোধরা সামান্য কিছু তাওরাত ও ইনজীল পড়তে পারতো এমন একজন অনারব গোলামকে এ মহান ব্যক্তিত্বের মোকাবিলায় যোগ্যতর বিবেচনা করছিল। তারা ধারণা করছিল, এ দুর্লভ রত্নটি ঐ কয়লা খণ্ড থেকেই দ্যুতি লাভ করছে।

১০৮. এ আয়াতের দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে "মিথ্যা তো তারাই তৈরী করে যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না।"

১০৯. এ আয়াতে এমন সব মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হয়েছে যাদের ওপর সে সময় কঠোর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল এবং যাদেরকে অসহনীয় কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা যদি কখনো জুলুম–নিপীড়নের চাপে বাধ্য হয়ে নিছক প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করো এবং তোমাদের অন্তর কুফরী আকীদা মুক্ত থাকে তাহলে তোমাদের মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি অন্তরে তোমরা কুফরী গ্রহণ করে নিয়ে থাকো তাহলে দুনিয়ায় প্রাণে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

এর অর্থ এ নয় যে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য কুফরী কথা বলা বাঞ্ছনীয়। বরং এটি নিছক একটি "রুখ্‌সাত" তথা সুবিধা দান ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি অন্তরে ঈমান অক্ষুণ্ণ রেখে মানুষ বাধ্য হয়ে এ ধরনের কথা বলে তাহলে তাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। অন্যথায় 'আযীমাত' তথা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ঈমানের পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষের এ রক্তমাংসের শরীরটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে যেন সত্যের বাণীরই ঘোষণা দিয়ে যেতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এ উভয় ধরনের ঘটনার নজির পাওয়া যায়। একদিকে আছেন খাব্বাব ইবনে আরত (রা) তাঁকে জ্বলন্ত অংগারের ওপর শোয়ানো হয়। এমনকি তাঁর শরীরের চর্বি গলে

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

এটা এ জন্য যে, তারা আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি এমনসব লোককে মুক্তির পথ দেখান না যারা তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। এরা হচ্ছে এমনসব লোক যাদের অন্তর, কান ও চোখের ওপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। এরা গাফলতির মধ্যে ডুবে গেছে। নিসন্দেহে আখেরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত[১১০] পক্ষান্তরে যাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, (ঈমান আনার কারণে) যখন তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা বাড়িঘর ত্যাগ করেছে, হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে কষ্ট সহ্য করেছে এবং সবর করেছে,[১১১] তাদের জন্য অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

পড়ার ফলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু এরপরও তিনি দৃঢ়ভাবে ঈমানের ওপর অটল থাকেন। বিলাল হাবশীকে (রা) লোহার বর্ম পরিয়ে দিয়ে কাঠফাটা রোদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। তারপর উত্তপ্ত বালুকা প্রান্তরে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ উচ্চারণ করে যেতেই থাকেন। আর একজন সাহাবী ছিলেন হাবীব ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা)। মুসাইলামা কায্‌যাবের হুকুমে তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি অংগ–প্রত্যংগ কাটা হচ্ছিল এবং সেই সাথে মুসাইলামাকে নবী বলে মেনে নেবার জন্য দাবী করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি তার নবুওয়াত দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করছিলেন। এভাবে ক্রমাগত অংগ–প্রত্যংগ কাটা হতে হতেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। অন্যদিকে আছেন আম্মার (রা) ইবনে ইয়াসির (রা)। আম্মারের (রা) চোখের সামনে তাঁর পিতা ও মাতাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দিয়ে শহীদ করা হয়। তারপর তাঁকে এমন কঠিন অসহনীয় শাস্তি দেয়া হয় যে, শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি কাফেরদের চাহিদা মত সবকিছু বলেন। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন এবং আরয করেন :

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُرِكْتُ حَتّٰى سَبَبْتُكَ وَذَكَرْتُ اٰلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ

"হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে মন্দ এবং তাদের উপাস্যদেরকে ভাল না বলা পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়নি।"

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

১৫ রুকূ'

(এদের সবার ফায়সালা সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে আর কারো প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।

*আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দেন। সেটি শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন যাপন করছিল এবং সবদিক দিয়ে সেখানে আসছিল ব্যাপক রিযিক, এ সময় তাঁর অধিবাসীরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করলো। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করালেন এভাবে যে, ক্ষুধা ও ভীতি তাদেরকে গ্রাস করলো। তাদের কাছে তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একজন রসূল এলো। কিন্তু তারা তাকে অমান্য করলো। শেষ পর্যন্ত আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো, যখন তারা জালেম হয়ে গিয়েছিল।*১১২

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ? "তোমার মনের অবস্থা কি?" জবাব দিলেন, مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ "ঈমানের ওপর পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত।" একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ اِنْ عَادُوْا فَعُدْ "যদি তারা আবারো এ ধরনের জুলুম করে তাহলে তুমি তাদেরকে আবারো এসব কথা বলে দিয়ো।"

১১০. যারা সত্যের পথ কঠিন দেখে ঈমান থেকে ফিরে গিয়েছিল এবং তারপর নিজেদের কাফের ও মুশরিক জাতির সাথে মিশে গিয়েছিল তাদের জন্য এ বাক্যাংশটি বলা হয়েছে।

১১১. এখানে হাবশার (ইথিয়োপিয়া) মুহাজিরদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

কাজেই হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের যা কিছু পাক-পবিত্র ও হালাল রিযিক দিয়েছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো,[১১৩] যদি তোমরা সত্যিই তাঁর বন্দেগী করতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকো [১১৪] আল্লাহ যা কিছু তোমাদের ওপর হারাম করেছেন তা হচ্ছে ঃ মৃতদেহ, রক্ত, শূয়োরের গোশ্‌ত এবং যে প্রাণীর ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নাম নেয়া হয়েছে। তবে যদি কেউ আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার ইচ্ছা পোষণ না করে অথবা প্রয়োজনের সীমা না ছাড়িয়ে ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে এসব খেয়ে নেয় তাহলে নিশ্চিতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১১৫] আর এই যে, তোমাদের কণ্ঠ ভুয়া হুকুম জারী করে বলতে থাকে এটি হালাল এবং ওটি হারাম, এভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না।[১১৬] যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনোই সফলকাম হবে না। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ মাত্র কয়েকদিনের এবং পরিশেষে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১১২. এখানে যে জনপদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তাকে চিহ্নিত করা হয়নি। মুফাস্‌সিরগণও এ জনপদটির স্থান নির্দেশ করতে পারেননি। বাহ্যত ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি সঠিক মনে হয় যে, এখানে নাম না নিয়ে মক্কাকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে এখানে ভীতি ও ক্ষুধা দ্বারা জনপদটির আক্রান্ত হবার যে কথা বলা হয়েছে সেটি হবে মক্কার দুর্ভিক্ষ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতলাভের পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত মক্কাবাসীদের ওপর জেঁকে বসেছিল।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

ইতিপূর্বে[১১৭] আমি তোমাকে যেসব জিনিসের কথা বলেছি সেগুলো আমি বিশেষ করে ইহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম।[১১৮] আর এটা তাদের প্রতি আমার জুলুম ছিল না বরং তাদের নিজেদেরই জুলুম ছিল, যা তারা নিজেদের ওপর করছিল। তবে যারা অজ্ঞতার কারণে খারাপ কাজ করেছে এবং তারপর তাওবা করে নিজেদের কাজের সংশোধন করে নিয়েছে, নিশ্চিতভাবেই তোমার রব তাওবা ও সংশোধনের পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১১৩. এ থেকে জানা যায়, ওপরে যে দুর্ভিক্ষের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এ সূরা নাযিলের সময় তা খতম হয়ে গিয়েছিল।

১১৪. অর্থাৎ যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর বন্দেগীর স্বীকৃতি দিয়ে থাকো, যেমন তোমরা দাবী করছো, তাহলে তোমরা নিজেরাই কোন জিনিসকে হালাল ও কোন জিনিসকে হারাম করার অধিকার গ্রহণ করো না। বরং যে রিযিককে স্বয়ং আল্লাহ হালাল ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন তা খাও এবং তাঁর শোকর করো। আর যা কিছু আল্লাহর আইনে হারাম, অপবিত্র ও কলুষিত তা থেকে দূরে থাকো।

১১৫. এ হুকুমটি ইতিপূর্বে সূরা বাকারার ৩, সূরা মায়েদার ১৭৩ এবং সূরা আন'আমের ৩৫ আয়াতেও এসেছে।

১১৬. এ আয়াতটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হালাল ও হারাম করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অথবা অন্য কথায়, একমাত্র আল্লাহই আইন প্রণেতা। অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা করার ধৃষ্টতা দেখাবে। সে নিজের সীমালংঘন করবে। তবে যদি সে আল্লাহর আইনকে অনুমতিপত্র হিসেবে মেনে নিয়ে তার ফরমানসমূহ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বলে, অমুক জিনিসটি অথবা কাজটি বৈধ এবং অমুকটি অবৈধ তাহলে তা হতে পারে। এভাবে নিজের হালাল ও হারাম করার স্বাধীন ক্ষমতাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ বলে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের বিধান তৈরী করে তার এ কাজটি দু'টি অবস্থার বাইরে যেতে পারে না। হয় সে দাবী করছে যে, যে জিনিসকে সে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদন ছাড়াই বৈধ বা অবৈধ বলছে তাকে আল্লাহ বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে, আল্লাহ

নিজের হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনের শরীয়াত তৈরী করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ দু'টি দাবীর মধ্য থেকে যেটিই সে করবে তা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচার এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই হবে না।

১১৭. ওপরে উল্লেখিত হুকুমের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উথাপন করা হচ্ছিল তার জবাবে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। মক্কার কাফেরদের প্রথম আপত্তি ছিল ঃ তুমি যেসব জিনিস হালাল করে রেখেছো বনী ইসরাঈলদের শরীয়তে তো তেমনি ধরনের আরো বহু জিনিস হারাম হয়ে আছে। যদি ঐ শরীয়াতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজেই তার বিরুদ্ধাচরণ করছো। যদি ঐ শরীয়াতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়ে থাকে এবং তোমার শরীয়াতও আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে এ বিরোধ কেন? দ্বিতীয় আপত্তিটি ছিলঃ বনী ইসরাঈলের শরীয়াতে শনিবারের সমস্ত দুনিয়াবী কাজ কারবার হারাম হবার যে আইনটি ছিল তাকেও তুমি উড়িয়ে দিয়েছো। এটা কি তোমার স্বেচ্ছাকৃত কাজ, না আল্লাহ নিজেই তাঁর দু'টি শরীয়াতে দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী হুকুম রেখেছেন?

১১৮. এখানে সূরা "আন'আম"–এর ১৪৬ আয়াত ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ج الايه

—এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ আয়াতে ইহুদীদের নাফরমানির কারণে বিশেষ করে কোন্ কোন্ জিনিস তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল তা বলা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতে সূরা আন'আমের একটি আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, সূরা আন'আম এ সূরার আগে নাযিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সূরা আন'আমে এক জায়গায় বলা হয়েছে,

وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ – (ايت : ١١٩)

এখানে সূরা নাহ্‌লের দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। কারণ মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে আন'আম ছাড়া এই একটিমাত্র সূরাতেই হারাম জিনিসগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, এর মধ্যে কোন্ সূরাটি আগে নাযিল হয়েছিল এবং কোন্‌টি পরে? আমাদের মতে এর সঠিক জবাব হচ্ছে এই যে, প্রথমে নাযিল হয়েছিল সূরা নাহ্‌ল। সূরা আন'আমের উপরোল্লিখিত আয়াতে এরই বরাত দেয়া হয়েছে। পরে কোন এক সময় মক্কার কাফেররা সূরা নাহ্‌লের এ আয়াতগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের ইতিপূর্বে বর্ণিত আপত্তিগুলো উথাপন করে। সে সময় সূরা আন'আম নাযিল হয়ে গিয়েছিল। তাই তাদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে, আমরা পূর্বেই অর্থাৎ সূরা আন'আমে বলে এসেছি যে, ইহুদীদের জন্য কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে হারাম করা হয়েছিল। আর যেহেতু এ আপত্তি সূরা নাহ্‌লের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল তাই এর জবাবও সূরা নাহ্‌লেই প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১৬ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম নিজেই ছিল একটি পরিপূর্ণ উম্মত,[১১৯] আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং একনিষ্ঠ। সে কখনো মুশরিক ছিল না। সে ছিল আল্লাহর নিয়ামতের শোকরকারী। আল্লাহ তাকে বাছাই করে নেন এবং সরল সঠিক পথ দেখান। দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দান করেন এবং আখেরাতে নিশ্চিতভাবেই সে সৎকর্মশীলদের অন্তরভুক্ত হবে। তারপর আমি তোমার কাছে এ মর্মে অহী পাঠাই যে, একাগ্র হয়ে ইবরাহীমের পথে চলো এবং সে মুশরিকদের দলভুক্ত ছিল না।[১২০] বাকী রইলো শনিবারের ব্যাপারটি, সেটি আসলে আমি এমনসব লোকের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম যারা এর বিধানের মধ্যে মতবিরোধ করেছিল।[১২১] আর নিশ্চয়ই তারা যেসব ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তোমার রব কিয়ামতের দিন সেসব ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দেবেন।

১১৯. অর্থাৎ তিনি একাই ছিলেন একটি উম্মতের সমান। যখন দুনিয়ায় কোন মুসলমান ছিল না তখন একদিকে তিনি একাই ছিলেন ইসলামের পতাকাবাহী এবং অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মানুষ ছিল কুফরীর পতাকাবাহী। আল্লাহর এ একক বান্দাই তখন এমন কাজ করেন যা করার জন্য একটি উম্মতের প্রয়োজন ছিল। তিনি এক ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান।

১২০. এটি হচ্ছে আপত্তিকারীদের প্রথম আপত্তিটির পূর্ণাংগ জবাব। এ জবাবের দুটি অংশ। একটি হচ্ছে, আল্লাহর শরীয়াতে বৈপরীত্য নেই, যেমনটি তুমি ইহুদীদের ধর্মীয়

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও[১২২] এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।[১২৩] তোমার রবই বেশী ভাল জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে এবং কে আছে সঠিক পথে।

আইন ও মুহাম্মাদী শরীয়াতের বাহ্যিক পার্থক্য দেখে ধারণা করেছো। বরং আসলে ইহুদীদেরকে বিশেষ করে তাদের নাফরমানীর কারণে কতিপয় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এ নিয়ামতগুলো থেকে অন্যদেরকে বঞ্চিত করার কোন কারণ ছিল না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে পদ্ধতি অনুসরণের হুকুম দেয়া হয় তা হচ্ছে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদ্ধতি, আর তোমরা জানো ইহুদীদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিল মিল্লাতে ইবরাহীমীর জন্য সেগুলো হারাম ছিল না। যেমন ইহুদীরা উটের গোশ্‌ত খায় না। কিন্তু মিল্লাতে ইবরাহীমীর জন্য এ গোশ্‌ত হালাল ছিল, ইহুদীদের শরীয়াতে উটপাখী, হাঁস, খরগোশ ইত্যাদি হারাম কিন্তু মিল্লাতে ইবরাহীমীতে এসব জিনিস হালাল ছিল। এ জবাবের সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকে এ মর্মেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের যেমন ইবরাহীমের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ইহুদীদের সাথেও নেই। কারণ তোমরা উভয় দলই শির্‌ক করছো। মিল্লাতে ইবরাহীমীর যদি কেউ সঠিক অনুসারী থেকে থাকে তবে তিনি হচ্ছেন এই নবী মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সংগী সাথীগণ। এদের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে শির্‌কের নামগন্ধও নেই।

১২১. এটি হচ্ছে মক্কার কাফেরদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাব। শনিবার ইহুদীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং ইবরাহীমী মিল্লাতে শনিবারের কোন ধারণাই ছিল না, একথা বলার এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ মক্কার কাফেররাও একথা জানতো। তাই এখানে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, ইহুদীদের আইনে তোমরা যে কঠোরতা দেখছো তা তাদের প্রাথমিক বিধানে ছিল না বরং পরবর্তীকালে ইহুদীদের দুষ্কৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণের কারণে তাদের ওপর এগুলো আরোপিত হয়েছিল। একদিকে বাইবেলের যেসব অধ্যায়ে শনিবারের বিধান বর্ণিত হয়েছে সেগুলো অধ্যয়ন না করা (যেমন যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ৮-১১, ২৩ ঃ ১২ ও ১৩, ৩১ঃ ১২-১৭, ৩৫ ঃ ২ ও ৩, গণনা পুস্তক ১৫ ঃ ৩২-৩৬) এবং অন্যদিকে শনিবারের বিধি-নিষেধ ভাঙার জন্য ইহুদীরা যেসব অপচেষ্টা চালিয়েছিল সেগুলো না জানা পর্যন্ত (যেমন যিরমিয় ১৭ ঃ ২১-২৭

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তাহলে ঠিক ততটুকু নাও যতটুকু তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর করো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকারীদের পক্ষে উত্তম। হে মুহাম্মাদ! সবর অবলম্বন করো—আর তোমার এ সবর আল্লাহরই সুযোগ দানের ফলমাত্র—এদের কার্যকলাপে দুঃখ করো না এবং এদের চক্রান্তের কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।[১২৪]

এবং যিহিস্কেল ২০ ঃ ১২-২৪) কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের এ ইংগিতগুলো ভালভাবে বুঝতে পারবেন না।

১২২. অর্থাৎ দাওয়াত দেবার সময় দুটি জিনিসের প্রতি নজর রাখতে হবে। এক, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দুই, সদুপদেশ।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মানে হচ্ছে, নির্বোধদের মত চোখ বন্ধ করে দাওয়াত প্রচার করবে না। বরং বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তার মন-মানস, যোগ্যতা ও অবস্থার প্রতি নজর রেখে এবং এ সংগে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে হবে। একই লাঠি দিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া যাবে না। যে কোন ব্যক্তি বা দলের মুখোমুখি হলে প্রথমে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে, তারপর এমন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তার রোগ নিরসনের চেষ্টা করতে হবে যা তার মন-মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশ করে তার রোগের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে।

সদুপদেশের দুই অর্থ হয়। এক, যাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে তাকে শুধুমাত্র যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তৃপ্ত করে দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং তার আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আবেদন জানাতে হবে। দুষ্কৃতি ও ভ্রষ্টতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে বাতিল করলে হবে না বরং মানুষের প্রকৃতিতে এসবের বিরুদ্ধে যে জন্মগত ঘৃণা রয়েছে তাকেও উদ্দীপিত করতে হবে এবং সেগুলোর অশুভ পরিণতির ভয় দেখাতে হবে। ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ ও সৎকাজে আত্মনিয়োগ শুধু যে ন্যায়সংগত ও মহৎ গুণ, তা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করলে চলবে না বরং সেগুলোর প্রতি আকর্ষণও সৃষ্টি করতে হবে। দুই, উপদেশ এমনভাবে দিতে হবে যাতে আন্তরিকতা ও মংগলাকাংখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাকে উপদেশ দান করা হচ্ছে সে যেন একথা মনে না করে যে, উপদেশদাতা তাকে তাচ্ছিল্য

করছে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির স্বাদ নিচ্ছে। বরং সে অনুভব করবে উপদেশদাতার মনে তার সংশোধনের প্রবল আকাংখা রয়েছে এবং আসলে সে তার ভাল চায়।

১২৩. অর্থাৎ এটি যেন নিছক বিতর্ক, বুদ্ধির লড়াই ও মানসিক ব্যায়াম পর্যায়ের না হয়। এ আলোচনায় পেঁচিয়ে কথা বলা, মিথ্যা দোষারোপ ও রূঢ় বাক্যবাণে বিদ্ধ করার প্রবণতা যেন না থাকে। প্রতিপক্ষকে চুপ করিয়ে দিয়ে নিজের গলাবাজী করে যেতে থাকা এর উদ্দেশ্য হবে না। বরং এ বিতর্ক আলোচনায় মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে। উন্নত পর্যায়ের ভদ্র আচরণ করতে হবে। যুক্তি–প্রমাণ হতে হবে ন্যায়সংগত ও হৃদয়গ্রাহী। যাকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে তার মনে যেন জিদ, একগুঁয়েমী এবং কথার প্যাঁচ সৃষ্টি হবার অবকাশ না দেখা দেয়। সোজাসুজি তাকে কথা বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে এবং যখন মনে হবে যে, সে কূটতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছে তখনই তাকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, যাতে ভ্রষ্টতার নোংরা কাঁদামাটি সে নিজের গায়ে আরো বেশী করে মেখে নিতে পারে।

১২৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে সব ধরনের খারাপ পথ থেকে দূরে থাকে এবং সর্বদা সৎকর্মনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্যেরা তাদের সাথে যতই খারাপ আচরণ করুক না কেন তারা দুষ্কৃতির মাধ্যমে তার জবাব দেয় না বরং জবাব দেয় সুকৃতির মাধ্যমে।

বনী ইস্‌রাঈল

১৭

নামকরণ

চার নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ فِى الْكِتٰبِ থেকে বনী ইস্‌রাঈল নাম গৃহীত হয়েছে। বনী ইস্‌রাঈল এই সূরার আলোচ্য বিষয় নয়। বরং এ নামটিও কুরআনের অধিকাংশ সূরার মতো প্রতীক হিসেবেই রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

প্রথম আয়াতটিই একথা ব্যক্ত করে দেয় যে, মি'রাজের সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। হাদীস ও সীরাতের অধিকাংশ কিতাবের বর্ণনা অনুসারে হিজরাতের এক বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ সূরাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত।

পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করার পর তখন ১২ বছর অতীত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পথ রুখে দেবার জন্য তাঁর বিরোধীরা সব রকমের চেষ্টা করে দেখেছিল। তাদের সকল প্রকার বাধা বিপত্তির দেয়াল টপকে তাঁর আওয়াজ আরবের সমস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যার দু'চারজন লোক তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়নি। মক্কাতেই আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদের এমন একটি ছোট্ট দল তৈরী হয়ে গিয়েছিল যারা এ সত্যের দাওয়াতের সাফল্যের জন্য প্রত্যেকটি বিপদ ও বাধা–বিপত্তির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। মদীনায় শক্তিশালী আওস ও খায্‌রাজ গোত্র দু'টির বিপুল সংখ্যক লোক তার সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। এখন তাঁর মক্কা থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে বিক্ষিপ্ত মুসলমানদেরকে এক জায়গায় একত্র করে ইসলামের মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সময় ঘনিয়ে এসেছিল এবং অতিশীঘ্রই তিনি এ সুযোগ লাভ করতে যাচ্ছিলেন।

এহেন অবস্থায় মি'রাজ সংঘটিত হয়। মি'রাজ থেকে ফেরার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াবাসীকে এ পয়গাম শুনান।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় সতর্ক করা, বুঝানো ও শিক্ষা দেয়া এ তিনটি কাজই একটি আনুপাতিক হারে একত্র করে দেয়া হয়েছে।

সতর্ক করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। তাদেরকে বলা হয়েছে, বনী ইস্‌রাঈল ও অন্য জাতিদের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহর দেয়া যে অবকাশ খতম হবার সময় কাছে এসে গেছে তা শেষ হবার আগেই নিজেদেরকে সামলে নাও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের মাধ্যমে যে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তা গ্রহণ করো। অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে দুনিয়ায় আবাদ করা হবে। তাছাড়া হিজরাতের পর যে বনী ইস্‌রাঈলের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই অহী নাযিল হতে যাচ্ছিল পরোক্ষভাবে তাদেরকে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রথমে যে শাস্তি তোমরা পেয়েছো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর তোমরা যে সুযোগ পাচ্ছো তার সদ্ব্যবহার করো। এ শেষ সুযোগটিও যদি তোমরা হারিয়ে ফেলো এবং এরপর নিজেদের পূর্বতন কর্মনীতির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তি আসলে কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর রাখা হয়েছে, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে। তাওহীদ, পরকাল, নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে এ মৌলিক সত্যগুলোর ব্যাপারে যেসব সন্দেহ-সংশয় পেশ করা হচ্ছিল সেগুলো দূর করা হয়েছে। দলীল-প্রমাণ পেশ করার সাথে সাথে মাঝে মাঝে অস্বীকারকারীদের অজ্ঞতার জন্য তাদেরকে ধমকানো ও ভয় দেখানো হয়েছে।

শিক্ষা দেবার পর্যায়ে নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এমনসব বড় বড় মূলনীতির বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর ওপর জীবনের সমগ্র ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য। এটিকে ইসলামের ঘোষণাপত্র বলা যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে আরববাসীদের সামনে এটি পেশ করা হয়েছিল। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, এটি একটি নীল নক্‌শা এবং এ নীল নক্‌শার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দেশের মানুষের এবং তারপর সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবন গড়ে তুলতে চান।

এসব কথার সাথে সাথেই আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, সমস্যা ও সংকটের প্রবল ঘূর্ণাবর্তে মজবুতভাবে নিজের অবস্থানের ওপর টিকে থাকো এবং কুফরীর সাথে আপোশ করার চিন্তাই মাথায় এনো না। তাছাড়া মুসলমানরা যাদের মন কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম, নিপীড়ন, কূটতর্ক এবং লাগাতার মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের ফলে বিরক্তিতে ভরে উঠতো, তাদেরকে ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকার এবং প্রচার ও সংশোধনের কাজে নিজেদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমের জন্য তাদেরকে নামাযের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি এমন একটি জিনিস যা তোমাদের সত্যের পথের মুজাহিদদের যেসব উন্নত গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়া উচিত তেমনি ধরনের গুণাবলীতে ভূষিত করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, এ প্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুসলমানদের ওপর নিয়মিতভাবে ফরয করা হয়।

الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতে নিজের বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে তিনি বরকতময় করেছেন, যাতে তাকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখান।[১] আসলে তিনিই সবকিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।

১. এ ঘটনাটিই আমাদের পরিভাষায় "মি'রাজ" বা "ইস্‌রা" নামে পরিচিতি লাভ করেছে। অধিকাংশ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এ ঘটনাটি হিজরাতের এক বছর আগে সংঘটিত হয়। হাদীস ও সীরাতের বইগুলোতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিপুল সংখ্যক সাহাবী এ ঘটনা বর্ণনায় শামিল হয়েছেন। এঁদের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এঁদের মধ্য থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত মালিক ইবনে সা'সা (রা), হযরত আবু যার গিফারী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা)। এঁরা ছাড়াও হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং আরো বিভিন্ন সাহাবী থেকেও এ ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মজীদ এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুধুমাত্র মসজিদে হারাম (অর্থাৎ বায়তুল্লাহ তথা কাবা শরীফ) থেকে মসজিদে আক্‌সা (অর্থাৎ বায়তুল মাক্‌দিস) পর্যন্ত যাওয়ার কথা বর্ণনা করছে। এ সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলছে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তাঁর নিজের কিছু নিশানী দেখাতে চাচ্ছিলেন। কুরআনে এর বেশী কিছু বিস্তারিত বলা হয়নি। হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছেঃ রাতে জিব্রীল আলাইহিস সালাম তাঁকে উঠিয়ে বুরাকের পিঠে চড়িয়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্‌সা পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখানে তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের সাথে নামায পড়েন। তারপর জিব্রীল (আ) তাঁকে উর্ধ জগতের নিয়ে চলেন এবং সেখানে

আকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিপুল মর্যাদাশালী নবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। অবশেষে উচ্চতার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে তিনি নিজের রবের সামনে হাযির হন। এ উপস্থিতির সময় অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছাড়াও তাঁকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সংক্রান্ত আদেশ জানানো হয়। এরপর তিনি আবার বায়তুল মাকৃদিসের দিকে ফিরে আসেন। সেখান থেকে মসজিদে হারামে ফিরে আসেন। এ প্রসংগে বর্ণিত বিপুল সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নামও দেখানো হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, পরের দিন যখন তিনি লোকদের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করেন তখন মক্কার কাফেররা তাঁকে ব্যাপকভাবে বিদ্রূপ করতে থাকে এবং মুসলমানদের মধ্যেও কারোর কারোর ঈমানের ভিত নড়ে ওঠে।

হাদীসের এ বাড়তি বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিরোধী নয়, বরং তার বর্ণনার সম্প্রসারিত রূপ। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সম্প্রসারিত রূপকে কুরআনের বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। তবুও যদি কোন ব্যক্তি হাদীসে উল্লেখিত এ বিস্তারিত বিবরণের কোন অংশ না মানে তাহলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে না। তবে কুরআন যে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছে তা অস্বীকার করা অবশ্যই কুফরী।

এ সফরের ধরনটা কেমন ছিল? এটা কি স্বপ্নযোগে হয়েছিল, না জাগ্রত অবস্থায়? আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সশরীরে মি'রাজ সফর করেছিলেন, না নিজের জায়গায় বসে বসে নিছক রূহানী পর্যায়ে তাঁকে সবকিছু দেখানো হয়েছিল? কুরআন মজীদের শব্দাবলীই এসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। বলা হয়েছে سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى এ শব্দগুলো দিয়ে বর্ণনা শুরু করায় একথা প্রমাণ করে যে, এটি প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রমধর্মী একটি অতি বড় ধরনের অসাধারণ তথা অলৌকিক ঘটনা ছিল, যা মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় সংঘটিত হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, স্বপ্নের মধ্যে কোন ব্যক্তির এ ধরনের কোন জিনিস দেখে নেয়া অথবা কাশ্‌ফ হিসেবে দেখা কোন ক্ষেত্রে এমন গুরুত্ব রাখে না, যা বলার জন্য এ ধরনের ভূমিকা ফাঁদতে হবে যে, সকল প্রকার দুর্বলতা ও ত্রুটিমুক্ত হচ্ছে সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন অথবা কাশ্‌ফের মাধ্যমে এসব দেখিয়েছেন। তারপর "এক রাতে নিজের বান্দাকে নিয়ে যান" এ শব্দাবলীও দৈহিক সফরের কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। স্বপ্নযোগে সফর বা কাশ্‌ফের মধ্যে সফরের জন্য নিয়ে যাওয়া শব্দাবলী কোনক্রমেই উপযোগী হতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য একথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, এটি নিছক একটি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল না। বরং এটি ছিল পুরোদস্তুর একটি দৈহিক সফর এবং চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ। আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে এ সফর ও পর্যবেক্ষণ করান।

এখন যদি এক রাতে উড়োজাহাজ ছাড়া মক্কা থেকে বায়তুল মাকৃদিস যাওয়া আল্লাহর ক্ষমতায় সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে হাদীসে যেসব বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলোকেই বা কেমন করে অসম্ভব বলে প্রত্যাখ্যান করা যায়? সম্ভব ও অসম্ভবের বিতর্ক তো একমাত্র তখনই উঠতে পারে যখন কোন সৃষ্টির নিজের ক্ষমতায় কোন অসাধারণ কাজ করার ব্যাপার আলোচিত হয়। কিন্তু যখন আল্লাহর কথা আলোচনা হয়, আল্লাহ অমুক কাজ করেছেন, তখন সম্ভাব্যতার প্রশ্ন একমাত্র সে-ই উঠাতে পারে যে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে না। এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিস্তারিত বিবরণ

হাদীসে এসেছে সেগুলোর বিরুদ্ধে হাদীস অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি আপত্তিই কিছুটা গুরত্বসম্পন্ন।

এক ঃ এর আগেই আল্লাহর একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যথায় বান্দার সফর করে একটি বিশেষ স্থানে গিয়ে তাঁর সামনে হাযির হবার কি প্রয়োজন ছিল?

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন করে বেহেশ্‌ত ও দোযখ এবং অন্যান্য কিছু লোকের শাস্তিলাভের দৃশ্য দেখিয়ে দেয়া হলো? অথচ এখনো বান্দাদের স্থান ও মর্যাদার কোন ফায়সালাই হয়নি। শাস্তি ও পুরস্কারের ফায়সালা তো হবে কিয়ামতের পর কিন্তু কিছু লোকের শাস্তি এখনই দেয়া হয়ে গেলো, এ আবার কেমন কথা?

কিন্তু এ দুটি আপত্তিই আসলে স্বল্প চিন্তার ফল। প্রথম আপত্তিটি ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, স্রষ্টার সত্তা নিসন্দেহে অসীমতার গুণাবলী সম্পন্ন, কিন্তু সৃষ্টির সাথে আচরণ করার সময় তিনি নিজের কোন দুর্বলতার কারণে নয় বরং সৃষ্টির দুর্বলতার জন্য সীমাবদ্ধতার আশ্রয় নেন। যেমন সৃষ্টির সাথে কথা বলার সময় তিনি কথা বলার এমন সীমাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেন যা একজন মানুষ শুনতে ও বুঝতে পারে। অথচ তাঁর কথা মূলতই অসীমতার গুণ সম্পন্ন। অনুরূপভাবে যখন তিনি নিজের বান্দাকে নিজের রাজ্যের বিশাল মহিমান্বিত নিশানীসমূহ দেখাতে চান তখন বান্দাকে নিয়ে যান এবং যেখানে যে জিনিসটি দেখাবার দরকার সেখানেই সেটি দেখিয়ে দেন। কারণ বান্দা সমগ্র সৃষ্টিলোককে একই সময় ঠিক তেমনিভাবে দেখতে পারে না যেমনিভাবে আল্লাহ দেখতে পারেন। কোন জিনিস দেখার জন্য আল্লাহকে কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু বান্দাকে যেতে হয়। স্রষ্টার সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারটিও এ একই পর্যায়ের। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজস্বভাবে কোথাও সমাসীন নন। কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বান্দা নিজেই একটি জায়গার মুখাপেক্ষী। সেখানে তার জন্য স্রষ্টার জ্যোতির ঝলকসমূহ কেন্দ্রীভূত করতে হয়। নয়তো সীমাবদ্ধ বান্দার জন্য তাঁর অসীম সত্তার সাথে সাক্ষাত লাভ সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয় আপত্তিটির ভ্রান্তিও সুস্পষ্ট। কারণ মি'রাজের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে এমন অনেক জিনিস দেখানো হয়েছিল যার অনেকগুলোই ছিল আসল সত্যের প্রতীকী রূপ। যেমন একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের প্রতীকী রূপ ছিল এই যে, একটি ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মধ্য থেকে একটি মোটা সোটা ষাঁড় বের হলো এবং তারপর আর তার মধ্যে ফিরে যেতে পারলো না। অথবা যিনাকারীদের প্রতীকী রূপ ছিল, তাদের কাছে উন্নত মানের তাজা গোশ্‌ত থাকা সত্বেও তারা তা বাদ দিয়ে পচা গোশ্‌ত খাচ্ছে। অনুরূপভাবে খারাপ কাজের যেসব শাস্তি তাঁকে দেখানো হয়েছে সেখানেও পরকালীন শাস্তিকে রূপকভাবে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

মি'রাজের ব্যাপারে যে আসল কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, নবীদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে মহান আল্লাহ তাঁদের পদ মর্যাদানুসারে পৃথিবী ও আকাশের অদৃশ্য রাজত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন এবং মাঝখান থেকে বস্তুগত অন্তরাল হটিয়ে দিয়ে চর্মচক্ষু দিয়ে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যেগুলোর ওপর ঈমান বিল গায়েব আনার জন্য

وَاٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡكِتٰبَ وَجَعَلۡنٰهُ هُدًى لِّبَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اَلَّا تَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِىۡ وَكِيۡلًا ﴿٢﴾ ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوۡحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبۡدًا شَكُوۡرًا ﴿٣﴾ وَقَضَيۡنَاۤ اِلٰى بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ فِى الۡكِتٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِى الۡاَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَّ عُلُوًّا كَبِيۡرًا ﴿٤﴾

আমি ইতিপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইস্‌রাঈলের জন্য পথনির্দেশনার মাধ্যম করেছিলাম[২] এ তাকীদ সহকারে যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিজের অভিভাবক করো না।[৩] তোমরা তাদের আওলাদ যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম[৪] এবং নূহ একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল। তারপর আমি নিজের কিতাবে[৫] বনী ইস্‌রাঈলকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দু'বার পৃথিবীতে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং ভীষণ বিদ্রোহাত্মক আচরণ করবে।[৬]

তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে তাঁদের মর্যাদা একজন দার্শনিকের মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। দার্শনিক যা কিছু বলেন, আন্দাজ–অনুমান থেকে বলেন। তিনি নিজে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানলে কখনো নিজের কোন মতের পক্ষে সাক্ষ দেবেন না। কিন্তু নবীগণ যাকিছু বলেন, সরাসরি জ্ঞান ও চাক্ষুষ দর্শনের ভিত্তিতে বলেন। কাজেই তাঁরা জনগণের সামনে এ মর্মে সাক্ষ দিতে পারেন যে, তাঁরা এসব কথা জানেন এবং এসব কিছু তাঁদের স্বচক্ষে দেখা জ্বলজ্যান্ত সত্য।

২. মাত্র একটি আয়াতে মি'রাজের কথা আলোচনা করে তারপর হঠাৎ বনী ইস্‌রাঈলের আলোচনা শুরু করে দেয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টে এটা যেন কেমন বেখাপ্পা মনে হবে। কিন্তু সূরার মূল বক্তব্য ভালভাবে অনুধাবন করলে এ বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সংযোগ পরিষ্কার উপলব্ধি করা যাবে। সূরার মূল বক্তব্য হচ্ছে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা। যাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাদের এ মর্মে জানিয়ে দেবার জন্য শুরুতে শুধুমাত্র এ কারণে মি'রাজের আলোচনা করা হয়েছে যে, একথাগুলো এমন এক ব্যক্তি বলছেন যিনি এইমাত্র মহান আল্লাহর বিরাট মহিমান্বিত নিদর্শনসমূহ দেখে আসছেন। এরপর বনী ইস্‌রাঈলের ইতিহাস থেকে এ মর্মে শিক্ষা দেয়া হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব লাভকারীরা যখন আল্লাহর মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তখন দেখো তাদেরকে কেমন ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হয়।

৩. অভিভাবক অর্থাৎ বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভরসার ভিত্তিস্বরূপ যার ওপর নির্ভর করা যায়। নিজের যাবতীয় বিষয় যার হাতে সোপর্দ করে দেয়া যায়। পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভ করার জন্য যার দিকে রুজু করা যায়।

৪. অর্থাৎ নূহ ও তাঁর সাথীদের বংশধর হবার কারণে একমাত্র আল্লাহকেই অভিভাবক করা তোমাদের জন্য শোভা পায়। কারণ তোমরা যার বংশধর তিনি আল্লাহকে নিজের অভিভাবক করার বদৌলতেই প্লাবনের ধ্বংসকারিতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

৫. কিতাব মানে এখানে তাওরাত নয় বরং আসমানী সহীফাসমূহের সমষ্টি। কুরআনে এ জন্য পারিভাষিক শব্দ হিসেবে "আল কিতাব" কয়েক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. পবিত্র গ্রন্থাদির সমষ্টি বাইবেলে এ সতর্ক বাণী কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। প্রথম বিপর্যয় ও তার অশুভ পরিণতির জন্য বনী ইস্‌রাঈলকে গীতসংহিতা, যিশাইয়র, যিরমিয় ও যিহিস্কেলে সতর্ক করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিপর্যয় ও তার কঠিন শাস্তির যে ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ) করেছেন তা মথি ও লুকের ইনজীলে পাওয়া যায়। নিচে আমি এ গ্রন্থগুলোর সংশ্লিষ্ট কথাগুলো উদ্ধৃত করছি। এ থেকে কুরআনের বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাবে।

প্রথম বিপর্যয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম। তাঁর কথা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"তাহারা জাতিগুলিকে ধ্বংস করিল না, যাহা সদাপ্রভু করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা জাতিগুলির সহিত মিশিয়া গেল, উহাদের কার্যকলাপ শিখিল। আর উহাদের প্রতিমার পূজা করিল, তাহাতে সে সকল তাহাদের ফাঁদ হইয়া উঠিল, ফলে তাহারা আপনাদের পুত্রদিগকে আর আপনাদের কন্যাদিগকে শয়তানদের উদ্দেশ্যে বলিদান করিল। তাহারা নির্দোষদের রক্তপাত, তথা স্ব স্ব পুত্র কন্যাদেরই রক্তপাত করিল, কেনানীয় প্রতিমাগণের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বলিদান করিল; দেশ রক্তে অশুদ্ধ হইল। এই রূপে তাহারা আপনাদের কার্যে অশুচি, আপনাদের ক্রিয়ায় ব্যভিচারী হইল। তাহাতে আপন প্রজাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি আপন অধিকারকে ঘৃণা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জাতিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাদের শত্রুরা তাহাদের শাসক হইয়া গেল।" [গীতসংহিতা ১০৬ ঃ ৩৪-৪১]

যেসব ঘটনা পরে ঘটতে যাচ্ছিল এ বাক্যগুলোয় সেগুলোকে অতীত কালের ক্রিয়াপদে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো যেন ঘটে গেছে। এটি হচ্ছে আসমানী কিতাবের একটি বিশেষ বর্ণনারীতি।

তারপর যখন এ বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হয়ে গেল তখন এর ফলে যে ধ্বংস সংঘটিত হলো হযরত ইয়াসঈয়াহ নবী নিজের সহীফায় তার খবর এভাবে দিচ্ছেনঃ

"আহা, পাপিষ্ঠ জাতি, অপরাধে ভারগ্রস্ত লোক, দুষ্কর্মকারীদের বংশ, নষ্টাচারী সন্তানগণ; তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে, ইসরাঈলের পবিত্রাত্মাকে অবজ্ঞা করিয়াছে, বিপথে গিয়াছে, পরান্মুখ হইয়াছে। তোমরা আর কেন প্রহৃত হইবে? হইলে অধিক বিদ্রোহাচরণ করিবে।" [যিশইয় ১ঃ ৪-৫]

"সতী নগরী কেমন বেশ্যা হইয়াছে। সে তো ন্যায় বিচারে পূর্ণা ছিল। ধার্মিকরা তাহাতে বাস করিত, কিন্তু এখন হত্যাকারী লোকেরা থাকে .... তোমার সরদাররা

বিদ্রোহী ও চোরদের সখা ; তাহাদের প্রত্যেক জন উৎকোচ ভালবাসে ও পারিতোষিকের অনুধাবন করে; তাহার পিতৃহীন লোকের প্রতি ইনসাফ করে না, এবং বিধবার বিবাদ তাহাদের নিকট আসিতে পায় না। এজন্য প্রভু বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইসরাঈলের এক বীর কহেন, আহা, আমি আপন বিপক্ষদিগকে (দণ্ড দিয়া) শান্তি পাইব, ও আমার শত্রুদের নিকট হইতে প্রতিশোধ নিব।" [যিশাইয় ১ঃ ২১–২৪]

"তাহারা পূর্বদেশের প্রথায় পরিপূর্ণ ও পলেস্টীয়দের ন্যায় গণক হইয়াছে, এবং বিজাতীয় সন্তানদের হস্তে হস্ত দিয়াছে।............আর তাহাদের দেশ প্রতিমায় পরিপূর্ণ, তাহারা আপনাদের হস্ত নির্মিত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করে, তাহাত তাহাদেরই অংগুলি দ্বারা নির্মিত।" [যিশাইয় ২ ঃ ৬–৮]

"সদাপ্রভু আরো বলিলেন, সিয়োনের কন্যাগণ গর্বিতা, তাহারা গলা বাড়াইয়া কটাক্ষ করিয়া বেড়ায়, লঘুপদ সঞ্চারে চলে, ও চরণে রুনু রুনু শব্দ করে। অতএব প্রভু সিয়োনের কন্যাগণের মস্তক টাক পড়া করিবেন, ও সদাপ্রভু তাহাদের গুহ্যস্থান অনাবৃত করিবেন।..........তোমার পুরুষেরা খড়গ দ্বারা, ও তোমার বিক্রমীগণ সংগ্রামে পতিত হইবে। তাহার পুরদ্বার সকল ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে; আর সে উৎসন্না হইয়া ভূমিতে বসিবে।" [যিশাইয় ৩ ঃ ১৬–২৬]

"এখন দেখ, প্রভু [ফরাৎ] নদীর প্রবল ও প্রচুর জল, অর্থাৎ অশূর–রাজ ও তাহার সমস্ত প্রতাপকে, তাহাদের উপরে আনিবেন; সে ফাঁপিয়া সমস্ত খাল পূর্ণ করিবে, ও সমস্ত তীর ভূমির উপর দিয়া যাইবে।" [যিশাইয় ৮ঃ৭]

"কেননা উহারা বিদ্রোহী জাতি ও মিথ্যাবাদী সন্তান; উহারা সদাপ্রভুর ব্যবস্থা শুনিতে অসম্মত। তাহারা দর্শকদিগকে বলে, তোমরা দর্শন করিও না, নবীগণকে বলে, তোমরা আমাদের কাছে সত্য নবুওয়াত প্রকাশ করিও না, আমাদিগকে স্নিগ্ধ বাক্য বল, মিথ্যা নবুওয়াত প্রকাশ কর, পথ হইতে ফির, রাস্তা ছাড়িয়া দাও, ইসরাঈলের পবিত্রতমকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূর কর। অতএব ইসরাঈলের পবিত্রতম এই কথা কহেন, তোমরা এই বাক্য হেয় জ্ঞান করিয়াছ, এবং উপদ্রবের ও কুটিলতার উপর নির্ভর করিয়াছ, ও তাহা অবলম্বন করিয়াছ, এইহেতু সেই অপরাধ তোমাদের জন্য উচ্চ ভিত্তির পতনশীল দেয়ালের ন্যায় হইবে। যাহার ভংগ হঠাৎ মুহূর্ত মধ্যে উপস্থিত হয়। আর যেমন কুম্ভকারের পাত্র ভাঙ্গা যায়, তেমনি তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, চূর্ণ করিবেন, মমতা করিবেন না; যাহাতে চূলা হইতে অগ্নি তুলিতে কিম্বা কূপ হইতে জল তুলিতে একখানা খোলাও পাওয়া যাইবে না।" [৩০ ঃ ৯–১৪]

তারপর যখন বন্যার বাঁধ একেবারেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় তখন ইয়ারমিয়াহ (যিরমিয়) নবীর আওয়াজ বুলন্দ হয় এবং তিনি বলেন ঃ

"সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার কি অন্যায় দেখিয়াছে যে, তাহারা আমা হইতে দূরে গিয়াছে, অসারতার অনুগামী হইয়া অসার হইয়াছে?...........আমি তোমাদিগকে এই ফলবান দেশে আনিয়াছিলাম যেন তোমরা এখানকার ফল ও উত্তম উত্তম সামগ্রী ভোজন কর। কিন্তু তোমরা প্রবেশ করিয়া আমার দেশ অশুচি করিলে, আমার অধিকার ঘৃণাস্পদ করিলে।...........বস্তুত দীর্ঘকাল হইল

আমি তোমার যোয়ালি ভগ্ন করিয়াছিলাম, তোমার বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম; আর তুমি বলিয়াছিলে, আমি দাসত্ব করিব না; বাস্তবিক সমস্ত উচ্চ পর্বতের উপরে ও সমস্ত হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে তুমি নত হইয়া ব্যভিচার করিয়া আসিতেছ। (অর্থাৎ প্রত্যেকটি শক্তির সামনে নত হইয়াছ এবং প্রত্যেকটি মূর্তিকে সিজ্‌দা করিয়াছ)।...........চোর ধরা পড়িলে যেমন লজ্জিত হয়, তেমনি ইসরাঈলকুল, আপনারা ও তাহাদের রাজগণ, অধ্যক্ষবর্গ, যাজকগণ ও ভাববাদিগণ লজ্জিত হইয়াছে, বস্তুত তাহারা কাষ্ঠকে বলে, তুমি আমার পিতা, শিলাকে বলে, তুমি আমার জননী, তাহারা আমার প্রতি পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছে, মুখ নয়, কিন্তু বিপদকালে তাহারা বলিবে, 'তুমি উঠ, আমাদিগকে রক্ষা কর।' কিন্তু তুমি আপনার জন্য যাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছ, তোমার সেই দেবতারা কোথায়? তাহারাই উঠুক, যদি বিপদকালে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে; কেননা হে যিহূদা! তোমার যত নগর তত দেবতা।" [যিরমিয় ২ ঃ ৫–২৮]

"যোশিয় রাজার সময়ে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, বিপথগামিনী ইসরাঈল যাহা করিয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? সে প্রত্যেক উচ্চ পর্বতের উপরে ও প্রত্যেক হরিৎপূর্ণ বৃক্ষের তলে গিয়া সেই সকল স্থানে ব্যভিচার করিয়াছে। সে এই সকল কর্ম করিলে পরে আমি কহিলাম, সে আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল না, এবং তাহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনী যিহূদা তাহা দেখিল। আর আমি দেখিলাম, বিপথগামিনী ইসরাঈল ব্যভিচার (অর্থাৎ শির্‌ক) করিয়াছিল, এই কারণ প্রযুক্তই যদ্যপি আমি তাহাকে ত্যাগপত্র দিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার ভগিনী বিশ্বাসঘাতিনী যিহূদা ভয় করিল না, কিন্তু আপনিও গিয়া ব্যভিচার করিল। তাহার ব্যভিচারের নির্লজ্জতায় দেশ অশুচি হইয়াছিল ; সে প্রস্তর ও কাষ্ঠের সহিত ব্যভিচার (অর্থাৎ মূর্তিপূজা) করিত।" [যিরমিয় ৩ ঃ ৬–৯]

"তোমরা জেরুশালেমের সড়কে সড়কে দৌড়াদৌড়ি কর, দেখ, জ্ঞাত হও এবং তথাকার সকল চকে অন্বেষণ কর, যদি এমন একজনকেও পাইতে পার, যে ন্যায়াচরণ করে, সত্যের অনুশীলন করে, তবে আমি নগরকে ক্ষমা করিব।......আমি কিরূপে তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার সন্তানগণ আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, অনীশ্বরদের নাম লইয়া শপথ করিয়াছে ; আমি তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিলে তাহারা ব্যভিচার করিল, ও দলে দলে বেশ্যার বাটিতে গিয়া একত্র হইল। তাহারা খাদ্যপুষ্ট অশ্বের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেকজন পরস্ত্রীর প্রতি হ্রেষা করিল। আমি এই সকলের প্রতিফল দিব না, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমার প্রাণ কি এই প্রকার জাতির প্রতিশোধ দিবে না?" [যিরমিয় ৫ ঃ ১–৯]

"হে ইসরাঈল কুল, দেখ, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দূর হইতে এক জাতিকে আনিব ; সে বলবান জাতি, সে প্রাচীন জাতি ; তুমি সেই জাতির ভাষা জান না, তাহারা কি বলে তাহা বুঝিতে পার না। তাহাদের তূন খোলা কবরের ন্যায়, তাহারা সকলে বীর পুরুষ। তাহারা তোমার পক্ক শস্য ও তোমার অন্ন, তোমার পুত্রকন্যাগণের খাদ্য গ্রাস করিবে; তাহারা তোমার মেষপাল ও গোপাল গ্রাস করিবে, তোমার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরবৃক্ষ গ্রাস করিবে, তুমি যেসব প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বিশ্বাস করিতেছ, সে সকল তাহারা খড়্গ দ্বারা চুরমার করিবে।" [যিরমিয় ৫ ঃ ১৫–১৭]

"এই জাতির শব আকাশের পক্ষীসমূহের ও ভূমির পশুগণের ভক্ষ্য হইবে, কেহ তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে না। তখন আমি যিহূদার সকল নগরে ও জেরুশালেমের সকল পথে আমাদের রব ও আনন্দের রব, বরের রব ও কন্যার রব নিবৃত্ত করিব; কেননা দেশ ধ্বংসস্থান হইয়া পড়িবে।" [যিরমিয় ৭ ঃ ৩৩-৩৪]

"তুমি আমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে বিদায় কর, তাহারা চলিয়া যাউক। আর যদি তাহারা তোমাকে বলে, কোথায় চলিয়া যাইব? তবে তাহাদিগকে বলিও, সদাপ্রভু এইকথা কহেন, মৃত্যুর পাত্র মৃত্যুর স্থানে, খড়্গের পাত্র খড়্গের স্থানে, দুর্ভিক্ষের, পাত্র দুর্ভিক্ষের স্থানে, ও বন্দিত্বের পাত্র বন্দিত্বের স্থানে গমন করুক।" [যিরমিয় ১৫ ঃ ১-৩]

তারপর যথাসময়ে যিহিষ্কেল নবী উঠেন এবং তিনি জেরুশালেমকে উদ্দেশ করে বলেনঃ

"হে নগরী, তুমি নিজের মধ্যে রক্তপাত করিয়া থাকো, যেন তোমার কাল উপস্থিত হয় ; তুমি নিজের জন্য পুত্তলিগণকে নির্মাণ করিয়া থাকো, যেন তুমি অশুচি হও।.........দেখ, ইসরাঈলের অধ্যক্ষগণ, প্রত্যেক আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে, তোমার মধ্যে রক্তপাত করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তোমার মধ্যে পিতামাতাকে তুচ্ছ করা হইয়াছে, তোমার মধ্যে বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করা হইয়াছে; তোমার মধ্যে পিতৃহীনের ও বিধবার প্রতি জুলুম করা হইয়াছে। তুমি আমার পবিত্র বস্তুসমূহ অবজ্ঞা করিয়াছ, ও আমার বিশ্রামের দিনগুলিকে অপবিত্র করিয়াছ। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে চোগলখোররা আসিয়াছে ; তোমার মধ্যে লোকে কুকর্ম করিয়াছে; তোমার মধ্যে লোকে পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করিয়াছে ; তোমার মধ্যে লোকে ঋতুমতী অশুচি স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে ; তোমার মধ্যে কেহ আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ঘৃণার্হ কাজ করিয়াছে; কেহবা আপন পুত্রবধূকে কুকর্মে অশুচি করিয়াছে; আর কেহ বা তোমার মধ্যে আপনার ভগিনীকে, আপন পিতার কন্যাকে বলাৎকার করিয়াছে। রক্তপাত করণার্থে তোমার মধ্যে লোকে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে ; তুমি সুদও বৃদ্ধি লইয়াছ, উপদ্রব করিয়া লোভে প্রতিবেশীদের কাছে লাভ করিয়াছ এবং আমাকেই ভুলিয়া গিয়াছ, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন।....... তোমার হস্ত কি সবল থাকিবে? আমি সদাপ্রভু ইহা বলিলাম, আর ইহা সিদ্ধ করিব। আমি তোমাকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ও নানাদেশে বিকীর্ণ করিব এবং তোমার মধ্য হইতে তোমার অশুচিতা দূর করিব। তুমি জাতিগণের সাক্ষাতে আপনার দোষে অপবিত্রীকৃত হইবে, তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু।" [যিহিষ্কেল ২২ ঃ ৩-১৬]

প্রথম মহা বিপর্যয়ের সময় বনী ইস্‌রাঈলকে এই হুশিয়ার বাণীগুলো শুনানো হয়। তারপর দ্বিতীয় মহাবিপর্যয় ও তার ভয়াবহ ফলাফলের সম্মুখীন হবার পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সতর্ক করেন। মথি ২৩ অধ্যায়ে তাঁর একটি বিস্তারিত ভাষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে তিনি নিজের জাতির মারাত্মক নৈতিক অধপতনের সমালোচনা করে বলেন ঃ

"হা জেরুশালেম, জেরুশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে (নবীগণ) বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিকট যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক। কুক্কুটী যেমন

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ⑤

শেষ পর্যন্ত যখন এদের মধ্য থেকে প্রথম বিদ্রোহের সময়টি এলো তখন হে বনী ইস্‌রাঈল! আমি তোমাদের মোকাবিলায় নিজের এমন একদল বান্দার আবির্ভাব ঘটালাম, যারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, যা পূর্ণ হওয়াই ছিল অবধারিত।[৭]

আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কতবার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন পড়িয়া রহিল।" [২৩ ঃ ৩৭-৩৮]

"আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপর থাকিবে না, সমস্তই ভূমিস্মাৎ হইবে।" [মথি ২৪ ঃ ২]

তারপর রোমান সরকারের কর্মকর্তারা তাঁকে শূলে চড়াবার (তাদের কথা মতো) জন্য নিয়ে যাচ্ছিল এবং নারীসহ বিপুল সংখ্যক জনতা বিলাপ করতে করতে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিল তখন তিনি শেষবার জনতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ

"ওগো জেরুশালেমের কন্যাগণ, আমার জন্য কাঁদিওনা, বরং আপনাদের ও আপন আপন সন্তান সন্তুতিদের জন্য কাঁদ। কেননা দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময় লোকে বলিবে, ধন্য সেই স্ত্রী লোকেরা, যাহারা বন্ধ্যা, যাহাদের উদর কখনো প্রসব করে নাই, যাহাদের স্তন কখনো দুগ্ধ দেয় নাই। সেই সময় লোকেরা পর্বতগণকে বলিতে আরম্ভ করিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং উপপর্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ।" [লুক ২৩ ঃ ২৮-৩০]

৭. এখানে আসিরীয়াবাসী ও ব্যবিলনবাসীদের হাতে বনী ইস্‌রাঈলদের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ নেমে এসেছিল সে কথাই বলা হয়েছে। এর ঐতিহাসিক পটভূমি অনুধাবন করার জন্য ওপরে আমি নবীগণের সহীফাসমূহ থেকে যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছি শুধুমাত্র সেটুকু জানাই যথেষ্ট নয়, বরং এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বর্ণনারও প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যেসব কারণে মহান আল্লাহ একটি কিতাবধারী জাতিকে মানব জাতির নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে একটি পরাজিত, গোলাম ও অনুন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন সেই মূল কারণগুলো একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত মূসার (আ) ইন্তিকালের পর বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিভিন্ন জাতি বাস করতো। হিত্তী, আম্মাস্তুরী, কান্‌আনী, ফিরিযূযী, ইয়াবূসী, ফিলিস্তী ইত্যাদি। এসব জাতি মারাত্মক ধরনের শির্‌কে লিপ্ত ছিল। এদের সবচেয়ে বড় মাবুদের নাম ছিল "ঈল"। একে তারা বলতো দেবতাগণের পিতা। আর সাধারণত তারা একে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করতো। তার স্ত্রীর নাম ছিল "আশীরাহ"। তার গর্ভজাত সন্তানদের থেকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীদের একটি বিশাল বংশধারা শুরু হয়। এ সন্তানদের সংখ্যা ৭০–এ গিয়ে পৌছেছিল। তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল বা'ল। তাকে বৃষ্টি ও উৎপাদনের ঈশ্বর এবং পৃথিবী ও আকাশের মালিক মনে করা হতো। উত্তরাঞ্চলে তার স্ত্রীকে 'উনাস' বলা হতো এবং ফিলিস্তীনে বলা হতো 'ইস্‌তারাত'। এ মহিলাদ্বয় ছিল প্রেম ও সন্তান উৎপাদনের দেবী। এরা ছাড়া আরো যেসব দেবতা ছিল তাদের মধ্যে কেউ ছিল মৃত্যুর দেবতা, কেউ ছিল স্বাস্থ্যের দেবী আবার কোন দেবতা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব ঘটাতো এভাবে সমগ্র প্রভুত্বের কাজ কারবার বহু সংখ্যক উপাস্যের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ সব দেব–দেবীকে এমনসব গুণে গুণান্বিত করা হয়েছিল যে, সমাজের নৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুরাচার ব্যক্তিও তাদের সাথে নিজের নাম জড়িত করে লোকসমক্ষে পরিচিতি লাভ করা পছন্দ করতো না। এখন একথা সুস্পষ্ট, যারা এ ধরনের বদ ও নিকৃষ্ট সত্তাদেরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের পূজা–উপাসনা করে, তারা নৈতিকতার নিকৃষ্টস্তরে নেমে যাওয়া থেকে নিজেদেরকে কেমন করে রক্ষা করতে পারে। এ কারণেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করার পর তাদের অবস্থার যে চিত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে তা তাদের মারাত্মক ধরনের নৈতিক অধঃপতনের সাক্ষ দিচ্ছে। শিশু বলিদানের ব্যাপারটি তাদের সমাজে সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাদের উপাসনালয়গুলো ব্যভিচারের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। মেয়েদেরকে দেবদাসী বানিয়ে উপাসনালয়গুলোতে রাখা এবং তাদের দিয়ে ব্যভিচার করানো ইবাদত ও উপাসনার অংগে পরিণত হয়েছিল। এ ধরনের আরো বহু চরিত্র বিধ্বংসী কাজ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তাওরাতে হযরত মূসার (আ) সাহায্যে বনী ইসরাঈলকে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল তাতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল, তোমরা ঐ সব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে ফিলিস্তীন ভূখণ্ড তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে এবং তাদের সাথে বসবাস করা থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের নৈতিক ও আকীদা–বিশ্বাসগত দোষ–ত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু বনী ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনে প্রবেশ করলো তখন তারা একথা ভুলে গেলো। তারা নিজেদের কোন সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলো না। গোত্র প্রীতি ও গোত্রীয় বিদ্বেষে তারা মত্ত হয়ে গেলো। তাদের বিভিন্ন গোত্র বিজিত এলাকার এক একটি অংশ নিয়ে নিজের এক একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করাই পছন্দ করলো। এ বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের কোন একটি গোত্রও নিজের এলাকা থেকে মুশরিকদেরকে পুরোপুরি নির্মূল করে দেবার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করাটাই তাদের পছন্দ করে নিতে হলো। শুধু এ নয় বরং তাদের বিজিত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঐ সব মুশরিক জাতির ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রও অক্ষুণ্ন থাকলো। বনী ইস্‌রাঈলরা সেগুলো জয় করতে পারলো না। যাবুরের (গীতসংহিতা) বক্তব্যে এরই অভিযোগ করা হয়েছে। এই সূরার ৬ টীকার শুরুতে আমি এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি।

হযরত মূসার (আ) পর বনী-ইসরাঈলীরা ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল জয় করিয়া লয় বটে; কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া নিজেদের কোন একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা এই গোটা অঞ্চলটিকে বিভিন্ন বনী ইস্রাঈল গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে বিভক্ত ও বন্টন করিয়া লয়। ফলে তাহারা নিজেদের ক্ষুদ্রায়তন বহু কয়টি গোত্রীয় রাষ্ট্র কায়েম করে। অত্র চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, ফিলিস্তিনের সংক্ষিপ্ততম অঞ্চলটি বনীইস্রাঈলের বনু ইয়াহুদাহ, বনু শামঊন, বনু দান, বনু বিন্ইয়াসিন, বনু আফরায়াম, বনু রুবন, বনু জাদ্দ, বনু মুনাস্সা, বনু আশকার, বনু জুবুলুন, বনু নাফতালী ও বনু আশের —এ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এ কারণে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই দুর্বল হইয়া থাকিল। ফলে তাহারা তাওরাত কিতাবের লক্ষ অর্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম থাকিয়া গেল: আর সেই লক্ষ ছিল এই অঞ্চলের অধিবাসী মুশরিক জাতিগুলির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন ও বহিষ্কার।

ইসরাঈলী গোত্রসমূহের অধীন এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুশরিক কিনয়ানী জাতিসমূহের বহু কতকগুলি নগর-রাষ্ট্র রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাইবেল পাঠে জানিতে পারা যায় যে, তালূত-এর শাসন আমল পর্যন্ত সাইদা, সূর, দুয়ার ও মুজেদ্দু, বাইতেশান, জজর, জেরুশালেম প্রভৃতি শহরগুলি প্রখ্যাত মুশরিক জাতিগুলির দখলে থাকিয়া গিয়াছিল। আর বনী ইসরাঈলদের উপর এসব শহরে অবস্থিত মুশরিকী সভ্যতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল।

উপরন্তু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর অবস্থানের সীমান্ত এলাকায় ফলস্তিয়া, রোমক, মুয়াবী ও আমূনীয়দের অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও যথারীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহারা পরবর্তীকালে উপর্যুপরি আক্রমণ চালাইয়া ইসরাঈলীদের দখল হতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এ দাঁড়িয়েছিল যে, সমগ্র ফিলিস্তিন হতে ইয়াহুদীদেরকে কান ধরিয়া ও গলা ধাক্কা দিয়া বহিষ্কৃত করা হইত—যদি যথা সময়ে আল্লাহ তায়ালা তালূত-এর নেতৃত্বে ইসরাঈলীদেরকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করিয়া না দিতেন।

হযরত মূসার (আ) পরবর্তী ফিলিস্তিন
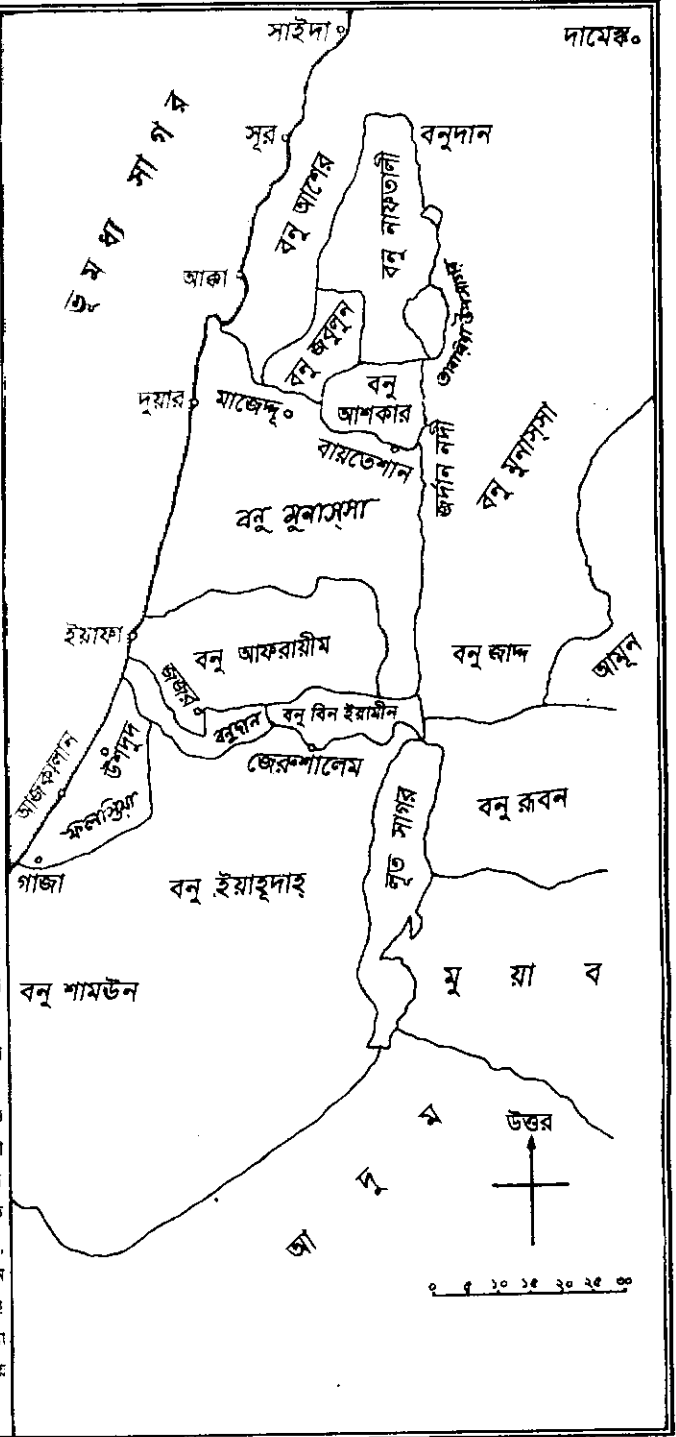
বনী ইস্‌রাঈলকে এর প্রথম দণ্ড ভোগ করতে হলো এভাবে যে, ঐ জাতিগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যে শির্‌ক অনুপ্রবেশ করলো এবং এ সাথে অন্যান্য নৈতিক অনাচারও ধীরে ধীরে প্রবেশ করার পথ পেয়ে গেলো। বাইবেলের বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে এ সম্পর্কে এভাবে অনুযোগ করা হয়েছে ঃ

"ইস্‌রাঈল সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল; এবং বাল্‌ দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, যিনি তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের, অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দিকস্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এইরূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারোৎ দেবীদের সেবা করিত। তাহাতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল।" [বিচারকর্তৃগণ ২ ঃ ১১-১৩]

এরপর তাদের দ্বিতীয় দণ্ড ভোগ করতে হলো। সেটি হচ্ছে, যেসব জাতির নগর রাষ্ট্রগুলোকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল তারা এবং ফিলিস্তীয়রা, যাদের সমগ্র এলাকা অবিজিত রয়ে গিয়েছিল, বনী ইস্‌রাঈলদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করলো এবং লাগাতার হামলা করে ফিলিস্তীনের বৃহত্তম অংশ থেকে তাদেরকে বেদখল করলো। এমনকি তাদের কাছ থেকে সদাপ্রভুর অংগীকারের সিন্দুকও (শান্তির তাবুত) ছিনিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত বনী ইস্‌রাঈলরা অনুভব করলো, তাদের একজন শাসকের অধীনে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ফলে তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শামুয়েল নবী ১০২০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তালূতকে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন। (সূরা বাকারার ৩২ রুকূতে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

এ সংযুক্ত রাষ্ট্রের শাসনকর্তা হয়েছিলেন তিনজন। খৃঃপূ ঃ ১০২০ থেকে ১০০৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন তালূত, খৃঃ পূঃ ১০০৪ থেকে ৯৬৫ সাল পর্যন্ত হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং খৃঃ পূঃ ৯৬৫ থেকে ৯২৬ সাল পর্যন্ত হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের পর বনী ইসরাঈলরা যে কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছিল এ শাসনকর্তাগণ সেটি সম্পূর্ণ করেন। শুধুমাত্র উত্তর উপকূলে ফিনিকিয়দের এবং দক্ষিণ উপকূলে ফিলিস্তীয়দের রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থেকে যায়। এ রাষ্ট্র দু'টি জয় করা সম্ভব হয়নি। ফলে এদেরকে শুধু করদ রাষ্ট্রে পরিণত করেই ক্ষান্ত হতে হয়।

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের পরে বনী ইসরাঈল আবার ভীষণভাবে দুনিয়াদারী ও বৈষয়িক স্বার্থপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেদের দু'টো পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করে নিল। উত্তর ফিলিস্তীন ও পূর্ব জর্দানে ইসরাঈল রাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত সামেরীয়া এর রাজধানী হলো। অন্যদিকে দক্ষিণ ফিলিস্তীন ও আদোন অঞ্চলে কায়েম হলো ইহুদিয়া রাষ্ট্র। জেরুশালেম হলো এর রাজধানী। প্রথম দিন থেকেই এ দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো মারাত্মক ধরনের রেষারেষি ও সংঘাত-সংঘর্ষ এবং শেষ দিন পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকলো।

এদের মধ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্রের শাসক ও বাসিন্দারাই সর্বপ্রথম প্রতিবেশী জাতিদের মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক বিকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলো। এ রাষ্ট্রের শাসক

আখীয়াব সাইদার মুশরিক শাহজাদী ইসাবেলাকে বিয়ে করার পর এ দুরাবস্থা চরমে পৌঁছে গেলো। এ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও উপায়–উপকরণের মাধ্যমে শির্ক ও নৈতিক অনাচার বন্যার বেগে ইস্‌রাঈলীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। হযরত ইলিয়াস ও হযরত আল–ইয়াসা' আলাইহিমাস্‌ সালাম এ বন্যা রুখে দেবার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু এ জাতি যে অনিবার্য পতনের দিকে ছুটে চলছিল তা থেকে আর নিবৃত্ত হলো না। শেষে আশূরীয় বিজেতাদের আকারে আল্লাহর গযব ইস্‌রাঈল রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে এলো এবং খৃষ্টপূর্ব নবম শতক থেকে ফিলিস্তীনের ওপর আশূরীয় শাসকদের উপর্যুপরি হামলা শুরু হয়ে গেলো। এ যুগে আমূস (আমোস্‌) নবী (খৃঃ পূঃ ৭৮৭–৭৪৭) এবং তারপর হোসী' (হোশেয়) নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭৪৭–৭৩৫) ইসরাঈলীদেরকে অনবরত সতর্ক করে যেতে থাকলেন। কিন্তু যে গাফলতির নেশায় তারা পাগল হয়ে গিয়েছিল সতর্কবাণীর তিক্ত রসে তার তীব্রতা আরো বেড়ে গেলো। এমন কি ইসরাঈলী বাদশাহ আমূস নবীকে দেশত্যাগ করার এবং সামেরীয় রাজের এলাকার চতুঃসীমার মধ্যে তাঁর নবুওয়াতের প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আর বেশীদিন যেতে না যেতেই ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্র ও তার বাসিন্দাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে এলো। খৃষ্টপূর্ব ৭২১ অব্দে আশূরীয়ার দুর্ধর্ষ শাসক সারাগুন সামেরীয়া জয় করে ইস্‌রাঈল রাষ্ট্রের পতন ঘটালো। হাজার হাজার ইস্‌রাঈলী নিহত হলো। ২৭ হাজারেরও বেশী প্রতিপত্তিশালী ইসরাঈলীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে আশূরীয় রাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তের জেলাসমূহে ছড়িয়ে দেয়া হলো এবং অন্যান্য এলাকা থেকে অইস্‌রাঈলীদেরকে এনে ইসরাঈলী এলাকায় পুনর্বাসিত করা হলো। এদের মধ্যে বসবাস করে ইস্‌রাঈলীদের দলছুট অংশও নিজেদের জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে দিনের পর দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকলো।

ইহুদীয়া নামে বনী ইস্‌রাঈলদের যে দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি দক্ষিণ ফিলিস্তীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটিও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর অতি শীঘ্রই শির্ক ও নৈতিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্রের তুলনায় তার আকীদাগত এবং নৈতিক অধপতনের গতি ছিল মন্থর। তাই তার অবকাশকালও ছিল একটু বেশী দীর্ঘ। ইস্‌রাঈলী রাষ্ট্রের মত তার ওপরও আশূরীয়রা যদিও উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল, তার নগরগুলো ধ্বংস করে চলছিল এবং তার রাজধানী অবরোধ করে রেখেছিল, তবুও এ রাজ্যটি আশূরীয়দের হাতে পুরোপুরি বিজিত হয়নি, বরং এটি তাদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তারপর যখন হযরত ইয়াসইয়াহ (যিশাইয়) ও হযরত ইয়ারমিয়াহর (যিরমিয়) অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টা সত্বেও ইয়াহুদিয়ার লোকেরা মূর্তি পূজা ও নৈতিক অনাচার ত্যাগ করলো না তখন খৃষ্টপূর্ব ৫৯৮ সালে ব্যবিলনের বাদশাহ বখ্‌তে নসর জেরুশালেমসহ সমগ্র ইয়াহুদিয়া রাজ্য জয় করে নিল এবং ইয়াহুদিয়ার বাদশাহ তার হাতে বন্দী হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো। ইহুদীদের অপকর্মের ধারা এখানেই শেষ হলো না। হযরত ইয়ারমিয়াহর হাজার বুঝানো সত্বেও তারা নিজেদের চরিত্র কর্ম সংশোধন করার পরিবর্তে ব্যবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষে ৫৮৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে বখ্‌তে নসর একটি বড় আকারের হামলা চালিয়ে ইয়াহুদিয়ার ছোট বড় সমস্ত শহর ধ্বংস করে দিল এবং জেরুশালেম ও হাইকেলে সুলায়মানীকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করলো যে, তার একটি দেয়ালও অক্ষত রইলো না, সবকিছু ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিল। বিপুল সংখ্যক ইহুদীদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে বিভিন্ন দেশে

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنٰكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيْرًا ۝٦

এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে সাহায্য করেছি অর্থ ও সন্তানের সাহায্যে আর তোমাদের সংখ্যা আগের চাইতে বাড়িয়ে দিয়েছি।[৮]

বিতাড়িত করলো। আর যেসব ইহুদী নিজেদের এলাকায় থেকে গেলো তারাও প্রতিবেশী জাতিদের পদতলে নিকৃষ্টভাবে দলিত মথিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকলো।

এটিই ছিল প্রথম বিপর্যয়। বনী ইসরাঈলকে এ বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। আর এটিই ছিল প্রথম শাস্তি। এ অপরাধে তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

৮. এখানে ইহুদীদেরকে (ইয়াহুদিয়াবাসী) ব্যবিলনের দাসত্বমুক্ত হবার পর যে অবকাশ দেয়া হয় সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। সামেরীয়া ও ইস্রাঈলের লোকদের সম্পর্কে বলা যায়, আকীদাগত ও নৈতিক পতনের গর্তে পা দেবার পর তারা আর সেখান থেকে উঠতে পারেনি। কিন্তু ইয়াহুদিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক ছিল, যারা সততা ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সুকৃতি ও কল্যাণের দাওয়াত দিয়ে আসছিল। তারা ইয়াহুদিয়ায় যেসব ইহুদী থেকে গিয়েছিল তাদের মধ্যে সংস্কারমূলক কাজ করতে থাকলো এবং ব্যবিলন ও অন্যান্য এলাকায় যাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছিল তাদেরকেও তাওবা ও অনুশোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত তাদের সহায়ক হলো। ব্যবিলন রাষ্ট্রের পতন হলো। খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ইরানী বিজেতা সাইরাস (খুরস বা খসরু) ব্যবিলন জয় করে এবং তারপরের বছরই এক ফরমান জারী করে। এ ফরমানের সাহায্যে বনী ইস্রাঈলকে নিজেদের স্বদেশভূমিতে ফিরে যাবার এবং সেখানে পুনরায় বসবাস করার সাধারণ অনুমতি দেয়া হয়। এরপর ইয়াহুদিয়ার দিকে ইহুদীদের কাফেলার সারি চলতে থাকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এর সিলসিলা অব্যাহত থাকে। সাইরাস ইহুদীদেরকে হাইকেলে সুলাইমানী পুনর্বার নির্মাণ করারও অনুমতি দেয়। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ এলাকায় নতুন বসতিকারী প্রতিবেশী জাতিগুলো এতে বাধা দিতে থাকে। শেষে প্রথম দারায়ুস (দারা) ৫২২ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইয়াহুদিয়ার শেষ বাদশাহর নাতি সরুব্বাবিলকে ইয়াহুদিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করে। সে হাজ্জী (হগয়) নবী, যাকারিয়া (সখরিয়) নবী ও প্রধান পুরোহিত যেশূয়ের তত্বাবধানে পবিত্র হাইকেল পুনরনির্মাণ করে। তারপর খৃষ্টপূর্ব ৪৫৮ সালে হযরত উযাইর (ইয্রা) ইয়াহুদিয়ায় পৌঁছেন। পারস্যরাজ ইর্‌দশীর এক ফরমান বলে তাঁকে এ মর্মে ক্ষমতা দান করেন ঃ

"হে উযাইর তোমার ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান তোমার করতলে আছে, তদনুসারে নদী পারস্থ সকল লোকের বিচার করিবার জন্য, যাহারা তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানে, এমন শাসনকর্তা ও বিচারকর্তাদিগকে নিযুক্ত কর ; এবং যে তাহা না জানে, তোমরা তাহাকে শিক্ষা দাও। আর যে কেহ তোমার ঈশ্বরের ব্যবস্থা ও রাজার ব্যবস্থা পালন
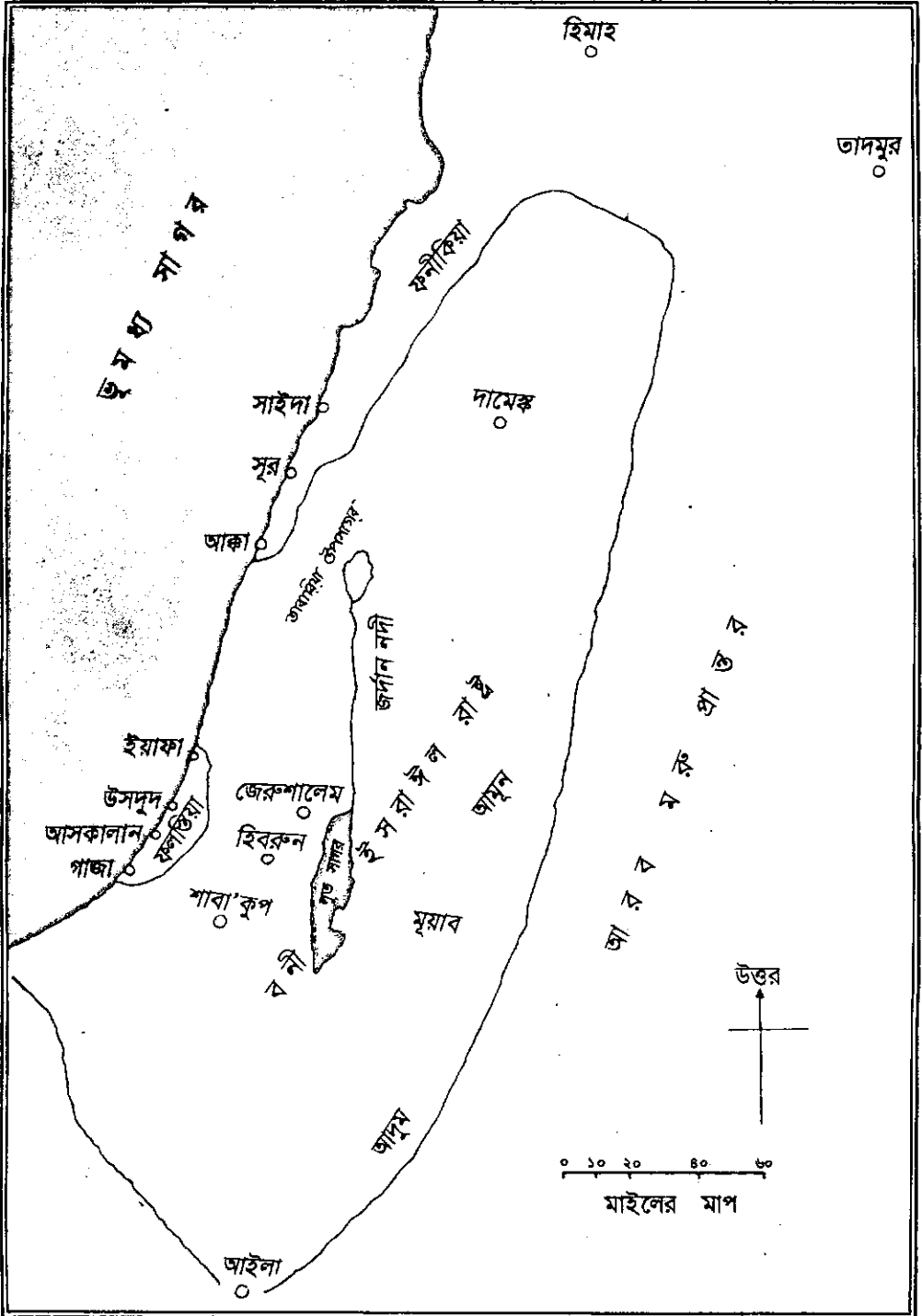
হযরত দাউদ ও সোলাইমানের (আ) সাম্রাজ্য (১০০০-৯৩০ খৃষ্টপূর্ব)
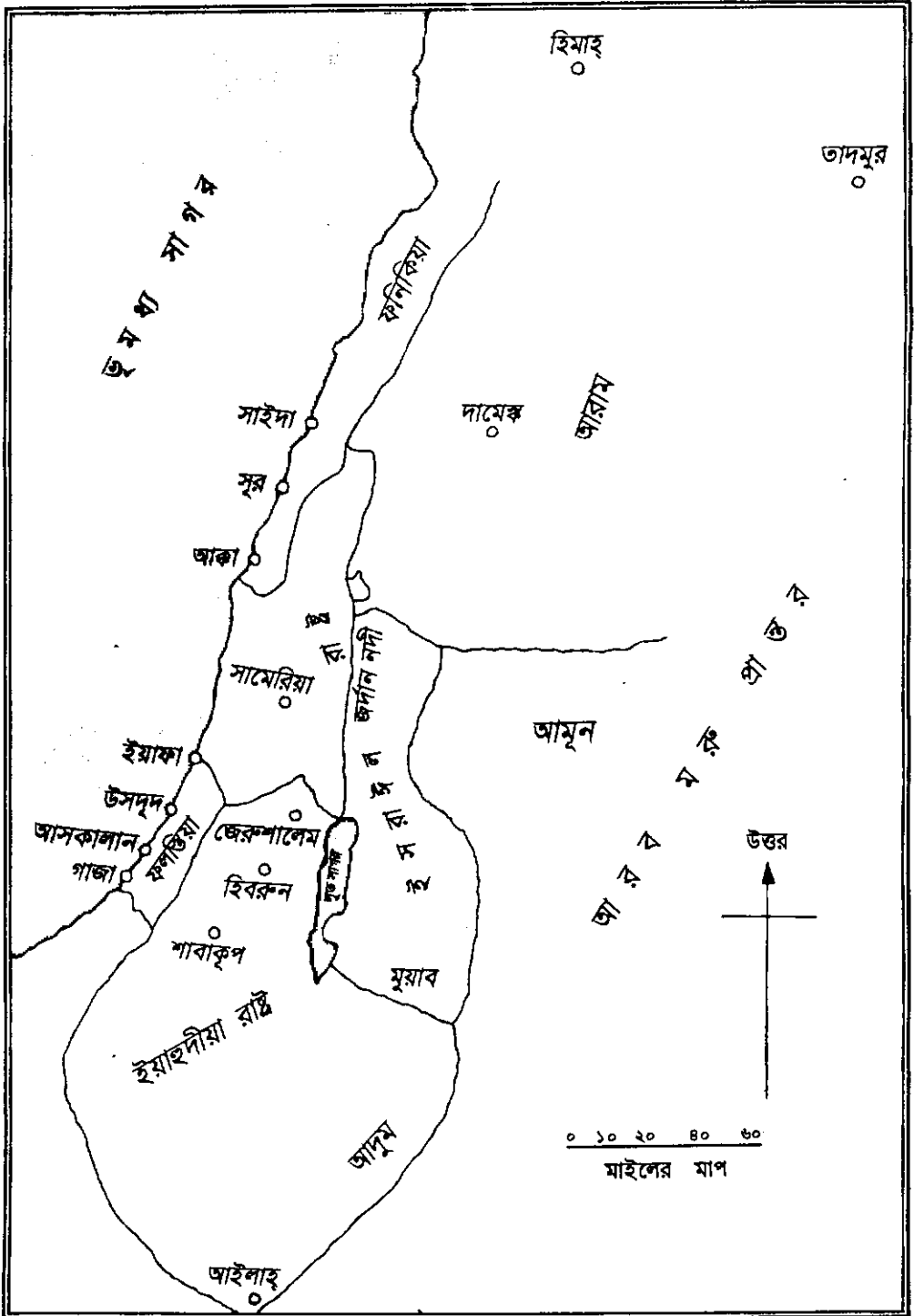
বনী ইসরাঈলদের দুই রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়া ও ইসরাইল (খৃষ্টপূর্ব ৮৬০)

করিতে অসম্মত তাহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হউক ; তাহার প্রাণদণ্ড, নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কিম্বা কারাদণ্ড হউক।" [ইস্রা ৭ ঃ ২৫–২৬]

এ ফরমানের সুযোগ গ্রহণ করে হযরত উযাইর মূসার দীনের পুনরুজ্জীবনের বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তিনি বিভিন্ন এলাকা থেকে ইহুদী জাতির সকল সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোককে একত্র করে একটি শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাওরাত সম্বলিত বাইবেলের পঞ্চ পুস্তক একত্র সংকলিত ও বিন্যস্ত করে তিনি তা প্রকাশ করেন। ইহুদীদের দীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অন্য জাতিদের প্রভাবে বনী ইস্‌রাঈলদের মধ্যে যেসব আকীদাগত ও চারিত্রিক অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল শরীয়াতের আইন জারী করে তিনি সেগুলো দূর করে দিতে থাকেন। ইহুদীরা যেসব মুশরিক মেয়েকে বিয়ে করে তাদেরকে নিয়ে ঘর সংসার করছিল তাদেরকে তালাক দেবার ব্যবস্থা করেন। বনী ইস্‌রাঈলদের থেকে আবার নতুন করে আল্লাহর বন্দেগী করার এবং তাঁর আইন মেনে চলার অংগীকার নেন।

খৃষ্টপূর্ব ৪৪৫ সালে নহিমিয়ের নেতৃত্বে আর একটি বহিষ্কৃত ইহুদী দল ইয়াহুদিয়ায় ফিরে আসে। পারশ্যের রাজা নহিমিয়কে জেরুশালেমের গভর্নর নিযুক্ত করে তাকে এই নগরীর প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করার অনুমতি দেয়। এভাবে দেড়শো বছর পরে বায়তুল মাকদিস পুনরায় আবাদ হয় এবং তা ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা–সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু সামেরিয়া ও উত্তর ফিলিস্তীনের ইস্‌রাঈলীরা হযরত উযাইরের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন কর্মকাণ্ড থেকে লাভবান হবার কোন সুযোগ গ্রহণ করেনি। বরং বায়তুল মাকদিসের মোকাবিলায় জারযীম পাহাড়ে নিজেদের একটি ধর্মীয় কেন্দ্র নির্মাণ করে তাকে আহলি কিতাবদের কিবলায় পরিণত করার চেষ্টা করে। এভাবে ইহুদী ও সামেরীয়দের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে।

পারস্য সাম্রাজ্যের পতন এবং আলেকজাণ্ডারের বিজয় অভিযান ও গ্রীকদের উত্থানের ফলে কিছুকালের জন্য ইহুদীরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সিরিয়ার এলাকা পড়ে সালুকী রাজ্যের অংশে। এর রাজধানী ছিল ইনতাকিয়ায়। এর শাসনকর্তা তৃতীয় এন্টিউকাস খৃষ্টপূর্ব ১৯৮ সালে ফিলিস্তীন দখল করে নেয়। এ গ্রীক বিজেতা ছিল মুশরিক ও নৈতিক চরিত্রহীন। ইহুদী ধর্ম ও সভ্যতা–সংস্কৃতিকে সে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। এর মোকাবিলা করার জন্য সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। এ সংগে ইহুদীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও তার ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এ বাইরের অনুপ্রবেশ ইহুদী জাতির মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের একটি দল গ্রীক পোশাক, গ্রীক ভাষা, গ্রীক জীবন যাপন পদ্ধতি ও গ্রীক খেলাধূলা গ্রহণ করে নেয় এবং অন্যদল নিজেদের সভ্যতা–সংস্কৃতিকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে। খৃষ্টপূর্ব ১৭৫ সালে চতুর্থ এন্টিউকাস (যার উপাধি ছিল এপিফানিস বা আল্লাহর প্রকাশ) সিংহাসনে বসে ইহুদী ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য রাজশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে। বায়তুল মাকদিসের হাইকেলে সে জোরপূর্বক মূর্তি স্থাপন করে এবং সেই মূর্তিকে সিজদা করার জন্য ইহুদীদেরকে বাধ্য করে। ইতিপূর্বে যেখানে কুরবানী করা হতো সেখানে কুরবানী করাও বন্ধ করিয়ে দেয় এবং ইহুদীদেরকে মুশরিকদের কুরবানী করার

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑦

দেখো, তোমরা ভাল কাজ করে থাকলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভাল ছিল আর খারাপ কাজ করে থাকলে তোমাদের নিজেদেরই জন্য তা খারাপ প্রমাণিত হবে। তারপর যখন পরবর্তী প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে তখন আমি অন্য শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং (বায়তুল মাক্‌দিসের) মসজিদে এমনভাবে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার শত্রুরা ঢুকে পড়েছিল আর যে জিনিসের ওপরই তাদের হাত পড়ে তাকে ধ্বংস করে রেখে দেয়।[৯]

জায়গায় কুরবানী করার হুকুম দেয়। যারা নিজেদের ঘরে তাওরাত রাখে অথবা শনিবারের দিনের বিধান মেনে চলে কিংবা নিজেদের শিশু সন্তানদের খত্‌না করায় তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান জারী করে। কিন্তু ইহুদীরা এ শক্তি প্রয়োগের সামনে মাথা নত করেনি। তাদের মধ্যে একটি দুর্বার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এ আন্দোলনটি "মাক্কাবী বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। যদিও এ সংঘাত–সংঘর্ষকালে গ্রীক প্রভাবিত ইহুদীদের যাবতীয় সহানুভূতি গ্রীকদের পক্ষেই ছিল এবং তারা কার্যত মাক্কাবী বিদ্রোহ নির্মূল করার জন্য ইনতাকিয়ার জালেমদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল তবুও সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে হযরত উযাইরের দীনী কার্যক্রমের বিপ্লবাত্মক ভাবধারা এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে তারা সবাই শেষ পর্যন্ত মাক্কাবীদের সাথে সহযোগিতা করে। এভাবে একদিন তারা গ্রীকদের বিতাড়িত করে নিজেদের একটি স্বাধীন দীনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এ রাষ্ট্রটি খৃষ্টপূর্ব ৬৭ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ রাষ্ট্রটির সীমানা সম্প্রসারিত হতে হতে ধীরে ধীরে পূর্বতন ইয়াহুদিয়া ও ইসরাঈল রাষ্ট্র দুটির আওতাধীন সমগ্র এলাকার ওপর পরিব্যাপ্ত হয়। বরং ফিলিস্তিয়ার একটি বড় অংশও তার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলাইমানের (আ) আমলেও এ এলাকাটি বিজিত হয়নি।

কুরআন মজীদের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো এ ঘটনাবলীর প্রতি ইংগিত করে।

৯. এ দ্বিতীয় বিপর্যয়টি এবং এর ঐতিহাসিক শাস্তির পটভূমি নিম্নরূপ ঃ

মাক্কাবীদের আন্দোলন যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও দীনী প্রেরণা সহকারে শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। নির্ভেজাল বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও অন্তসারশূন্য লৌকিকতা তার স্থান দখল করে। শেষে তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তারা নিজেরাই রোমক বিজেতা পম্পীকে ফিলিস্তীনে আসার জন্য আহবান জানায়। তাই খৃষ্টপূর্ব ৬৩ সনে
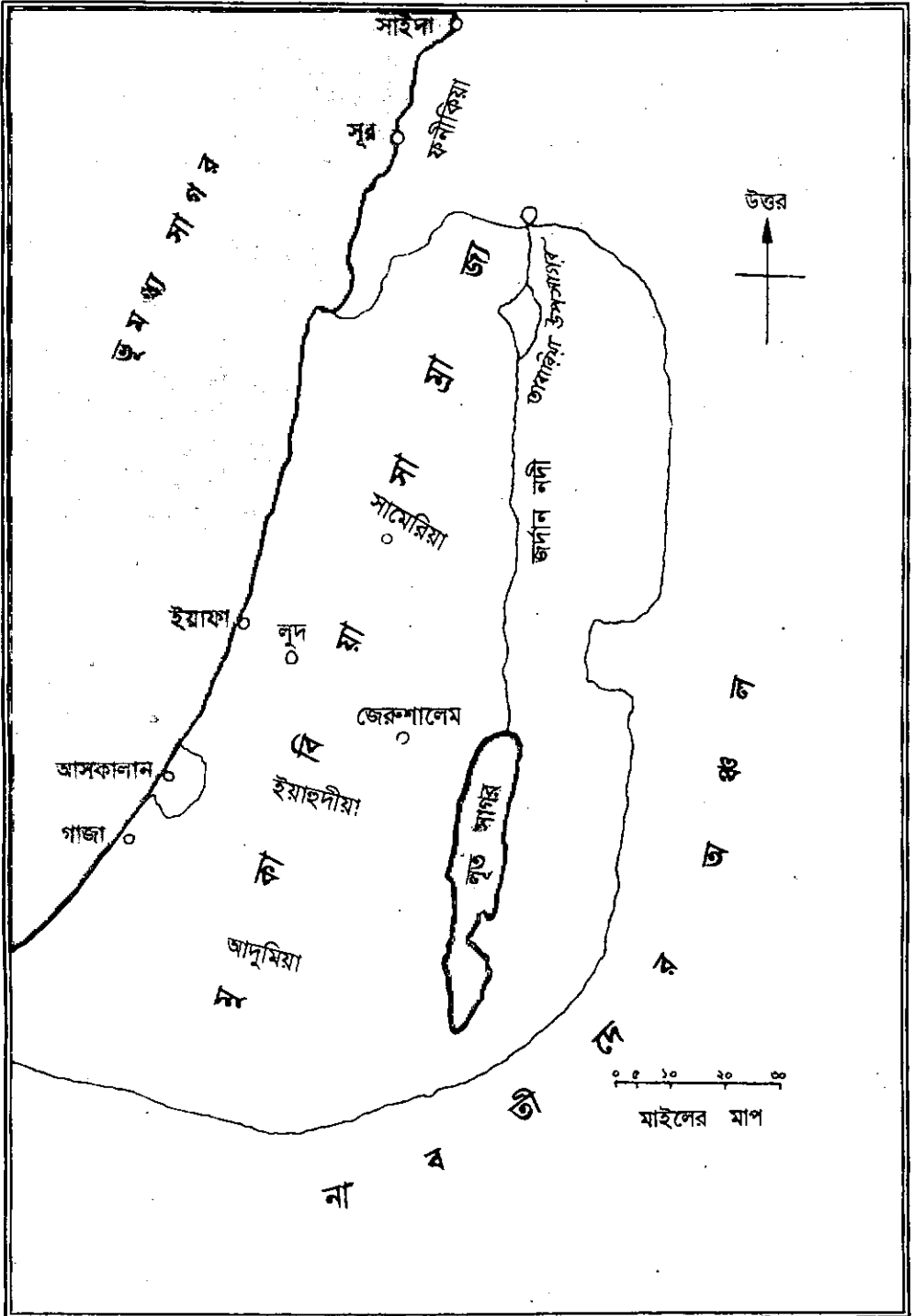
মুকাবিয়া শাসন আমলের ফিলিস্তিন (৯ নং টীকা) (খৃস্টপূর্ব ১৬৮–৬২)

মহান হিরোদ সাম্রাজ্য (খৃষ্টপূর্ব ৪০–৪০)
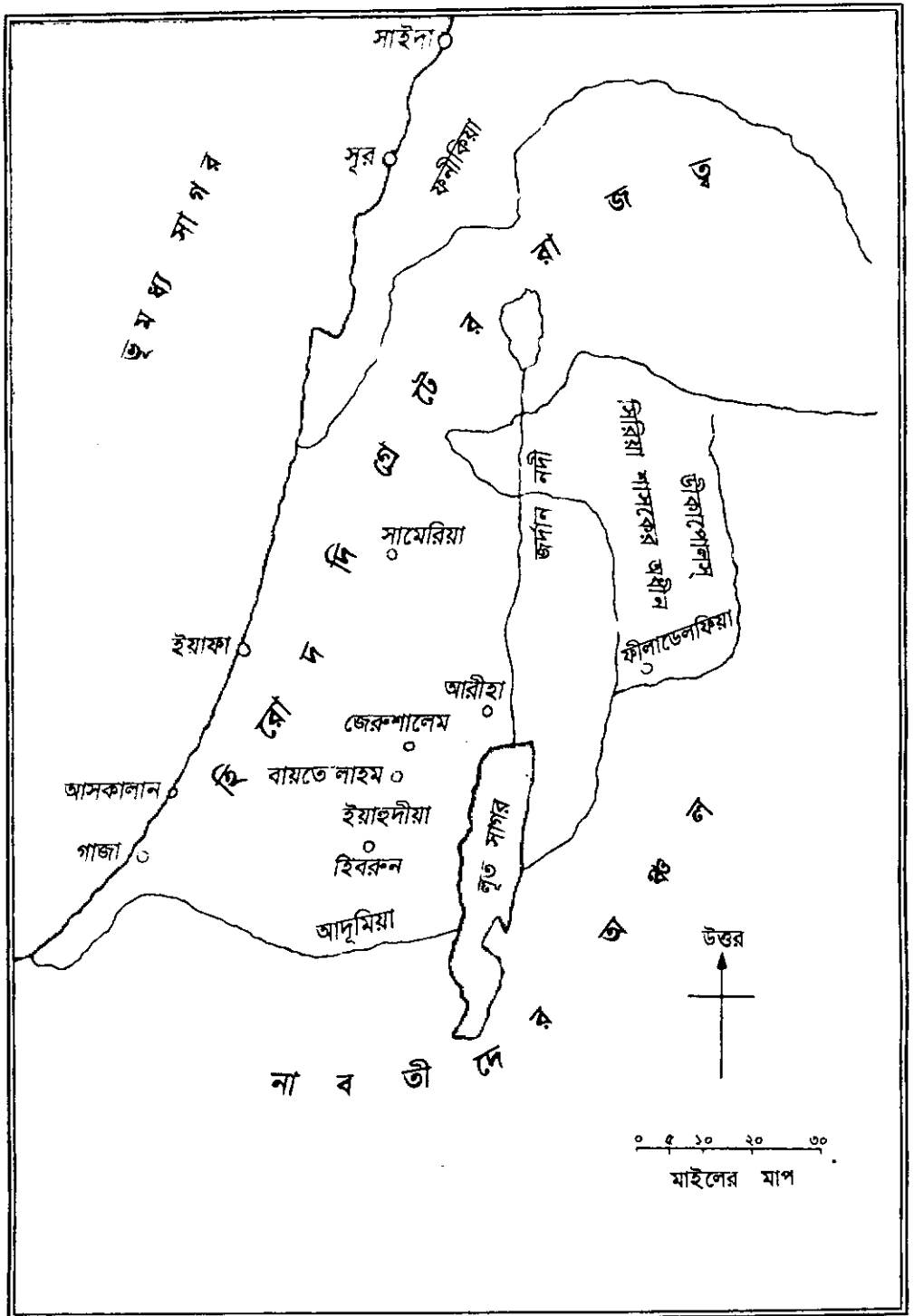
পন্সী এ দেশের দিকে নজর দেয় এবং বায়তুল মাকদিস জয় করে ইহুদীদের স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু রোমীয় বিজেতাদের স্থায়ী নীতি ছিল, তারা বিজিত এলাকায় সরাসরি নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতো না। বরং স্থানীয় শাসকদের সহায়তায় আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনা করে পরোক্ষভাবে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা বেশী পছন্দ করতো। তাই তারা নিজেদের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তীনে একটি দেশীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। খৃঃপূঃ ৪০ সনে এটি হীরোদ নামক এক সুচতুর ইহুদীর কর্তৃত্বাধীন হয়। ইতিহাসে এ ইহুদী শাসক মহান হীরোদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র ফিলিস্তীন ও ট্রান্স জর্দান এলাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪০ থেকে ৪ সন পর্যন্ত তার শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। একদিকে ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সে ইহুদীদেরকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্যদিকে রোমান সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করে রোম সাম্রাজের প্রতি নিজের অত্যধিক বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেশ করে। এভাবে কাইসারের সন্তুষ্টিও অর্জন করে। এ সময় ইহুদীদের দীনী ও নৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে ঘটতে তার একেবারে শেষ সীমানায় পৌঁছে যায়। হীরোদের পর তার রাষ্ট্র তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েঃ

তার এক ছেলে আরখালাউস সামেরীয়া, ইয়াহুদিয়া ও উত্তর উদমিয়ার শাসনকর্তা হয়। কিন্তু ৬ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট আগস্টাস তাকে পদচ্যুত করে তার কর্তৃত্বাধীন সমগ্র এলাকা নিজের গভর্নরের শাসনাধীনে দিয়ে দেয়। ৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই অপরিবর্তিত থাকে। এ সময় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইস্রাঈলের সংস্কারের জন্য নবুওয়াতের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হন। ইহুদীদের সমস্ত ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতরা একজোট হয়ে তাঁর বিরোধিতা করে এবং রোমান গভর্নর পোন্তিসপীলাতিসের সাহায্যে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করার প্রচেষ্টা চালায়।

হীরোদের দ্বিতীয় ছেলে হীরোদ এন্টিপাস উত্তর ফিলিস্তীনের গালীল এলাকা ও ট্রান্স জর্দানের শাসনকর্তা হয়। এ ব্যক্তিই এক নর্তকীর ফরমায়েশে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের শিরশ্ছেদ করে তাকে নযরানা দেয়।

তার তৃতীয় ছেলের নাম ফিলিপ। হারমুন পর্বত থেকে ইয়ারমুক নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তার অধিকারভুক্ত ছিল। এ ব্যক্তি রোমীয় ও গ্রীক সংস্কৃতিতে নিজের বাপ ও ভাইদের তুলনায় অনেক বেশী ডুবে গিয়েছিল। তার এলাকায় কোন ভাল কথার বা ভাল কাজের বিকশিত হবার তেমন সুযোগ ছিল না যেমন ফিলিস্তীনের অন্যান্য এলাকায় ছিল।

মহামতি হীরোদ তাঁর নিজের শাসনামলে যেসব এলাকার ওপর কর্তৃত্ব করতেন ৪১ খৃষ্টাব্দে তার নাতি হীরোদাগ্রীপ্পাকে রোমীয়রা সেসব এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। এ ব্যক্তি শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার পর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর চরম জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দেয়। তাঁর হাওয়ারীগণ আল্লাহভীতি ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তাকে বিধ্বস্ত করার জন্য সে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ সময়ের সাধারণ ইহুদী এবং তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে যেসব ভাষণ দিয়েছেন সেগুলো পাঠ করলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাবে। চার ইনজীলে এ ভাষণগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

হযরত ঈসার (আ) আমলে ফিলিস্তিন
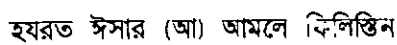
عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾

এখন তোমাদের রব তোমাদের প্রতি করুণা করতে পারেন। কিন্তু যদি তোমরা আবার নিজেদের আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও আবার আমার শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো। আর নিয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি।[১০]

আসলে এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভাল কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুখবর দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখেরাত মানে না তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[১১]

তারপর এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য এ বিষয়টিও যথেষ্ট যে, এ জাতির চোখের সামনে হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালামের মতো পুন্যাত্মাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হলো কিন্তু এ ভয়ংকর জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি আওয়াজও শোনা গেলো না। আবার অন্যদিকে সমগ্র জাতির ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য মৃত্যুদণ্ড দাবী করলো কিন্তু হাতে গোনা গুটিকয় সত্যাশ্রয়ী লোক ছাড়া জাতির এ দুর্ভাগ্যে দুঃখ করার জন্য আর কাউকে পাওয়া গেল না। জাতীয় দুরাবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, পোন্তিসপীলাতিস এ দুর্ভাগ্য পীড়িত লোকদেরকে বললো, আজ তোমাদের ঈদের দিন। প্রচলিত নিয়ম মোতাবিক আজ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের একজনকে মুক্তি দেবার অধিকার আমার আছে। এখন তোমরা বলো, আমি ঈসাকে মুক্তি দেবো, না বারাব্বা ডাকাতকে? সমগ্র জনতা এক কণ্ঠে বললো, বারাব্বা ডাকাতকে মুক্তি দাও। এটা যেন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এ জাতির গোমরাহীর পক্ষে শেষ প্রমাণ পেশ।

এর কিছুদিন পরেই ইহুদী ও রোমানদের মধ্যে কঠিন সংঘাত–সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলো। ৬৪ ও ৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইহুদীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। দ্বিতীয় হীরোদাগ্রিপ্পা ও রোম সম্রাট নিযুক্ত প্রাদেশিক দেওয়ান ফ্লোরাস উভয়ই এ বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হলো। শেষ পর্যন্ত রোম সম্রাট বড় ধরনের সামরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ নির্মূল করলো। ৭০ খৃষ্টাব্দে টীটুস সেনাবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করে জেরুশালেম জয় করলো। এ সময় যে গণহত্যা সংঘটিত হলো তাতে ১ লাখ ৩৩ হাজার লোক মারা

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

মানুষ অকল্যাণ কামনা করে সেভাবে—যেভাবে কল্যাণ কামনা করা উচিত। মানুষ বড়ই দ্রুতকামী।[১২]

দেখো, আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনকে বানিয়েছি আলোহীন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং মাস ও বছরের হিসেব জানতে সক্ষম হও। এভাবে আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে আলাদাভাবে পৃথক করে রেখেছি।[১৩]

গেলো। ৬৭ হাজার লোককে গ্রেফতার করে গোলামে পরিণত করা হলো। হাজার হাজার লোককে পাকড়াও করে মিসরের খনির মধ্যে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। হাজার হাজার লোককে ধরে বিভিন্ন শহরে এম্ফী থিয়েটার ও ক্রুসীমুতে ভিড়িয়ে দেয়া হলো। সেখানে তারা বন্য জন্তুর সাথে লড়াই বা তরবারি যুদ্ধের খেলার শিকার হয়। দীর্ঘাংগী সুন্দরী মেয়েদেরকে বিজেতাদের জন্য নির্বাচিত করে নেয়া হলো। সবশেষে জেরুশালেম নগরী ও হাইকেলকে বিধ্বস্ত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হলো। এরপর ফিলিস্তীন থেকে ইহুদী কর্তৃত্ব ও প্রভাব এমনভাবে নির্মূল হয়ে গেলো যে, পরবর্তী দু'হাজার বছর পর্যন্ত ইহুদীরা আর মাথা উঁচু করার সুযোগ পেলো না। জেরুশালেমের পবিত্র হাইকেলও আর কোনদিন নির্মিত হতে পারেনি। পরবর্তীকালে কাইসার হিড্রিয়ান এ নগরীতে পুনরায় জনবসতি স্থাপন করে কিন্তু তখন এর নাম রাখা হয় ইলিয়া। আর এ ইলিয়া নগরীতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইহুদীদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

দ্বিতীয় মহাবিপর্যয়ের অপরাধে ইহুদীরা এ শাস্তি লাভ করে।

১০. এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, বনী ইস্‌রাঈলদেরকে উদ্দেশ করে এ সমগ্র ভাষণটি দেয়া হয়েছে। সম্বোধন তো করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে। কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এখানে বনী ইস্‌রাঈলদের ইতিহাস থেকে কয়েকটি শিক্ষাপ্রদ সাক্ষ প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল, তাই একটি প্রসংগ কথা হিসেবে বনী ইস্‌রাঈলকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে, যাতে এক বছর পরে মদীনায়

সংস্কারমূলক কার্যাবলী প্রসংগে যেসব ভাষণ দিতে হবে এটি তার ভূমিকা হিসেবে কাজ করতে পারে।

১১. মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি বা দল অথবা জাতি এ কুরআনের উপদেশ ও সতর্কবাণীর পর সঠিক পথে না চলে, বনী ইস্রাঈলরা যে শাস্তি ভোগ করেছিল তাদের সেই একই শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

১২. মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার যে কথাটি বলছিল যে, ঠিক আছে তোমার সেই আযাব আনো যার ভয় তুমি আমাদের দেখিয়ে থাকো, এ বাক্যটি তাদের সেই নির্বুদ্ধিতাসূলভ কথার জবাব। ওপরের বক্তব্যের পর সাথে সাথেই এ উক্তি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া যে, নির্বোধের দল, কল্যাণ চাওয়ার পরিবর্তে আযাব চাচ্ছো? তোমাদের কি এ ব্যাপারে কিছু জানা আছে যে, আল্লাহর আযাব যখন কোন জাতির ওপর নেমে আসে তখন তার দশাটা কী হয়?

এ সংগে এ বাক্যে মুসলমানদের জন্যও একটি সূক্ষ্ম সতর্কবাণী ছিল। মুসলমানরা কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন এবং তাদের হঠকারিতায় বিরক্ত ও ধৈর্যহারা হয়ে কখনো কখনো তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার দোয়া করতে থাকতো। অথচ এখনো এ কাফেরদের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে ঈমান এনে সারা দুনিয়ায় ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করার মতো বহু লোক ছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন, মানুষ বড়ই ধৈর্যহারা প্রমাণিত হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে যে জিনিসের প্রয়োজন অনুভূত হয় মানুষ তাই চেয়ে বসে। অথচ পরে অভিজ্ঞতায় সে নিজেই জানতে পারে যে, সে সময় যদি তার দোয়া কবুল হয়ে যেতো তাহলে তা তার জন্য কল্যাণকর হতো না।

১৩. এর অর্থ হচ্ছে, বিরোধ ও বৈষম্যের কারণে ঘাবড়ে গিয়ে সবকিছু সমান ও একাকার করে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে পড়ো না। এ দুনিয়ার সমগ্র কারখানাটাই তো বিরোধ, বৈষম্য ও বৈচিত্রের ভিত্তিতে চলছে। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তোমাদের সামনে প্রতিদিন এ রাত ও দিনের যাওয়া আসা। দেখো, এদের এ বৈষম্য তোমাদের কত বড় উপকার করছে। যদি তোমরা চিরকাল রাত বা চিরকাল দিনের মধ্যে অবস্থান করতে তাহলে কি এ প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত কাজ কারবার চলতে পারতো? কাজেই যেমন তোমরা দেখছো বস্তু জগতের মধ্যে পার্থক্য, বিরোধ ও বৈচিত্রের সাথে অসংখ্য উপকার ও কল্যাণ জড়িত রয়েছে অনুরূপভাবে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তা-ভাবনা ও মেজাজ-প্রবণতার মধ্যে যে পার্থক্য ও বৈচিত্র পাওয়া যায় তাও বিরাট কল্যাণকর। মহান আল্লাহ তাঁর অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এ পার্থক্য ও বৈষম্য খতম করে সমস্ত মানুষকে জোরপূর্বক মুমিন ও সৎ বানিয়ে দেবেন অথবা কাফের ও ফাসেকদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে দুনিয়ায় শুধুমাত্র মুমিন ও অনুগত বান্দাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন, এর মধ্যে কল্যাণ নেই। এ আশা পোষণ করা ঠিক ততটাই ভুল যতটা ভুল শুধুমাত্র সারাক্ষণ দিনের আলো ফুটে থাকার এবং রাতের আঁধার আদৌ বিস্তার লাভ না করার আশা পোষণ করা। তবে যে জিনিসের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হেদায়াতের আলো যাদের কাছে আছে তারা তাকে নিয়ে গোমরাহীর অন্ধকার দূর করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে এবং যখন রাতের মতো কোন অন্ধকারের যুগ শুরু হয়ে যাবে তখন তারা সূর্যের মতো তার পিছু নেবে যতক্ষণ না উজ্জ্বল দিনের আলো ফুটে বের হয়।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি[১৪] এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি লিখন, যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে পাবে।– পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তিই সৎপথ অবলম্বন করে, তার সৎপথ অবলম্বন তার নিজের জন্যই কল্যাণকর হয়। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, তার পথভ্রষ্টতার ধ্বংসকারিতা তার ওপরই বর্তায়।[১৫] কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।[১৬] আর আমি (হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝাবার জন্য) একজন পয়গম্বর না পাঠিয়ে দেয়া পর্যন্ত কাউকে আযাব দেই না।[১৭]

১৪. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং তার পরিণতির ভাল ও মন্দের কারণগুলো তার আপন সত্তার মধ্যেই বিরাজিত রয়েছে। নিজের গুণাবলী, চরিত্র ও কর্মধারা এবং বাছাই ও নির্বাচন করার এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে সে নিজেই নিজেকে সৌভাগ্যের অধিকারী করে আবার দুর্ভাগ্যেরও অধিকারী করে। নির্বোধ লোকেরা নিজেদের ভাগ্যের ভাল–মন্দের চিহ্নগুলো বাইরে খুঁজে বেড়ায় এবং তারা সব সময় বাইরের কার্যকারণকেই নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাদের ভাল–মন্দের পরোয়ানা তাদের নিজেদের গলায়ই লটকানো থাকে। নিজেদের কার্যক্রমের প্রতি নজর দিলে তারা পরিষ্কার দেখতে পাবে, যে জিনিসটি তাদেরকে বিকৃতি ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে, তা ছিল তাদের নিজেদেরই অসৎ গুণাবলী ও অশুভ সিদ্ধান্ত। বাইর থেকে কোন জিনিস এসে জোর পূর্বক তাদের ওপর চেপে বসেনি।

১৫. অর্থাৎ সৎ ও সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করে কোন ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা সংশোধন প্রচেষ্টা পরিচালনাকারীদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করে না বরং সে তার নিজেরই কল্যাণ করে। অনুরূপভাবে ভুল পথ অবলম্বন করে অথবা তার ওপর অনড় থেকে কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি করে। আল্লাহ, রসূল ও সত্যের আহবায়কগণ মানুষকে ভুল পথ থেকে বাঁচাবার এবং সঠিক পথ দেখাবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালান তা

নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং মানবতার কল্যাণার্থেই চালান। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হচ্ছে, যুক্তি–প্রমাণের মাধ্যমে যখন তার সামনে সত্যের সত্য হওয়া এবং মিথ্যার মিথ্যা হওয়া সুস্পষ্ট করে দেয়া হয় তখন সে স্বার্থান্ধতা ও অন্ধ আত্মপ্রীতি পরিহার করে সোজা মিথ্যা থেকে সরে দাঁড়াবে এবং সত্যকে মেনে নেবে। অন্ধ আত্মপ্রীতি, হিংসা ও স্বার্থান্ধতার আশ্রয় নিলে সে নিজেই নিজের অশুভাকাংখী হবে।

১৬. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ এটি না বুঝা পর্যন্ত মানুষের কার্যধারা কখনো সঠিক নিয়মে চলতে পারে না। এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর সামনে এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার সাথে শরীক নেই। দুনিয়ায় যতই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ, বিপুল সংখ্যক জাতি, গোত্র ও বংশ একটি কাজে বা একটি কর্মপদ্ধতিতে শরীক হোক না কেন, আল্লাহর শেষ আদালতে তাদের এ সমন্বিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত দায়িত্ব আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং তার যাকিছু শাস্তি বা পুরস্কার সে লাভ করবে তা হবে তার সেই কর্মের প্রতিদান, যা করার জন্য সে নিজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়ী বলে প্রমাণিত হবে। এ ইনসাফের তুলাদণ্ডে অন্যের অসৎকর্মের বোঝা একজনের ওপর এবং তার পাপের ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। তাই একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যেরা কি করছে তা দেখা উচিত নয়। বরং তিনি নিজে কি করছেন সেদিকেই তাঁর সর্বক্ষণ দৃষ্টি থাকা উচিত। যদি তার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বের সঠিক অনুভূতি থাকে, তাহলে অন্যেরা যাই করুক না কেন সে নিজে সাফল্যের সাথে আল্লাহর সামনে যে কর্মধারার জবাবদিহি করতে পারবে তার ওপরই অবিচল থাকবে।

১৭. এটি আর একটি মৌলিক সত্য। কুরআন বারবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ সত্যটি মানুষের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহর বিচার ব্যবস্থায় নবী এক অতীব মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। নবী এবং তার নিয়ে আসা কর্মসূচীই বান্দার ওপর আল্লাহর দাবী প্রতিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ। এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হলে বান্দাকে আযাব দেয়া হবে ইনসাফ বিরোধী। কারণ এ অবস্থায় সে এ ওজর পেশ করতে পারবে যে, তাকে তো জানানোই হয়নি কাজেই কিভাবে তাকে এ পাকড়াও করা হচ্ছে! কিন্তু এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর যারা আল্লাহর পাঠানো পয়গাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা তাকে পাওয়ার পর আবার তা থেকে সরে এসেছে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া ইনসাফের দাবী হয়ে দাঁড়াবে। নির্বোধরা এ ধরনের আয়াত পড়ে যাদের কাছে কোন নবীর পয়গাম পৌঁছেনি তাদের অবস্থান কোথায় হবে, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অথচ একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত, তার নিজের কাছে তো পয়গাম পৌঁছে গেছে, এখন তার অবস্থা কি হবে? আর অন্যের ব্যাপারে বলা যায়, কার কাছে, কবে, কিভাবে এবং কি পরিমাণ আল্লাহর পয়গাম পৌঁছেছে এবং সে তার সাথে কি আচরণ করেছে এবং কেন করেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আলেমুল গায়েব ছাড়া কেউ বলতে পারেন না কার ওপর আল্লাহর প্রমাণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কার ওপর হয়নি।

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ
عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ
نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ مَّن كَانَ
يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ
يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾

যখন আমি কোন জনবসতিকে ধ্বংস করার সংকল্প করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ দিয়ে থাকি, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে আর তখন আযাবের ফায়সালা সেই জনবসতির ওপর বলবত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে দেই।[১৮] দেখো, কত মানব গোষ্ঠী নূহের পরে আমার হুকুমে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমার রব নিজের বান্দাদের গুনাহ সম্পর্কে পুরোপুরি জানেন এবং তিনি সবকিছু দেখছেন।

যে কেউ আশু লাভের[১৯] আকাংখা করে, তাকে আমি এখানেই যাকিছু দিতে চাই দিয়ে দেই, তারপর তার ভাগে জাহান্নাম লিখে দেই, যার উত্তাপ সে ভুগবে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে।[২০]

১৮. এ আয়াতে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতিগত নির্দেশ ও প্রাকৃতিক বিধান। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার সমৃদ্ধিশালী লোকেরা ফাসেক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার সংকল্প মানে এ নয় যে, আল্লাহ এমনিতেই বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার সংকল্প করে নেন, বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে।

মূলত এ আয়াতে যে সত্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, একটি সমাজের সচ্ছল, সম্পদশালী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিকৃতিই শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে। যখন কোন জাতির ধ্বংস আসার সময় হয় তখন তার ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী লোকেরা ফাসেকী ও নৈতিকতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা জুলুম-নির্যাতন ও দুষ্কর্ম-ব্যভিচারে গা ভাসিয়ে দেয়। আর শেষ পর্যন্ত এ বিপর্যয়টি সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করে। কাজেই যে সমাজ নিজেই নিজের ধ্বংসকামী নয় তার ক্ষমতার লাগাম এবং

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾

আর যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রত্যাশী হয় এবং সে জন্য প্রচেষ্টা চালায়, যেমন সে জন্য প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং সে হয় মুমিন, এ ক্ষেত্রে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রচেষ্টার যথোচিত মর্যাদা দেয়া হবে।[২১] এদেরকেও এবং ওদেরকেও, দু'দলকেই আমি (দুনিয়ায়) জীবন উপকরণ দিয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে তোমার রবের দান এবং তোমার রবের দান রুখে দেবার কেউ নেই।[২২] কিন্তু দেখো, দুনিয়াতেই আমি একটি দলকে অন্য একটির ওপর কেমন শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছি এবং আখেরাতে তার মর্যাদা আরো অনেক বেশী হবে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বও আরো অধিক হবে।[২৩]

আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কাউকে মাবুদে পরিণত করো না।[২৪] অন্যথায় নিন্দিত ও অসহায়–বান্ধব হারা হয়ে পড়বে।

অর্থনৈতিক সম্পদের চাবিকাঠি যাতে নীচ ও হীনমনা এবং দুশ্চরিত্র ধনীদের হাতে চলে না যায় সেদিকে নজর রাখা উচিত।

১৯. আশু লাভের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, যে জিনিস দ্রুত পাওয়া যায়। কুরআন মজীদ একে পারিভাষিক অর্থে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করেছে, অর্থাৎ যার লাভ ও ফলাফল এ দুনিয়ার জীবনেই পাওয়া যায়। এর বিপরীতার্থক পরিভাষা হচ্ছে "আখেরাত", যার লাভ ও ফলাফল মৃত্যু পরবর্তী জীবন পর্যন্ত বিলম্বিত করা হয়েছে।

২০. এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে না অথবা আখেরাত পর্যন্ত সবর করতে প্রস্তুত নয় এবং শুধুমাত্র দুনিয়া এবং দুনিয়াবী সাফল্য ও সমৃদ্ধিকেই নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, সে যা কিছু পাবে এ দুনিয়াতেই পাবে। আখেরাতে সে কিছুই পেতে পারে না। আর শুধু যে আখেরাতে সে সমৃদ্ধি লাভ করবে না, তা নয়। বরং দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখেরাতে জবাবদিহির দায়িত্বের ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব তার কর্মধারাকে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবে, যার ফলে সে উল্‌টা জাহান্নামের অধিকারী হবে।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

৩ রুকূ'

তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন ঃ[২৫]

১) তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।[২৬]

২) পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ্" পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের রব খুব ভাল করেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।[২৭]

২১. অর্থাৎ তার কাজের কদর করা হবে। যেভাবে যতটুকুন প্রচেষ্টা সে আখেরাতের কামিয়াবীর জন্য করে থাকবে তার ফল সে অবশ্যই পাবে।

২২. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবিকা ও জীবন উপকরণ দুনিয়াদাররাও পাচ্ছে এবং আখেরাতের প্রত্যাশীরাও পাচ্ছে। এসব অন্য কেউ নয়, আল্লাহই দান করছেন। আখেরাতের প্রত্যাশীদেরকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা দুনিয়া পূজারীদের নেই এবং দুনিয়া পূজারীদের কাছে আল্লাহর নিয়ামত পৌছার পথে বাধা দেবার ক্ষমতা আখেরাত প্রত্যাশীদেরও নেই।

২৩. অর্থাৎ আখেরাত প্রত্যাশীরা যে দুনিয়া পূজারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী দুনিয়াতেই এ পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ পার্থক্য এ দৃষ্টিতে নয় যে, এদের

খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি-বাড়ি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ঠাটবাট ও জৌলুস ওদের চেয়ে বেশী। বরং পার্থক্যটা এখানে যে, এরা যাকিছু পায় সততা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথে পায় আর ওরা যাকিছু লাভ করে জুলুম, নিপীড়ন, ধোঁকা, বেঈমানী এবং নানান হারাম পথ অবলম্বনের কারণে লাভ করে। তার ওপর আবার এরা যাকিছু পায় ভারসাম্যের সাথে খরচ হয়। এ থেকে হকদারদের হক আদায় হয়। এ থেকে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অংশও দেয়া হয়। আবার এ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে অন্যান্য সৎ-কাজেও অর্থ ব্যয় করা হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়া পূজারীরা যাকিছু পায় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিলাসিতা, বিভিন্ন হারাম এবং নানান ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজে দু' হাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। এভাবে সব দিক দিয়েই আখেরাত প্রত্যাশীদের জীবন আল্লাহভীতি ও পরিচ্ছন্ন নৈতিকতার এমন আদর্শ হয়ে থাকে, যা তালি দেয়া কাপড়ে এবং ঘাস ও খড়ের তৈরী কুঁড়ে ঘরেও এমনই ঔজ্জ্বল্য বিকীরণ করে, যার ফলে এর মোকাবিলায় প্রত্যেক চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিতে দুনিয়া পূজারীদের জীবন অন্ধকার মনে হয়। এ কারণেই বড় বড় পরাক্রমশালী বাদশাহ ও ধনাঢ্য আমীরদের জন্যও তাদের সমগোত্রীয় জনগণের হৃদয়ে কখনো নিখাদ ও সাচ্চা মর্যাদাবোধ এবং ভালবাসা ও ভক্তির ভাব জাগেনি। অথচ এর বিপরীতে অভুক্ত, অনাহারী ছিন্ন বস্ত্রধারী, খেজুর পাতার তৈরী কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী আল্লাহ ভীরু মর্দে দরবেশের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে দুনিয়া পূজারীরা নিজেরাই বাধ্য হয়েছে। আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য এ দু' দলের মধ্যে কার ভাগে আসবে এ সুস্পষ্ট আলামতগুলো সেই সত্যটির প্রতি পরিষ্কার ইংগিত করছে।

২৪. এ বাক্যাংশটির অন্য একটি অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ তৈরী করে নিয়ো না অথবা অন্য কাউকে ইলাহ গণ্য করো না।

২৫. এখানে এমন সব বড় বড় মূলনীতি পেশ করা হয়েছে যার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থার ইমারত গড়ে তুলতে চায়। একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের ঘোষণাপত্র বলা যায়। মক্কী যুগের শেষে এবং আসন্ন মাদানী যুগের প্রারম্ভ লগ্নে এ ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়। এভাবে এ নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোন্ ধরনের চিন্তামূলক, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত মূলনীতির ওপর রাখা হবে তা সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। এ প্রসংগে সূরা আন'আমের ১৯ রুকূ' এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকার ওপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভাল হয়।

২৬. এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো পূজা-উপাসনা করো না বরং এ সংগে এর অর্থ হচ্ছে, বন্দেগী, গোলামী ও দ্বিধাহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই করতে হবে। একমাত্র তাঁরই হুকুমকে হুকুম এবং তাঁরই আইনকে আইন বলে মেনে নাও এবং তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করো না। এটি কেবলমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত কর্মধারার জন্য একটি পথনির্দেশনাই নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তাইয়েবায় পৌঁছে কার্যত যে রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এটি হচ্ছে সেই সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তরও। এ ইমারতের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল এ মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহই সমগ্র বিশ্বলোকের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁরই শরীয়াত এ রাজ্যের আইন।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

৩) আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।

৪) বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

৫) যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয়–স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, এখনো তুমি আল্লাহর প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।[২৮]

২৭. এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহর পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হক ও অগ্রাধিকার হচ্ছে পিতামাতার। সন্তানকে পিতামাতার অনুগত, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদাবোধ সম্পন্ন হতে হবে। সমাজের সামষ্টিক নৈতিক বৃত্তি এমন পর্যায়ের হতে হবে, যার ফলে সন্তানরা বাপমায়ের মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়বে না, বরং তারা নিজেদেরকে বাপমায়ের অনুগৃহীত মনে করবে এবং বুড়ো বয়সে তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে বাপমায়ের খিদমত করা শেখাবে যেমনিভাবে বাপমা শিশুকালে তাদের পরিচর্যা ও লালন পালন এবং মান–অভিমান বরদাশ্‌ত করে এসেছে। এ আয়াতটিও নিছক একটি নৈতিক সুপারিশ নয় বরং এরি ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে বাপমায়ের জন্য এমনসব শরয়ী অধিকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তাছাড়া ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বাপমায়ের প্রতি আচরণ ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। এ জিনিসগুলো চিরকালের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিজের আইন কানুন, ব্যবস্থাপনামূলক বিধান ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, দুর্বল করবে না।

২৮. এ তিনটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন–দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবে না বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয়–স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

৬) নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।[২৯] তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।[৩০]

অধিকারও আদায় করবে। সমাজ জীবনে সাহায্য–সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং অন্যের অধিকার জানা ও তা আদায় করার প্রবণতা সক্রিয় ও সঞ্চারিত থাকবে। প্রত্যেক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাহায্যকারী এবং প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের আশপাশের অভাবী মানুষদের সাহায্যকারী হবে। একজন মুসাফির যে জনপদেই যাবে নিজেকে অতিথি বৎসল লোকদের মধ্যেই দেখতে পাবে। সমাজে অধিকারের ধারণা এত বেশী ব্যাপক হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের মধ্যে অবস্থান করে নিজের ব্যক্তি–সত্তা ও ধন–সম্পদের ওপর তাদের সবার অধিকার অনুভব করবে। তাদের খিদমত করার সময় এ ধারণা নিয়েই খিদমত করবে যে, সে তাদের অধিকার আদায় করছে, তাদেরকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করছে না। কারোর খিদমত করতে অক্ষম হলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহর বান্দাদের খিদমত করার যোগ্যতা লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে।

ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাগুলোও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার শিক্ষাই ছিল না বরং পরবর্তী সময়ে মদীনা তাইয়েবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এগুলোর ভিত্তিতেই ওয়াজিব ও নফল সাদ্‌কার বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়, অসিয়ত, মীরাস ও ওয়াকফের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, এতিমের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক জনবসতির ওপর মুসাফিরের কমপক্ষে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং এ সংগে সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কার্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যার ফলে সমগ্র সামাজিক পরিবেশে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত হয়ে যায়। এমনকি লোকরা স্বতস্ফূর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ দেয়া ছাড়াও আইনের জোরে যেসব নৈতিক অধিকার চাওয়া ও প্রদান করা যায় না সেগুলোও উপলব্ধি ও আদায় করতে থাকে।

২৯. "হাত বাঁধা" একটি রূপককথা। কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর "হাত খোলা ছেড়ে দেয়া'র মানে হচ্ছে, বাজে খরচ করা। ৪র্থ ধারার সাথে ৬ষ্ঠ ধারাটির এ বাক্যোংশটি মিলিয়ে পড়লে এর পরিষ্কার অর্থ এই মনে হয় যে, লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী

হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন–সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে নিজেদের ধন–দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।

এ ধারাগুলোও নিছক নৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত হেদায়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এদিকে পরিষ্কার ইংগিত করছে যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাধা–নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। এ কারণেই পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতিতে এ উভয় ধারা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইনগতভাবে হারাম করা হয়। দ্বিতীয়ত পরোক্ষভাবে আইনগত কৌশল অবলম্বন করে অযথা অর্থব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়। তৃতীয়ত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে এমন বহু রসম–রেওয়াজের বিলোপ সাধন করা হয় যেগুলোতে অপব্যয় করা হতো। তারপর রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। এভাবে যাকাত ও সাদকার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অর্থের আবর্তনের পথ বন্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনাও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করার সাথে সাথে সমাজে এমন একটি সাধারণ জনমত সৃষ্টি করা হয়, যা দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে জানতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়ের মধ্যে ভালভাবেই ফারাক করতে পারতো। এ জনমত কৃপণদেরকে লাঞ্ছিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদেরকে মর্যাদাশালী করে, অপব্যয়কারীদের নিন্দা করে এবং দানশীলদেরকে সমগ্র সমাজের খোশ্‌বুদার ফুল হিসেবে কদর করে। সে সময়ের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব আজো মুসলিম সমাজে রয়েছে। আজো দুনিয়ার সব দেশেই মুসলমানরা কৃপণ ও সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দানশীলরা আজো তাদের চোখে সম্মানার্হ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

৩০. অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই রিযিক বন্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যকে প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বেইনসাফীর সীমানায় পৌছিয়ে দেয়া উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ নির্ধারিত রিযিক বন্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।

এ বাক্যে প্রাকৃতিক আইনের যে নিয়মটির দিকে পথনির্দেশ করা হয়েছিল তার কারণে মদীনার সংস্কার কর্মসূচীতে এ ধারণাটি আদতে কোন ঠাঁই করে নিতে পারেনি যে, রিযিক ও রিযিকের উপায়–উপকরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আসলে এমন কোন

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

৪ রুকূ'

৭) দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।[৩১]

৮) যিনার কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।[৩২]

অকল্যাণকর বিষয় নয়, যাকে বিলুপ্ত করা এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা কোন পর্যায়ে কাংখিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীলতা ও সদাচারের ভিত্তিতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মদীনা তাইয়েবায় এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সে কর্মপদ্ধতি ছিল এই যে, আল্লাহর প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য করে রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, আচার-আচরণ ও কর্মবিধানসমূহ এমনভাবে সংশোধন করে দিতে হবে, যার ফলে জীবিকার পার্থক্য ও ব্যবধান কোন জুলুম ও বেইনসাফির বাহনে পরিণত হবার পরিবর্তে এমন অসংখ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহনে পরিণত হবে, যে জন্য মূলত বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন।

৩১. যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্র্য ভীতি শিশু হত্যা ও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তম ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌঁছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহর আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

৯) আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন,[৩৩] সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৩৪] আর যে ব্যক্তি মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি।[৩৫] কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়,[৩৬] তাকে সাহায্য করা হবে।[৩৭]

তিনি যেভাবে রুজি দিয়ে এসেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও দেবেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও একথাই বলে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নাযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন যুগে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোন ব্যাপক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।

৩২. "যিনার কাছেও যেয়ো না" এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের মানে হচ্ছে, সে নিছক যিনার কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবে না বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে। আর সমাজের ব্যাপারে বলা যায়, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে যিনা, যিনার উদ্যোগ–আকর্ষণ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া সমাজের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধন, সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৃহত্তম অধ্যায়ের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এর অভিপ্রায় অনুযায়ী যিনা ও যিনার অপবাদকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করা হয়। পর্দার বিধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছবির (যা যিনার নিকটতম আত্মীয়) ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর এ সংগে এমন একটি দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বিবাহ সহজ হয়ে যায় এবং যিনার সামাজিক কারণসমূহের শিকড় কেটে যায়।

৩৩. "যাকে হত্যা" মানে কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করাই নয়, নিজেকে হত্যা করাও এর অন্তরভুক্ত। কারণ মানুষকে মহান আল্লাহ মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। অন্যের

প্রাণের সাথে সাথে মানুষের নিজের প্রাণও এ সংজ্ঞার অন্তরভুক্ত। কাজেই মানুষ হত্যা যত বড় গুনাহ ও অপরাধ, আত্মহত্যা করাও ঠিক তত বড় অপরাধ ও গুনাহ। মানুষ নিজেকে নিজের প্রাণের মালিক এবং এ মালিকানাকে নিজ ক্ষমতায় খতম করে দেবার অধিকার রাখে বলে মনে করে, এটা তার একটা বিরাট ভুল ধারণা। অথচ তার এ প্রাণ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং সে একে খতম করে দেয়া তো দূরের কথা একে কোন অনুপযোগী কাজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখে না। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগৃহে আল্লাহ যেভাবেই আমাদের পরীক্ষা নেন না কেন, পরীক্ষার অবস্থা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সেভাবেই শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা দিতে থাকা উচিত। আল্লাহর দেয়া সময়কে ইচ্ছা করে খতম করে দিয়ে পরীক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এ পালিয়ে যাবার কাজটিও এমন এক অপরাধের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাকে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম গণ্য করেছেন, এটা তো কোনক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না। অন্য কথায় বলা যায়, দুনিয়ার ছোট ছোট কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানুষ বৃহত্তর ও চিরন্তন কষ্ট ও লাঞ্ছনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

৩৪. পরবর্তীকালে ইসলামী আইন 'সত্য সহকারে হত্যা'কে শুধুমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এক, জেনে বুঝে হত্যাকারী থেকে কিসাস নেয়া। দুই, আল্লাহর সত্যদীনের পথে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তিন, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার প্রচেষ্টাকারীদের শাস্তি দেয়া, চার, বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি দেয়া। পাঁচ, মুরতাদকে শাস্তি দেয়া। শুধুমাত্র এ পাঁচটি ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তিরোহিত হয় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য হয়।

৩৫. মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামী আইনের এ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকদ্দমার আসল বাদী সরকার নয়। বরং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে।

৩৬. হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই নিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা। অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের ওপর মনের ঝাল মেটানো। অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।

৩৭. যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই কে তাকে সাহায্য করবে, একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ফায়সালা করে দেয়া হয় যে, তাকে সাহায্য করা তার গোত্র বা সহযোগী বন্ধু দলের কাজ নয় বরং এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার বিচার ব্যবস্থার কাজ। কোন ব্যক্তি বা দল নিজস্বভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেবার অধিকার রাখে না। বরং এটা ইসলামী সরকারের দায়িত্ব। ন্যায় বিচার লাভ করার জন্য তার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ
فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

১০) এতীমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়ো না, তবে হ্যাঁ সদুপায়ে, যে পর্যন্ত না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়।[৩৮]

১১) প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।[৩৯]

১২) মেপে দেবার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো।[৪০] *এটিই ভাল পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।*[৪১]

১৩) এমন কোন জিনিসের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দিল্ সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৪২]

১৪) যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে। ৪৩

৩৮. এটিও নিছক একটি নৈতিক নির্দেশনামা ছিল না। বরং পরবর্তীকালে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য প্রশাসনিক ও আইনগত উভয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীস ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তারপর এখান থেকে এ ব্যাপক ভিত্তিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক নিজেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে না রাষ্ট্রই তাদের স্বার্থের সংরক্ষক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ أَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (যার কোন অভিভাবক নেই আমিই তার অভিভাবক) এ হাদীসটি এদিকেই ইংগিত করে এবং এ ইসলামী আইন একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের ভূমিকা রচনা করে।

৩৯. এটিও নিছক ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিল না। বরং যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একেই সমগ্র জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতর ভিত্তি প্রস্তর গণ্য করা হয়।

৪০. এ নির্দেশটাও নিছক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাট, বাজার ও দোকানগুলোতে মাপজোক ও দাঁড়িপাল্লাগুলো তত্ত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওজনে ও মাপে কম দেয়া বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। তারপর এখান থেকেই এ ব্যাপক মূলনীতি গৃহীত হয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকমের বেঈমানী ও অধিকার হরণের পথ রোধ করা সরকারের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই। দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু'জনের ওপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির ওপর।

৪২. এ ধারাটির অর্থ হচ্ছে, লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে "জ্ঞানের" পেছনে চলবে। ইসলামী সমাজে এ ধারাটির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে নৈতিক ব্যবস্থায়, আইনে, রাজনীতিতে, দেশ শাসনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা জীবনের সকল বিভাগে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চলার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুষ্ট মতের সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তা ও কর্মকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কুধারণা থেকে দূরে থাকো এবং কোন ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই কোন দোষারোপ করো না। আইনের ক্ষেত্রে এ মর্মে একটি স্থায়ী মূলনীতিই স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, নিছক সন্দেহ বশত কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে নীতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার, মারধর বা জেলে আটক করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজাতিদের সাথে আচার আচরণের ক্ষেত্রে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারোর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন গুজব ছড়ানোও যাবে না। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যেসব তথাকথিত জ্ঞান নিছক আন্দাজ-অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রীতাময় ধারণা ও কল্পনা নির্ভর, সেগুলোকেও অপছন্দ করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা, কল্পনা ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রসূল প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় মেনে নেবার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৪৩. এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীদের মতো আচরণ করো না। এ নির্দেশটিও ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় আচরণ উভয়ের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নির্দেশের বদৌলতেই এ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মদীনা তাইয়েবায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার শাসকবৃন্দ, গবর্নর ও সিপাহসালারদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়।[৪৪] তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুনো তার অন্তরভুক্ত।

আর দেখো, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ স্থির করে নিয়ো না, অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে নিন্দিত এবং সব রকমের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।[৪৫]—কেমন অদ্ভুত কথা, তোমাদের রব তোমাদের পুত্র সন্তান দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশ্‌তাদেরকে কন্যা সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন?[৪৬] এটা ভয়ানক মিথ্যা কথা, যা তোমরা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করছো।

ছিঁটেফোটাও ছিল না। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দম্ভ ও অহংকারের কোন কথাই বের হতো না। তাদের ওঠা বসা, চাল চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, সওয়ারী ও সাধারণ আচার-আচরণে নম্রতা ও কোমলতা বরং ফকিরী ও দরবেশীর ছাপ স্পষ্ট দেখা যেতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না।

৪৪. অর্থাৎ এগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোই নিষিদ্ধ সেগুলো করা আল্লাহ অপছন্দ করেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দনীয় কাজ।

৪৫. আপাতদৃষ্টে এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের অবস্থায় মহান আল্লাহ নিজের নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলেন তা আসলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলা হয়।

৪৬. ব্যাখ্যার জন্য সূরা নাহ্‌লের ৫৭ থেকে ৫৯ পর্যন্ত আয়াতগুলো টীকাসহকারে দেখুন।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

আমি এ কুরআনে নানাভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি যেন তারা সজাগ হয়, কিন্তু তারা সত্য থেকে আরো বেশী দূরে সরে যাচ্ছে। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো।[৪৭] পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যেসব কথা বলছে তিনি তার অনেক উর্ধে। তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব জিনিসই।[৪৮] এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না,[৪৯] কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন বুঝতে পারো না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।[৫০]

৪৭. অর্থাৎ সে নিজেই আরশের মালিক হবার চেষ্টা করতো। কারণ অনেকগুলো সত্তা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরীক হলে সেখানে অনিবার্যভাবে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হবে। এক, তারা সবাই হবে প্রত্যেকের জায়গায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইলাহ। দুই, তাদের একজন হবে আসল ইলাহ আর বাদবাকি সবাই হবে তার বান্দা এবং সে তাদেরকে নিজের প্রভুত্ব কর্তৃত্বের কিছু কিছু অংশ সোপর্দ করবে। প্রথম অবস্থাটিতে কোনক্রমেই এসব স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ইলাহর পক্ষে সবসময় সব ব্যাপারে পরস্পরের ইচ্ছা ও সংকল্পের প্রতি আনুকূল্য বজায় রেখে এ অনন্ত অসীম বিশ্বলোকের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা এতো পরিপূর্ণ ঐক্য, সামঞ্জস্য, সমতা ও ভারসাম্য সহকারে পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের পরিকল্পনা ও সংকল্পের প্রতি পদে পদেই সংঘর্ষ বাধা ছিল অনিবার্য। প্রত্যেকেই যখন দেখতো অন্য ইলাহদের সাথে আনুকূল্য ছাড়া তার প্রভুত্ব চলছে না তখন সে একাই সমগ্র বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক হয়ে যাবার চেষ্টা করতো। আর দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, বান্দার সত্তা প্রভুত্বের ক্ষমতা তো দূরের কথা প্রভুত্বের সামান্যতম ভাবকল্প ও স্পর্শ-গন্ধ ধারণ করার ক্ষমতাও রাখে না। য । কোথাও কোন সৃষ্টির দিকে

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ

যখন তুমি কুরআন পড়ো তখন আমি তোমার ও যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেই এবং তাদের মনের ওপর এমন আবরণ চড়িয়ে দেই যেন তারা কিছুই বুঝে না এবং তাদের কানে তালা লাগিয়ে দেই।[৫১]

সামান্যতম প্রভুত্ব কর্তৃত্ব স্থানান্তরিত করে দেয়া হতো তাহলে তার পায়া ভারি হয়ে যেতো, আর সামান্য ক্ষণের জন্যও সে বান্দা হয়ে থাকতে রাজী হতো না এবং তখনি সে বিশ্বজাহানের ইলাহ হয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দিতো।

যে বিশ্বজাহানে পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত শক্তি মিলে একসাথে কাজ না করলে গমের একটি দানা এবং ঘাসের একটি পাতা পর্যন্তও উৎপন্ন হতে পারে না তার সম্পর্কে শুধুমাত্র একজন নিরেট মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকই একথা চিন্তা করতে পারে যে, একাধিক স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন ইলাহ তার শাসন কার্য পরিচালনা করছে। অন্যথায় যে ব্যক্তিই এ ব্যবস্থার মেজাজ ও প্রকৃতি বুঝবার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করেছে সে এ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে থাকতে পারে না যে, এখানে শুধুমাত্র একজনেরই প্রভুত্ব চলছে এবং তাঁর সাথে অন্য কারোর কোন পর্যায়েই কোন প্রকারের শরীক হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই।

৪৮. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজাহান এবং তার প্রত্যেকটি জিনিস নিজের সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে এ সত্যের পক্ষে সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, যিনি তাকে পয়দা করেছেন এবং তার লালন পালন ও দেখাশুনা করছেন, তাঁর সত্তা সব রকমের দোষ–ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তাঁর সাথে শরীক ও সহযোগী নয়।

৪৯. প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার মানে হচ্ছে, প্রত্যেকটি জিনিস কেবলমাত্র নিজের রবের দোষ–ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত থাকার কথা প্রকাশই করছে না বরং এই সংগে তাঁর যাবতীয় গুণে গুণান্বিত ও যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী হবার কথাও বর্ণনা করছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার পরিপূর্ণ অস্তিত্বের মাধ্যমে একথা বর্ণনা করছে যে, তার স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক এমন এক সত্তা, যিনি সমস্ত মহৎ গুণাবলীর সর্বোচ্চ ও পূর্ণতম অবস্থার অধিকারী এবং প্রশংসা যদি থাকে তাহলে একমাত্র তাঁরই জন্য আছে।

৫০. অর্থাৎ তোমরা তাঁর সামনে অনবরত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে যাচ্ছো এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চলছো, এরপরও তিনি ক্ষমা করে চলছেন, রিযিক বন্ধ করছেন না, নিজের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিতও করছেন না এবং প্রত্যেক ঔদ্ধত্যকারীকে

সংগে সংগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে মৃত্যুদণ্ডও দিচ্ছেন না। এসবই তাঁর সহিষ্ণুতা ও অপরূপ ক্ষমাশীলতারই নিদর্শন। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিকেও এবং জাতিকেও বুঝবার ও ভুল সংশোধন করার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দিচ্ছেন। তাদেরকে উপদেশ ও সঠিক পথনির্দেশনা দেবার জন্য নবী, সংস্কারক ও প্রচারক পাঠিয়ে চলছেন অনবরত। যে ব্যক্তিই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সোজা পথ অবলম্বন করে তার অতীতের সমস্ত ভুল–ভ্রান্তি মাফ করে দেন।

৫১. অর্থাৎ আখেরাতের প্রতি ঈমান না আনার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে মানুষের মনের দরজায় তালা লেগে যায় এবং কুরআন যে দাওয়াত পেশ করে তার কানে তা প্রবেশ করে না। কুরআনের দাওয়াতের মূল কথাই তো হচ্ছে এই যে, দুনিয়াবী জীবনের বাইরের দিকটি দেখে প্রতারিত হয়ো না। এখানে কোন হিসেব ও জবাব গ্রহণকারীর অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর না হলেও একথা মনে করো না যে, তোমাকে কারোর সামনে নিজের দায়িত্বপালনের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে না। এখানে যদি কুফরী, শির্ক, নাস্তিক্যবাদ, তাওহীদ ইত্যাদি সবরকমের মতবাদ স্বাধীনভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এর ফলে পার্থিব দৃষ্টিতে কোন বিশেষ ফারাক দেখা দেয় না বলে মনে হয়, তাহলে একথা মনে করো না যে, তাদের কোন আলাদা ও স্থায়ী ফলাফলই নেই। এখানে যদি ফাসেকী ও অনাচারমূলক এবং আনুগত্য ও তাকওয়ার সবরকম কর্মনীতি অবলম্বন করা যেতে পারে এবং বাস্তবে এদের মধ্য থেকে কোন একটি কর্মনীতির কোন অনিবার্য ফল দেখা না দেয়, তাহলেও একথা মনে করো না যে, আদতে কোন কার্যকর ও অপরিবর্তনশীল নৈতিক আইন নেই। আসলে হিসেব নেয়া ও জবাবদিহি করা সবকিছুই হবে কিন্তু তা হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। একমাত্র তাওহীদের মতবাদ সত্য ও স্থায়ীত্ব লাভকারী এবং বাদবাকি সব মতবাদই বাতিল। কিন্তু তাদের আসল ও চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এবং এ বাহ্যিক পর্দার পেছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা সেখানে প্রকাশিত হবে। একটি অনড় ও অপরিবর্তনশীল নৈতিক আইন নিশ্চয়ই আছে যার দৃষ্টিতে পাপাচার মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আল্লাহর আনুগত্য লাভজনক। কিন্তু সেই আইন অনুযায়ী শেষ ও চূড়ান্ত ফায়সালাও হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে। কাজেই তোমরা দুনিয়ার এ সাময়িক জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে যেয়ো না এবং এর সন্দেহপূর্ণ ফলাফলের ওপর নির্ভর করো না। বরং সবশেষে নিজেদের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন রবের সামনে তোমাদের যে জবাবদিহি করতে হবে সেদিকে নজর রাখো এবং যে সঠিক আকীদাগত ও নৈতিক দৃষ্টিভংগী তোমাদের আখেরাতের পরীক্ষায় সফলকাম করবে তা অবলম্বন করো।—এ হচ্ছে কুরআনের দাওয়াত। এখন যে ব্যক্তি আদৌ আখেরাতকেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয় এবং এ দুনিয়ার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ যাবতীয় বস্তু বিষয়ের মধ্যেই যার সমস্ত আস্থা ও বিশ্বাস সীমাবদ্ধ, সে কখনো কুরআনের এ দাওয়াতকে বিবেচনাযোগ্য মনে করতে পারে না। এ আওয়াজ হামেশা তার কানের পর্দায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে, কখনো মনোরাজ্যে প্রবেশ করার পথ পাবে না। এটি একটি মনস্তাত্বিক সত্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মনস্তাত্বিক সত্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি আখেরাত মানে না আমি তার অন্তর ও কান কুরআনের দাওয়াতের জন্য বন্ধ করে দিই। অর্থাৎ এটি আমার প্রাকৃতিক আইন। আখেরাত অস্বীকারকারীর ওপর এ আইনটি এভাবে প্রবর্তিত হয়।

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٦﴾
نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ
نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٤٧﴾
اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٤٨﴾

আর যখন তুমি কুরআনে নিজের একমাত্র রবের কথা পড়ো তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৫২] আমি জানি, যখন তারা কান লাগিয়ে তোমার কথা শোনে তখন আসলে কি শোনে এবং যখন বসে পরস্পর কানাকানি করে তখন কি বলে। এ জালেমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, তোমরা এই যে লোকটির পেছনে চলছো এতো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।[৫৩] —দেখো, কী সব কথা এরা তোমার ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে, এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এরা পথ পায় না।[৫৪]

একথাও মনে থাকা দরকার যে, এটি মক্কার কাফেরদের নিজেদেরই উক্তি ছিল। আল্লাহ তাদের কথাটি তাদের ওপর উল্টে দিয়েছেন মাত্র। সূরা 'হা–মীম–সাজদা'য় তাদের এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ –(ايات : ٥)

অর্থাৎ "তারা বলে, হে মুহাম্মাদ! তুমি যে জিনিসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছো, তার জন্য আমাদের মনের দুয়ার বন্ধ, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজেই তুমি তোমার কাজ করো, আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি।" (আয়াত ঃ ৫)

এখানে তাদের এ উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করে আল্লাহ বলছেন, এই যে অবস্থাটিকে তোমরা নিজেদের প্রশংসার্হ গুণ মনে করে বর্ণনা করছো, এটিতো আসলে একটি অভিশাপ, তোমাদের আখেরাত অস্বীকৃতির বদৌলতে যথার্থ প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী এটি তোমাদের ওপর পড়ছে।

৫২. অর্থাৎ তুমি যে একমাত্র আল্লাহকে নিজের রব গণ্য করো তাদের তৈরী করা রবদের কোন কথা বলো না, এটা তাদের কাছে বড়ই বিরক্তিকর ঠেকে। মানুষ কেবল আল্লাহর মন্ত্র জপ করতে থাকবে, বুযর্গদের কার্যকলাপের কোন কথা বলবে না, মাযার, পবিত্রস্থান ইত্যাদির অনুগ্রহ ও দাক্ষিণ্যলাভের কোন স্বীকৃতি দেবে না এবং তাদের মতে

وَقَالُوٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُّعِيدُنَا ۗ قُلِ الَّذِى فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتٰى هُوَ ۗ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

তারা বলে, "আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমাদের আবার নতুন করে পয়দা করে ওঠানো হবে?"—এদেরকে বলে দাও, "তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও অথবা তার চাইতেও বেশী কঠিন কোন জিনিস, যার অবস্থান তোমাদের ধারণায় জীবনীশক্তি লাভ করার বহুদূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, "কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে?" জবাবে বলো, "তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের পয়দা করেন।" তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে,[৫৫] "আচ্ছা, তাহলে এটা কবে হবে?" তুমি বলে দাও, "অবাক হবার কিছুই নেই, সে সময়টা হয়তো নিকটেই এসে গেছে।

যেসব ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ভাগ–বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন তাদের উদ্দেশে কোন প্রশংসা বাণীও নিবেদন করবে না, এ ধরনের 'ওহাবী' আচরণ তাদের একদম পছন্দ নয়। তারা বলে ঃ এ অদ্ভুত ব্যক্তিটির মতে, অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, ক্ষমতা ও কুদরতের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং অধিকার ও ব্যবহার ক্ষমতার অধিকারীও একমাত্র আল্লাহ। তাহলে আমাদের এ আস্তানা–মাযারের অধিবাসীদের গুরুত্ব কোথায় রইলো! অথচ তাদের ওখান থেকে আমরা সন্তান পাই, রুগীদের রোগ নিরাময় হয়, ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতি হয় এবং মনের আশা পূর্ণ হয়।

৫৩. মক্কার কাফের সরদাররা পরস্পর যেসব কথা বলাবলি করতো, এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শুনতো এবং তারপর তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতো। অনেক সময় তাদের নিজেদের লোকদের মধ্য থেকে কারো প্রতি তাদের সন্দেহ হতো যে, সে কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়েছে। তাই তারা সবাই মিলে তাকে এ বলে বুঝাতো যে, ভাই এ তুমি কার ধোঁকায় পড়ে গেলে? এতো একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। অর্থাৎ কোন শত্রু এর ওপর যাদু করে দিয়েছে। তাইতো প্ররোচনামূলক কথা বলে চলছে।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

যেদিন তিনি তোমাদের ডাকবেন, তোমরা তাঁর প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে করতে তাঁর ডাকের জবাবে বের হয়ে আসবে এবং তখন তোমাদের এ ধারণা হবে যে, তোমরা অল্প কিছুক্ষণ মাত্র এ অবস্থায় কাটিয়েছ।[৫৬]

৫৪. অর্থাৎ এরা তোমার সম্পর্কে কোন একটি মত প্রকাশ করছে না। বরং বিভিন্ন সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী কথা বলছে। কখনো বলছে, তুমি নিজে যাদুকর। কখনো বলছে, তে মাকে কেউ যাদু করেছে। কখনো বলছে, তুমি কবি। কখনো বলছে, তুমি পাগল। এদে:. যে আসল সত্যের খবর নেই, এদের এসব পরস্পর বিরোধী কথাই তার প্রমাণ। নয়তো প্রতিদিন তারা একটা করে নতুন মত প্রকাশ করার পরিবর্তে কোন একটা চূড়ান্ত মত প্রকাশ করতো। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, তারা নিজেরা নিজেদের কোন কথায়ও নিশ্চিত নয়। একটি অপবাদ দেয়ার পর নিজেরাই অনুভব করছে, এটা তো ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। তাই পরে আর একটা অপবাদ দিচ্ছে। আবার সেটাকেও খাপ খেতে না দেখে তৃতীয় আর একটা অপবাদ তৈরী করছে। এভাবে তাদের প্রত্যেকটা নতুন অপবাদ পূর্বের অপবাদের প্রতিবাদ করে। এ থেকে জানা যায়, সত্য ও সততার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। নিছক শত্রুতা বশত তারা একের পর এক বড় বড় মিথ্যা রচনা করে চলছে।

৫৫. "ইন্‌গাদ" মানে হচ্ছে, ওপর থেকে নিচের দিকে এবং নিচে থেকে ওপরের দিকে মাথা নাড়া। এভাবে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ বা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করা হয়।

৫৬.অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুকাল থেকে নিয়ে কিয়ামতের দিনে উত্থান পর্যন্তকার সময়কালটা মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী বলে মনে হবে না। তোমরা তখন মনে করবে, আমরা সামান্য একটু সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে হঠাৎ এ কিয়ামতের শোরগোল আমাদের জাগিয়ে দিয়েছে।

আর "তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করতে, করতে উঠে আসবে।" একথা বলার মাধ্যমে একটি মহাসত্যের দিকে সূক্ষ্মতম ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন ও কাফের প্রত্যেকের মুখে সে সময় থাকবে আল্লাহর প্রশংসা বাণী। মুমিনের কণ্ঠে এ ধ্বনি হবার কারণ, পূর্ববর্তী জীবনে এরি ওপর ছিল তার বিশ্বাস এবং এটিই ছিল তার জপতপ। আর কাফেরের কণ্ঠে এ ধ্বনি উচ্চারিত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তার প্রকৃতিতে এ জিনিসটি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল কিন্তু নিজের বোকামির কারণে সে এর ওপর আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। এখন নতুন জীবন লাভ করার সাথে সাথেই সমস্ত কৃত্রিম আবরণ খসে পড়বে এবং তার আসল প্রকৃতির সাক্ষ স্বতস্ফূর্তভাবে তার কন্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে।

وَقُلْ لِّعِبَادِیْ یَقُوْلُوا الَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۚ اِنْ یَّشَاْ یَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ یَّشَاْ یُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَیْهِمْ وَكِیْلًا ﴿۵۴﴾

৬ রুকূ'

আর হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে[৫৭] বলে দাও, তারা যেন মুখে এমন কথা বলে যা সর্বোত্তম।[৫৮] আসলে শয়তান মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[৫৯] তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে বেশী জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং চাইলে তোমাদের শাস্তি দেন।[৬০] আর হে নবী! আমি তোমাকে লোকদের ওপর হাবিলদার করে পাঠাইনি।[৬১]

৫৭. অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে।

৫৮. অর্থাৎ কাফের ও মুশরিক এবং ইসলাম বিরোধীদের সাথে আলাপ–আলোচনা ও তর্ক–বিতর্ক করার সময় কড়া কথা, বাড়াবাড়ি ও বাহুল্য বর্জন করবে। বিরোধী পক্ষ যতই অপ্রীতিকর কথা বলুক না কেন মুসলমানদের মুখ থেকে কোন ন্যায় ও সত্য বিরোধী কথা বের হওয়া উচিত নয়। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাদের আজে বাজে কথা বলা শোভা পায় না। ঠাণ্ডা মাথায় তাদের এমন সব কথা বলতে হবে, যা যাচাই বাছাই করা, মাপাজোকা, ওজন করা, সত্য এবং তাদের দাওয়াতের মর্যাদার সাথে সংগতিশীল।

৫৯. যখনই তোমরা বিরোধীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠছে বলে মনে করবে এবং মন–মেজাজ আকস্মিকভাবে আবেগ–উত্তেজনায় ভরে যেতে দেখতে পাবে তখনই তোমাদের বুঝতে হবে, তোমাদের দীনের দাওয়াতের কাজ নষ্ট করার জন্য এটা শয়তানের উস্কানী ছাড়া আর কিছুই নয়। তার চেষ্টা হচ্ছে, তোমরাও নিজেদের বিরোধীদের মতো সংস্কারের কাজ ত্যাগ করে সে যেভাবে মানব গোষ্ঠীকে বিতর্ক–কলহ ও ফিত্‌না–ফাসাদে মশগুল করে রাখতে চায় সেভাবে তোমরাও তার মধ্যে মশ্‌গুল হয়ে যাও।

৬০. অর্থাৎ আমরা জান্নাতী এবং অমুক ব্যক্তি বা দল জাহান্নামী এ ধরনের দাবী কখনো ঈমানদারদের মুখে উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টির ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই সকল মানুষের ভিতর–বাইর এবং বর্তমান–ভবিষ্যত জানেন। কার প্রতি অনুগ্রহ করতে হবে এবং কাকে শাস্তি দিতে হবে—এ ফায়সালা তিনিই করবেন। আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে কোন্‌ ধরনের মানুষ রহমতলাভের অধিকার রাখে এবং কোন্‌ ধরনের মানুষ শাস্তিলাভের অধিকারী নীতিগত দিক দিয়ে মানুষ অবশ্যি একথা

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর ওপর মর্যাদা দিয়েছি[৬২] এবং আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম।[৬৩]

এদেরকে বলো, ডাক দিয়ে দেখো তোমাদের সেই মাবুদদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের কার্যোদ্ধারকারী) মনে করো, তারা তোমাদের কোন কষ্ট দূর করতে পারবে না এবং তা পরিবর্তন করতেও পারবে না।[৬৪] এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রবের নৈকট্যলাভের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত।[৬৫] আসলে তোমার রবের শাস্তি ভয় করার মতো।

বলার অধিকার রাখে। কিন্তু অমুক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে এবং অমুককে মাফ করে দেয়া হবে, একথা বলার অধিকার কারোর নেই।

সম্ভবত এ উপদেশবাণী এ জন্য করা হয়েছে যে, কখনো কখনো কাফেরদের জুলুম ও বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হয়ে যেতো যে, তোমরা জাহান্নামে যাবে অথবা আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দেবেন।

৬১. অর্থাৎ নবীর কাজ হচ্ছে দাওয়াত দেয়া। লোকদের ভাগ্য নবীর হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি যে, তিনি কারোর ভাগ্যে রহমত এবং কারোর ভাগ্যে শাস্তির ফায়সালা দিয়ে যেতে থাকবেন। এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কোন ভুল করেছিলেন এবং সে কারণে আল্লাহ তাঁকে এভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বরং এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়াই আসল উদ্দেশ্য। তাদেরকে বলা হচ্ছে, নবীই যখন এ মর্যাদার অধিকারী নন তখন তোমরা কিভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকেদার হয়ে গেলে?

৬২. এ বাক্যটি আসলে মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন সমকালীন লোকদের সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকে ঠিক সেই একই নিয়মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন ও সমগোত্রীয় লোকেরা তাঁর মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব দেখতে পাচ্ছিল না। তারা তাঁকে নিজেদের জনপদের একজন সাধারণ মানুষ মনে করছিল। আর যেসব খ্যাতনামা ব্যক্তি কয়েক শতাব্দী আগে অতীত হয়ে গিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে মনে করতো যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব কেবল তাদের মধ্যেই ছিল। তাই তাঁর মুখে নবুওয়াতের দাবী শুনে তারা এ বলে আপত্তি জানাতো যে, এ লোকটি তো বেশ লম্ফ ঝম্প মারছে। না জানি নিজেকে কী মনে করে বসেছে। বড় বড় পয়গম্বররা, যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সারা দুনিয়ার লোকেরা মানে, তাদের সাথে এ ব্যক্তির কি কোন তুলনাই করা যেতে পারে? আল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বলছেন : পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত সৃষ্টি আমার চোখের সামনে আছে। তোমরা জানো না তাদেরকে কোন্ পর্যায়ের এবং কে কোন্ ধরনের মর্যাদার অধিকারী। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মালিক আমি নিজেই এবং ইতিপূর্বেও আমি বহু নবী পয়দা করেছি যাদের একজন অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন।

৬৩. এখানে বিশেষভাবে দাউদ আলাইহিস সালামকে যাবুর দান করার কথা সম্ভবত এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাউদ আলাইহিস সালাম বাদশাহ ছিলেন এবং বাদশাহ সাধারণত আল্লাহর কাছ থেকে বেশী দূরে অবস্থান করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকেরা যে কারণে তাঁর পয়গম্বরী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকার করতো তা তাদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী এ ছিল যে, সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রী-সন্তান ছিল, তিনি পানাহার করতেন, হাটে-বাজারে চলাফেরা করে কেনাবেচা করতেন এবং একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজনাদি পূরণ করার জন্য যেসব কাজ করতো তিনি তা সব করতেন। মক্কার কাফেরদের বক্তব্য ছিল, তুমি একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীরা তো হচ্ছে এমন সব লোক, নিজেদের দৈহিক ও মানসিক চাহিদার ব্যাপারে যাদের কোন জ্ঞান থাকে না। তারা তো একটি নির্জন জায়গায় বসে দিনরাত আল্লাহর ধ্যানে ও স্মরণে মশ্‌গুল থাকে। ঘর সংসারের চাল-ডালের কথা ভাববার সময় ও মানসিকতা তাদের কোথায়! এর জবাবে বলা হচ্ছে, পুরোপুরি একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার চাইতে বড় দুনিয়াদারী আর কি হতে পারে, কিন্তু এরপরও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত ও কিতাবের নিয়ামত দান করা হয়েছিল।

৬৪. এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কেবল গায়রুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা) সিজদা করাই শির্‌ক নয় বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার কাছে দোয়া চাওয়া বা তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকাও শির্‌ক। দোয়া ও সাহায্য চাওয়া ও মূলতাত্বিক বিচারে ইবাদতেরই অন্তরভুক্ত। কাজেই গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী একজন মূর্তি পূজকের সমান অপরাধী। তাছাড়া এ থেকে একথাও জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া কারোরও কোন সামান্যতম ইখতিয়ার নেই। অন্য কেউ কান আপদ-বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে না এবং কোন খারাপ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিবর্তিত করে দিতেও পারে

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْأٰيٰتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَاٰتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْأٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

আর এমন কোন জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের আগে ধ্বংস করে দেবো না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেবো না,[৬৬] আল্লাহর লিখনে এটা লেখা আছে।

আর এদের পূর্ববর্তী লোকেরা নিদর্শনসমূহ[৬৭] অস্বীকার করেছে বলেই তো আমি নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত রয়েছি। (যেমন দেখে নাও) সামূদকে আমি প্রকাশ্যে উটনী এনে দিলাম এবং তারা তার ওপর জুলুম করলো।[৬৮] আমি নিদর্শন তো এ জন্য পাঠাই যাতে লোকেরা তা দেখে ভয় পায়।[৬৯]

না। আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন সত্তা সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস রাখা একটি মুশরিকী বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬৫. এ শব্দগুলো নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব মাবুদ ও ত্রাণকর্তার কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা পাথরের মূর্তি নয় বরং তারা হচ্ছে ফেরেশ্‌তা বা অতীত যুগের আল্লাহর প্রিয় নেক বান্দা। এর অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ নবী হোক বা আউলিয়া অথবা ফেরেশ্‌তা, কারোই তোমাদের প্রার্থনা শুনার এবং তোমাদের সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। তোমরা নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে অসিলায় পরিণত করছো কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা নিজেরাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত এবং তাঁর বেশী বেশী নিকটবর্তী হবার জন্য অসিলা ও উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

৬৬. অর্থাৎ কারোর চিরন্তন স্থায়িত্ব নেই। প্রত্যেকটি জনপদকে হয় স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে হয় আর নয়তো আল্লাহর আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস হতে হবে। তোমাদের এ জনপদগুলো চিরকাল এমনি প্রাণবন্ত ও জীবন্ত থাকবে এই ভুল ধারণা তোমরা কেমন করে পোষণ করতে পারলে?

৬৭. অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মু'জিযা সমূহ, যেগুলো সংঘটিত করা বা পাঠানো হয় নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে। মক্কার কাফেররা বারবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এগুলোর দাবী জানিয়ে আসছিল।

৬৮. এখানে বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ ধরনের মু'জিযা দেখার পর যখন লোকেরা একে মিথ্যা বলতে থাকে তখন তাদের ওপর আযাব নাযিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং তখন এ জাতিকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। মানব জাতির অতীত

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝٦٠

স্মরণ করো হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, তোমার রব এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন।[৭০] আর এই যা কিছু এখনই আমি তোমাকে দেখিয়েছি[৭১] একে এবং কুরআনে অভিশপ্ত গাছকে[৭২] আমি এদের জন্য একটি ফিতনা বানিয়ে রেখে দিয়েছি।[৭৩] আমি এদেরকে অনবরত সতর্ক করে যাচ্ছি কিন্তু প্রতিটি সতর্কসংকেত এদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে চলছে।

ইতিহাস প্রমাণ করে, বিভিন্ন জাতি সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখে নেবার পরও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, ফলে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এখন এটা পুরোপুরি আল্লাহর রহমত যে, তিনি এমন ধরনের কোন মু'জিযা আর পাঠাচ্ছেন না। এর মানে হচ্ছে, তিনি তোমাদের বুঝবার ও সংশোধিত হবার অবকাশ দিচ্ছেন। কিন্তু তোমরা এমনি নির্বোধ যে, মু'জিযার দাবী জানিয়ে সামুদ জাতির পরিণাম ভোগ করতে চাচ্ছো।

৬৯. অর্থাৎ কোন ম্যাজিক বা দর্শনীয় খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে কখনো মু'জিযা দেখানো হয় না। সব সময় মু'জিযা এই উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে যে, লোকেরা তা দেখে সাবধান হয়ে যাবে, তারা বুঝতে পারবে নবীর পেছনে আছে এক সর্বময় শক্তিশালী সত্তার অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর নাফরমানীর পরিণাম কি হতে পারে তাও তারা জানতে পারবে।

৭০. অর্থাৎ তোমার নবুওয়াতী দাওয়াতের সূচনালগ্নেই যখন মক্কার এ কাফেররা তোমার বিরোধিতা করতে এবং তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করাতে শুরু করেছিল তখনই আমি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছিলাম, আমি এ লোকদেরকে ঘিরে রেখেছি, এরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, কোনভাবেই এরা তোমার দাওয়াতের পথ রোধ করতে পারবে না এবং তুমি যে কাজে হাত দিয়েছো সব রকমের বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে কাজ সম্পন্ন হবেই। এখন যদি এ লোকদেরকে মু'জিযা দেখিয়ে সতর্ক করতে হয় তাহলে এ মু'জিযা তাদেরকে আগেই দেখানো হয়ে গেছে অর্থাৎ শুরুতে যাকিছু বলা হয়েছিল তা পূরা হয়ে গেছে, এদের কোন বিরোধিতাই ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতি রুখে দিতে পারেনি এবং এদের এ প্রচেষ্টা তোমার এক চুল পরিমাণও ক্ষতি করতে পারেনি। এদের দেখার মতো চোখ থাকলে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এরা নিজেরাই বুঝতে পারে যে, নবীর এ দাওয়াতের পেছনে আল্লাহর হাত সক্রিয় রয়েছে।

আল্লাহ বিরোধীদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং নবীর দাওয়াত আল্লাহর হেফাজতে রয়েছে—একথা মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন সূরা বুরুজে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ
عَلَىَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ
اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾

৭ রুকূ'

আর স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না।[৭৪] সে বললো, "আমি কি তাকে সিজদা করবো যাকে তুমি বানিয়েছো মাটি দিয়ে?" তারপর সে বললো, "দেখোতো ভাল করে, তুমি যে একে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো, এ কি এর যোগ্য ছিল? যদি তুমি আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহলে আমি তার সমস্ত সন্তান সন্ততির মূলোচ্ছেদ করে দেবো,[৭৫] মাত্র সামান্য ক'জনই আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে।" আল্লাহ বললেন, "ঠিক আছে, তুমি যাও, এদের মধ্য থেকে যারাই তোমার অনুসরণ করবে তুমিসহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হবে পূর্ণ প্রতিদান।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ۙ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۚ

"কিন্তু এ কাফেররা মিথ্যা বলার ও অস্বীকার করার কাজে লেগেই আছে এবং আল্লাহ সবদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন।" (আয়াত ঃ ১৯-২০)

৭১. মি'রাজের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তাই এখানে রু'ইয়া শব্দটি ব্যবহৃত হলেও এর মানে এখানে স্বপ্ন নয় বরং এখানে এর মানে হচ্ছে চোখে দেখা। এটা নিছক স্বপ্ন হলে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সামনে এটাকে স্বপ্ন হিসেবেই বর্ণনা করলে এটা তাদের জন্য ফিত্‌না হবার কোন কারণই ছিল না। একটার চাইতে একটা বেশী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা হয় এবং লোকদের সামনে বর্ণনাও করা হয় কিন্তু তা কখনো কারো জন্য এমন সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না যে, লোকেরা এ জন্য যে স্বপ্ন দেখেছে তাকে বিদ্রূপ করতে থেকেছে এবং তার প্রতি মিথ্যাচার ও পাগলপনার অপবাদ দিয়েছে।

৭২. অর্থাৎ "যাক্কুম"। এ সম্পর্কে কুরআনে খবর দেয়া হয়েছে, এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশে উৎপন্ন হবে এবং জাহান্নামীদের তা খেতে হবে। একে অভিশপ্ত করার মানে হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রহমত থেকে এ গাছটি দূরে থাকবে। অর্থাৎ এটি আল্লাহর রহমতের

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

তুমি যাকে যাকে পারো তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে পদস্খলিত করো,[৭৬] তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও,[৭৭] ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও[৭৮] এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো,[৭৯] —আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়,—নিশ্চিতভাবেই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন কর্তৃত্ব অর্জিত হবে না[৮০] এবং ভরসা করার জন্য তোমার রবই যথেষ্ট।[৮১]

নিদর্শন নয়। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকদের আহারের সংস্থান করার জন্য এ গাছটি উৎপন্ন করবেন না বরং এটি হবে তাঁর লানতের নিদর্শন। অভিশপ্ত লোকদের জন্য তিনি এটি উৎপন্ন করবেন। তারা ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে একেই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে। ফলে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। সূরা "দুখান"-এ এ গাছের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, জাহান্নামীরা যখন তা খাবে, তাদের পেটে আগুন লেগে যাবে, মনে হবে যেন তাদের পেটের মধ্যে গরম পানি টগবগ করে ফুটছে।

৭৩. অর্থাৎ এদের কল্যাণের জন্য আমি তোমাকে মি'রাজের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস সরাসরি দেখিয়েছি, যাতে তোমার মতো সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এ লোকেরা যথার্থ সত্যের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং এভাবে সতর্ক হয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এরা উল্‌টো এ ঘটনার ভিত্তিতে তোমাকে বিদ্রূপ করেছে। আমি তোমার মাধ্যমে এদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছি যে, এখানে হারাম খাওয়ার পরিণামে তোমাদের যাক্কুম খেতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু তারা এ বক্তব্যকে বিদ্রূপ করে বলেছে ঃ দেখো, দেখো, এ ব্যক্তির অবস্থা দেখো, একদিকে বলছে, জাহান্নামে আগুন দাউদাউ করে জ্বলবে আবার অন্যদিকে খবর দিচ্ছে, সেখানে গাছ জন্মাবে!

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য সূরা আল বাকারার ৪ রুকূ', আন নিসার ১৮ রুকূ', আল হিজ্‌রের ৩ রুকূ' এবং ইবরাহীমের ৪ রুকূ' দেখুন।

এ বক্তব্য প্রসংগে আলোচ্য ঘটনাটা আসলে যে কথা বুঝাবার জন্য বর্ণনা করা হচ্ছে তা হচ্ছে, আল্লাহর মোকাবিলায় কাফেরদের এ অহংকার, সতর্কবাণীর প্রতি তাদের এ উপেক্ষা এবং বাঁকা পথে চলার জন্য তাদের এ অনমনীয় ঔদ্ধত্য ঠিক সেই শয়তানেরই

অনুকরণ যে প্রথম দিন থেকেই মানুষের শত্রুতা করে আসছে। এ কর্মনীতি অবলম্বন করে এরা আসলে এমন একটি জালে জড়িয়ে পড়ছে যে জালে আদমের বংশধরদেরকে জড়িয়ে ধ্বংস করে দেবার জন্য শয়তান মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্নেই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল।

৭৫. "মূলোচ্ছেদ করে দেবো," অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার পথ থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবো। 'ইহ্‌তিনাক' শব্দের আসল মানে হচ্ছে, কোন জিনিসকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলা। যেহেতু মানুষের আসল মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর খেলাফত এবং এর দাবী হচ্ছে আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকা, তাই এ মর্যাদা থেকে তার সরে যাওয়া গাছকে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলারই মতো।

৭৬. মূলে "ইস্‌তিফ্‌যায" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে হাল্‌কা করা। অর্থাৎ দুর্বল বা হাল্‌কা পেয়ে কাউকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বা তার পা পিছ্‌লিয়ে দেয়া।

৭৭. এ বাক্যাংশে শয়তানকে এমন একটি ডাকাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক ডাকাত বাহিনী নিয়ে একটি জনপদ আক্রমণ করে এবং তাদেরকে হুকুম দিতে থাকে, এদিকে লুটপাট করো, ওদিকে সাঁড়াশী আক্রমণ চালাও এবং সেদিকে ধ্বংস করো। শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বলতে এমনসব অসংখ্য জিন ও মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা বিভিন্ন আকৃতিতে ও বিভিন্নভাবে ইবলীসের মানব বিধ্বংসী অভিযানে সহযোগিতা করছে।

৭৮. এ বাক্যাংশটি বড়ই অর্থপূর্ণ। এখানে শয়তান ও তার অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাংগ ছবি আঁকা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন ও তা খরচ করার ব্যাপারে শয়তানের ইংগিতে নড়াচড়া করে, তার সাথে যেন শয়তান বিনা অর্থ ব্যয়ে শরীক হয়ে গেছে। পরিশ্রমে তার কোন অংশ নেই, অপরাধ, পাপ ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতিতে সে অংশীদার নয়, কিন্তু তার ইংগিতে এ নির্বোধ এমনভাবে চলছে যেন তার ব্যবসায়ে সে সমান অংশীদার বরং বৃহত্তম অংশীদার। এভাবে সন্তান তো হয় মানুষের নিজের এবং তাকে লালন পালন করার জন্য সে নিজের সব যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও সম্পদ ব্যয় করে কিন্তু শয়তানের ইংগিতে এ সন্তানকে সে এমনভাবে গোমরাহী ও নৈতিক চরিত্রহীনতার শিক্ষা দেয় যেন মনে হয় সে একা এ সন্তানের বাপ নয় বরং তার পিতৃত্বে শয়তানেরও শরীকানা আছে।

৭৯. অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যা আশার কুহকে ভুলিয়ে রাখো এবং মিথ্যার আকাশ কুসুম রচনা করে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দাও।

৮০. এর দু'টি অর্থ। স্ব স্ব স্থানে দু'টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, আমার বান্দা অর্থাৎ মানুষের ওপর তুমি এমন কর্তৃত্ব লাভ করবে না, যার ফলে তুমি তাদেরকে জবরদস্তি নিজের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারো। তুমি নিছক প্ররোচিত করতে ও ফুসলাতে এবং ভুল পরামর্শ দিতে ও মিথ্যা ওয়াদা করতে পারো। কিন্তু তোমার কথা গ্রহণ করা বা না করা হবে বান্দার নিজের কাজ। তারা তোমার পথে যেতে চাইলে বা না চাইলেও তুমি হাত ধরে তাদেরকে নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবে —তোমার এমন ধরনের কোন কর্তৃত্ব তাদের ওপর থাকবে না। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, আমার বিশেষ বান্দাদের অর্থাৎ নেক বান্দাদের ওপর তোমার কোন প্রভাব খাটবে না। শক্তিহীন ও দুর্বল সংকল্পধারী লোকেরা

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝

তোমাদের (আসল) রব তো তিনিই যিনি সমুদ্রে তোমাদের নৌযান পরিচালনা করেন,[৮২] যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো।[৮৩] আসলে তিনি তোমাদের অবস্থার প্রতি বড়ই করুণাশীল। যখন সাগরে তোমাদের ওপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাকে তোমরা ডাকো সবাই অন্তর্হিত হয়ে যায়।[৮৪] কিন্তু যখন তিনি তোমাদের রক্ষা করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ সত্যিই বড়ই অকৃতজ্ঞ।

নিশ্চয়ই তোমার প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবে, কিন্তু যারা আমার বন্দেগীতে অবিচল থাকবে তারা কখনো তোমার নিয়ন্ত্রণে আসবে না।

৮১. অর্থাৎ যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং যারা তাঁর পথনির্দেশনা, সুযোগ দান ও সাহায্যের ওপর আস্থা রাখবে তাদের এ আস্থা ভুল প্রমাণিত হবে না। তাদের অন্য কোন সহায় ও নির্ভরের প্রয়োজন হবে না। তাদের পথ দেখাবার এবং হাত ধরার ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। তবে যারা নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে তারা এ পরীক্ষা পর্ব সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারবে না।

৮২. ওপরের ধারাবাহিক বর্ণনার সাথে এর সম্পর্ক বুঝতে হলে এ রুকূ'র শুরুতে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে তার প্রতি আর একবার নজর বুলাতে হবে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই ইবলীস আদম সন্তানদের পেছনে লেগেছে। সে তাদেরকে আশার ছলনা দিয়ে ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির জালে জড়িয়ে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একথা প্রমাণ করতে চায় যে, আল্লাহ তাদেরকে যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তারা তার যোগ্য নয়। এ বিপদ থেকে যদি কোন জিনিস মানুষকে বাঁচাতে পারে তাহলে তা হচ্ছে কেবল এই যে, মানুষকে তার রবের বন্দেগীর ওপর অবিচল থাকতে হবে, পথনির্দেশনা ও সাহায্য লাভের জন্য একমাত্র তাঁরই দিকে রুজু করতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় যে কোন পথই মানুষ অবলম্বন করবে তার সাহায্যে সে শয়তানের জাল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না।—এ ভাষণ থেকে আপনা আপনিই একথা বের হয়ে আসে যে, যারা তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছে এবং শির্কের ওপর জোর দিয়ে চলছে, তারা আসলে নিজেরাই

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

আচ্ছা, তাহলে তোমরা কি এ ব্যাপারে একেবারেই নির্ভীক যে, আল্লাহ কখনো স্থলদেশেই তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে প্রোথিত করে দেবেন না অথবা তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী ঘূর্ণি পাঠাবেন না এবং তোমরা তার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোন সহায়ক পাবে না? আর তোমাদের কি এ ধরনের কোন আশংকা নেই যে, আল্লাহ আবার কোন সময় তোমাদের সাগরে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘূর্ণি পাঠিয়ে তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন এবং তোমরা এমন কাউকে পাবে না যে, তাঁর কাছে তোমাদের এ পরিণতির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে? —এতো আমার অনুগ্রহ, আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং তাদেরকে জলে স্থলে সওয়ারী দান করেছি, তাদেরকে পাক–পবিত্র জিনিস থেকে রিযিক দিয়েছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি।[৮৫]

নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। এ সম্বন্ধের ভিত্তিতেই এখানে তাওহীদের সত্যতা সপ্রমাণ করা হচ্ছে এবং শির্ককে বাতিল করে দেয়া হচ্ছে।

৮৩. অর্থাৎ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে যেসব অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক, জ্ঞানগত ও চিন্তাগত কল্যাণ লাভ করা যায় তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করো।

৮৪. অর্থাৎ এ থেকে একথাই প্রমাণ হয় যে, তোমাদের আসল স্বভাব প্রকৃতি এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই রব বলে স্বীকার করে না এবং তোমাদের নিজেদের অন্তরের গভীর তলদেশে এ চেতনা চিরঞ্জীব রয়েছে যে, লাভ ও ক্ষতি করার আসল ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে। নয়তো যখন আসল সাহায্য করার সময় হয় তখন তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী আছে বলে মনে করতে পারো না কেন? এর কারণ কি?

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৮ রুকূ’

তারপর সেই দিনের কথা মনে করো যেদিন আমি মানুষের প্রত্যেকটি দলকে তার নেতা সহকারে ডাকবো। সেদিন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের কার্যকলাপ পাঠ করবে[৮৬] এবং তাদের ওপর সামান্যতমও জুলুম করা হবে না আর যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে থাকে সে আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে বরং পথ লাভ করার ব্যাপারে সে অন্ধের চাইতেও বেশী ব্যর্থ।

হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আমি যে অহী পাঠিয়েছি তা থেকে তোমাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এ লোকেরা তোমাকে বিভ্রাটের মধ্যে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টায় কসুর করেনি, যাতে তুমি আমার নামে নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা তৈরী করো।[৮৭] যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে তারা তোমাকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো। আর যদি আমি তোমাকে মজবুত না রাখতাম তাহলে তোমার পক্ষে তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু যদি তুমি এমনটি করতে তাহলে আমি এ দুনিয়ায় তোমাকে দ্বিগুণ শাস্তির মজা টের পাইয়ে দিতাম এবং আখেরাতেও, তারপর আমার মোকাবিলায় তুমি কোন সাহায্যকারী পেতে না।[৮৮]

৮৫. অর্থাৎ এটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সত্য যে, কোন জিন, ফেরেশ্‌তা বা গ্রহ–নক্ষত্র মানব জাতিকে পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব দান করেনি। কোন

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

আর এরা এ দেশ থেকে তোমাকে উৎখাত করার এবং এখান থেকে তোমাকে বের করে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু যদি এরা এমনটি করে তাহলে তোমার পর এরা নিজেরাই এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না।[৮৯]

এটি আমার স্থায়ী কর্মপদ্ধতি। তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবার ব্যাপারে একর্ম পদ্ধতি আরোপ করেছিলাম।[৯০] *আর আমার কর্মপদ্ধতিতে তুমি কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।*

নবী বা অলী তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে এ কর্তৃত্ব দান করেনি। নিশ্চিতভাবেই এটা আল্লাহরই দান এবং তাঁর অনুগ্রহ। তারপর মানুষ এহেন মর্যাদা লাভ করার পর আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির সামনে মাথা অবনত করবে, মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় বোকামী ও মূর্খতা আর কী হতে পারে?

৮৬. কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় একথা বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন নেক লোকদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে এবং তারা সানন্দে তা দেখতে থাকবে বরং অন্যদেরকেও দেখাবে। অন্যদিকে অসৎলোকদের দুষ্কৃতির তালিকা তাদের বাঁ হাতে দেয়া হবে এবং তারা তা পাওয়ার সাথে সাথেই পেছন দিকে লুকাবার চেষ্টা করবে। এ প্রসংগে দেখুন সূরা আল হাক্কাহ ১৯–২৮ এবং ইনশিকাক ৭–১৩ আয়াত।

৮৭. বিগত দশ বারো বছর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যে অবস্থার সাথে যুঝছিলেন এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছিলেন মক্কার কাফেররা তাকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল তিনি তাদের শির্‌ক ও জাহেলী রসম রেওয়াজের সাথে কিছু না কিছু সমঝোতা করে নেবেন। এ উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে ফিত্‌নার মধ্যে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলো। তাঁকে ধোঁকা দিল, লোভ দেখালো, হুমকি দিল এবং মিথ্যা প্রচারণার তূফান ছুটালো। তারা তাঁর প্রতি জুলুম নিপীড়ন চালালো ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলো। তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করলো। একটি মানুষের সংকল্পকে ভেংগে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য যা কিছু করা যেতে পারে তা সবই তারা করে ফেললো।

৮৮. এ সমগ্র কার্যবিবরণীর ওপর মন্তব্য প্রসংগে আল্লাহ দু'টি কথা বলেছেন। এক, যদি তুমি সত্যকে সত্য জানার পর মিথ্যার সাথে কোন আপোস করে নিতে তাহলে বিক্ষুব্ধ জাতি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যেতো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর গযব তোমার ওপর নেমে পড়তো এবং তোমাকে দুনিয়ায় ও আখেরাত উভয় স্থানেই দ্বিগুণ সাজা দেয়া হতো। দুই,

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

৯ রুকূ'

নামায কায়েম করো[৯১] সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে[৯২] নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত[৯৩] এবং ফজরে কুরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো।[৯৪] কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।[৯৫]

মানুষ নবী হলেও আল্লাহর সাহায্য ও সুযোগ–সুবিধা তার সহযোগী না হলে শুধুমাত্র নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে সে মিথ্যার তুফানের মোকাবিলা করতে পারে না। শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সাহায্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য ও ন্যায়ের ওপর পাহাড়ের মতো অটল থাকেন এবং বিপদের সয়লাব স্রোত তাঁকে একচুলও স্থানচ্যুত করতে পারেনি।

৮৯. এটি একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। সে সময় এটি তো নিছক একটি হুমকি মনে হচ্ছিল। কিন্তু দশ বারো বছরের মধ্যেই এর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গেলো। এ সূরা নাযিলের এক বছর পর মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের জন্মভূমি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করলো এবং এরপর ৮ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কা মুয়াযযমায় প্রবেশ করলেন। তারপর দু'বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড মুশরিক শূন্য করা হলো। এরপর যারাই এ দেশে বসবাস করেছে মুসলমান হিসেবেই বসবাস করেছে, মুশরিক হিসেবে কেউ সেখানে টিকতে পারেনি।

৯০. সকল নবীর ব্যাপারে আল্লাহ এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ যে জাতি তাদেরকে হত্যা ও দেশান্তরী করেছে, তারপর সে আর বেশীদিন স্বস্থানে অবস্থান করতে পারেনি। এরপর হয় আল্লাহর আযাব তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে অথবা কোন শত্রু ভাবাপন্ন জাতিকে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা সেই নবীর অনুসারীদের দ্বারা তাকে বিপর্যস্ত ও বিজিত করা হয়েছে।

৯১. পর্বত প্রমাণ সমস্যা ও সংকটের আলোচনা করার পর পরই নামায কায়েম করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করেছেন যে, এ অবস্থায় একজন মুমিনের জন্য যে অবিচলতার প্রয়োজন হয় তা নামায কায়েমের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

৯২. دلوك الشمس এর অনুবাদ করেছি "সূর্য ঢলে পড়া।" অবশ্যি কোন কোন সাহাবা ও তাবেঈ "দুলূক" অর্থ নিয়েছেন সূর্যাস্ত। কিন্তু অধিকাংশের মতে এর অর্থ হচ্ছে দুপুরে সূর্যের পশ্চিমে ঢলে পড়া। হযরত উমর, ইবনে উমর, আনাস ইবনে মালিক, আবু বারযাতাল আসলামী, হাসান বাসরী, শা'বী, আতা, মুজাহিদ এবং একটি বর্ণনামতে ইবনে

আব্বাসও এ মতের সমর্থক। ইমাম মুহাম্মাদ বাকের ও ইমাম জাফর সাদেক থেকেও এই মত বর্ণিত হয়েছে। বরং কোন কোন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও دلوك الشمس এর এ ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত হয়েছে, যদিও এর সনদ তেমন বেশী শক্তিশালী নয়।

৯৩. غسق الليل এর অর্থ কেউ কেউ নিয়েছেন "রাতের পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাওয়া।" আবার কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্যরাত। যদি প্রথম অর্থটি মেনে নেয়া হয় তাহলে এর মানে হবে এশার প্রথম ওয়াক্ত। আর দ্বিতীয় অর্থটি মেনে নিলে এখানে এশার শেষ ওয়াক্তের দিকে ইংগিত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

৯৪. ফজর শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ভোর হওয়া বা প্রভাতের উদয় হওয়া। অর্থাৎ একেবারে সেই প্রথম লগ্নটি যখন প্রভাতের শুভ্রতা রাতের আঁধার চিরে উঁকি দিতে থাকে।

ফজরের কুরআন পাঠ মানে হচ্ছে, ফজরের নামায, কুরআন মজীদে নামাযের প্রতিশব্দ হিসেবে কোথাও 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার কোথাও তার বিভিন্ন অংশের মধ্য থেকে কোন একটির নাম নিয়ে সমগ্র নামাযটি ধরা হয়েছে। যেমন তাসবীহ, যিকির, হামদ (প্রশংসা), কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকূ', সিজ্‌দাহ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে এখানে ফজরের সময় কুরআন পড়ার মানে শুধু কুরআন পাঠ করা নয় বরং নামাযে কুরআন পাঠ করা। এভাবে নামাযের উপাদান ও অংশ কি ধরনের হতে হবে কুরআন মজীদ সেদিকে পরোক্ষ ইংগিত দিয়েছে। আর এ ইংগিতের আলোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কাঠামো নির্মাণ করেন। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে নামাযের এ কাঠামোই প্রচলিত।

৯৫. ফজরের কুরআন পরিলক্ষিত হওয়ার মানে হচ্ছে, আল্লাহর ফেরেশতারা এর সাক্ষী হয়। হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় একথা বর্ণনা করা হয়েছে যদিও ফেরেশতারা প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক সৎকাজের সাক্ষী তবুও যখন ফজরের নামাযের কুরআন পাঠে তাদের সাক্ষের কথা বলা হয়েছে তখন এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, এ কাজটি একটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে দীর্ঘ আয়াত ও সূরা পড়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং পরবর্তী ইমামগণ একে মুস্‌তাহাব গণ্য করেন।

এ আয়াতে সংক্ষেপে মি'রাজের সময় যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল তার সময়গুলো কিভাবে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করা হবে তা বলা হয়েছে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, একটি নামায পড়ে নিতে হবে সূর্যোদয়ের আগে। আর বাকি চারটি নামায সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত পড়ে নিতে হবে। তারপর এ হুকুমটি ব্যাখ্যা করার জন্য জিব্রীল আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছে। তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযগুলোর সঠিক সময়ের শিক্ষা দান করেছেন। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"জিব্রীল দু'বার আমাকে বায়তুল্লাহর কাছাকাছি জায়গায় নামায পড়ান' প্রথম দিন যোহরের নামায ঠিক এমন সময় পড়ান যখন সূর্য সবেমাত্র হেলে পড়েছিল এবং ছায়া জুতার একটি ফিতার চাইতে বেশী লম্বা হয়নি। তারপর আসরের নামায পড়ান এমন এক সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের সমপরিমাণ ছিল। এরপর মাগরিবের নামায এমন সময় পড়ান যখন রোযাদার রোযা ইফতার করে। অতপর পশ্চিমাকাশের লালিমা খতম হবার পরপরই এশার নামায পড়ান আর ফজরের নামায পড়ান ঠিক যখন রোযাদারের ওপর খাওয়া দাওয়া হারাম হয়ে যায় তেমনি সময়। দ্বিতীয় দিন তিনি আমাকে যোহরের নামায এমন সময় পড়ান যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের সমান ছিল। আসরের নামায পড়ান এমন সময় যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ ছিল। মাগরিবের নামায পড়ান এমন সময় যখন রোযাদার রোযা ইফতার করে। এশার নামায পড়ান এমন সময় যখন রাতের তিনভাগের একভাগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং ফজরের নামায পড়ান আলো চারদিকে ভালভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর। তারপর জিব্রীল আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুহাম্মাদ। এই হচ্ছে নবীদের নামায পড়ার সময় এবং এ দু'টি সময়ের মাঝখানেই হচ্ছে নামাযের সঠিক সময়।" (অর্থাৎ প্রথম দিন প্রত্যেক নামাযের প্রথম সময় এবং দ্বিতীয় দিন শেষ সময় বর্ণনা করা হয়। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায এ দু'টি সময়ের মাঝখানে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।)

কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায়ও পাঁচটি নামাযের এ ওয়াক্তসমূহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেমন সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ

"নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরিব) এবং কিছু রাত পার হয়ে গেলে (অর্থাৎ এশা)।" (১১৪ আয়াত)

সূরা 'তা–হা'য়ে বলা হয়েছে ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَاۤئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ –

"আর নিজের রবের হাম্‌দ (প্রশংসা) সহকারে তাঁর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করতে থাকো সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) এবং রাতের সময় আবার তাসবীহ করো (এশা) আর দিনের প্রান্তসমূহে (অর্থাৎ সকাল, যোহর ও মাগরিব)" [১৩০ আয়াত]

তারপর সূরা রূমে বলা হয়েছে ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

"কাজেই আল্লাহর তাসবীহ করো যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (মাগরিব) এবং যখন সকাল হয় (ফজর)। তাঁরই জন্য প্রশংসা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং তাঁর তাসবীহ করো দিনের শেষ অংশে (আসর) এবং যখন তোমাদের দুপুর (যোহর) হয়।"
[১৭-১৮ আয়াত]

নামাযের সময় নির্ধারণ করার সময় যেসব প্রয়োজনীয় দিকে নজর রাখা হয়েছে তার মধ্যে সূর্য পূজারীদের ইবাদাতের সময় থেকে দূরে থাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল যুগেই সূর্য মুশরিকদের সবচেয়ে বড় বা অনেক বড় মাবুদের স্থান দখল করেছে। সূর্য উদয় ও অস্তের সময়টায়ই তারা বিশেষ করে তার পূজা করে থাকে। তাই এসব সময় নামায পড়াকে হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া সাধারণত সূর্য উদয়ের পর থেকে নিয়ে মধ্য গগণে পৌছার সময়ে তার পূজা করা হয়ে থাকে। কাজেই ইসলামে হুকুম দেয়া হয়েছে, দিনের বেলার নামাযগুলো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে পড়া শুরু করতে হবে এবং সকালের নামায সূর্য উদিত হবার আগেই পড়ে ফেলতে হবে। এ প্রয়োজনীয় বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা করেছেন। একটি হাদীসে হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রা) বর্ণনা করছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের সময় জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

صل صلوة الصبح ثم اقصر عن الصلوة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنى الشيطن وحينئذ يسجد له الكفار -

"ফজরের নামায পড়ো এবং সূর্য উদিত হতে থাকলে বিরত হও, সূর্য ওপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত। কারণ সূর্য যখন উদিত হয় তখন শয়তানের শিং দু'টির মাঝখান দিয়ে বের হতে থাকে এবং এ সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে।"

তারপর তিনি আসরের নামাযের উল্লেখ করার পর বললেন ঃ

ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرنى الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار -

"তারপর নামায থেকে বিরত হও সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। কেননা, সূর্য শয়তানের শিং দু'টির মাঝখানে অস্ত যায় এবং এ সময় কাফেররা তার পূজা করে।" (মুসলিম)

এ হাদীসে সূর্যের শয়তানের শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়াকে একটা রূপক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ ধারণা দেয়া হয়েছে যে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময় শয়তান লোকদের জন্য একটি বিরাট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেয়। লোকেরা যখন সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময় তার সামনে সিজদা করে তখন যেন মনে হয় শয়তান তাকে নিজের মাথায় করে এনেছে এবং মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। রসূল (স) তাঁর নিজের নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে এ রূপকের রহস্য ভেদ করেছেন "এ সময় কাফেররা তার পূজা করে।"

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝٧٩ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠

আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ো[৯৬] এটি তোমার জন্য নফল।[৯৭] অচিরেই তোমার রব তোমাকে "প্রশংসিত স্থানে"[৯৮] প্রতিষ্ঠিত করবেন।

আর দোয়া করো ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো।[৯৯] এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।[১০০]

৯৬. তাহাজ্জুদ মানে ঘুম ভেংগে উঠে পড়া। কাজেই রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ো মানে হচ্ছে, রাতের একটি অংশে ঘুমুবার পর উঠে নামায পড়ে নাও।

৯৭. নফল মানে ফরযের অতিরিক্ত। এ থেকে আপনা আপনি এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, আগের আয়াতে যে পাঁচটি নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করা হয়েছিল সেগুলো ফরয এবং এ ষষ্ঠ নামাযটি ফরযের অতিরিক্ত।

৯৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ও আখেরাতে তোমাদেরকে এমন মর্যাদায় পৌছে দেবেন যেখানে তোমরা মানুষের কাছে প্রশংসিত হয়ে থাকবে। চারদিক থেকে তোমাদের ওপর প্রশংসার স্রোত প্রবাহিত হতে থাকবে। তোমাদের অস্তিত্ব দুনিয়ায় একটি প্রশংসনীয় অস্তিত্বে পরিণত হবে। আজ তোমাদের বিরোধীরা গালাগালি ও নিন্দাবাদের মাধ্যমে তোমাদের অভ্যর্থনা করছে এবং সারাদেশে তোমাদের বদনাম করার জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের তুফান সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু সে সময় দূরে নয় যখন সারা দুনিয়ায় তোমাদের প্রশংসা শ্রুত হবে এবং আখেরাতেও তোমরা সমগ্র সৃষ্টির প্রশংসার অধিকারী হবে। কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতকারীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াও এ প্রশংসনীয় মর্যাদারই একটি অংশ।

৯৯. এ দোয়ার নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, হিজরতের সময় তখন একেবারে আসন্ন হয়ে উঠেছিল তাই বলা হয়েছে, তোমাদের এ মর্মে দোয়া করা উচিত যে, সত্যতা ও ন্যায়নিষ্ঠা যেন কোনক্রমেই তোমাদের হাতছাড়া না হয়। যেখান থেকেই বের হও সত্যতা, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায় পরায়ণতার খাতিরেই বের হও এবং যেখানেই যাও সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে যাও।

১০০ অর্থাৎ তুমি নিজেই আমাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দান করো অথবা কোন রাষ্ট্র ক্ষমতাকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যাতে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে আমি

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ
مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ
اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ
وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۗ
فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

আর ঘোষণা করে দাও, "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মিথ্যার তো বিলুপ্ত হবারই কথা।"[১০১]

আমি এই কুরআনের অবতরণ প্রক্রিয়ায় এমনসব বিষয় অবতীর্ণ করছি যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং জালেমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।[১০২] মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, যখন আমি তাকে নিয়ামত দান করি তখন সে গর্ব করে ও পিঠ ফিরিয়ে নেয় এবং যখন সামান্য বিপদের মুখোমুখি হয় তখন হতাশ হয়ে যেতে থাকে। হে নবী! এদেরকে বলে দাও, "প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে কাজ করছে, এখন একমাত্র তোমাদের রবই ভাল জানেন কে আছে সরল সঠিক পথে।"

দুনিয়ার বিকৃত জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও পাপের সয়লাব রুখে দিতে পারি এবং তোমার ন্যায় বিধান জারি করতে সক্ষম হই। হাসান বাস্‌রী ও কাতাদাহ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের ন্যায় মহান তাফসীরকারগণও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও এরি সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ

"আল্লাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে এমনসব জিনিসের উচ্ছেদ ঘটান কুরআনের মাধ্যমে যেগুলোর উচ্ছেদ ঘটান না।"

এ থেকে জানা যায়, ইসলাম দুনিয়ায় যে সংশোধন চায় তা শুধুমাত্র ওয়াজ–নসিহতের মাধ্যমে হতে পারে না বরং তাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতারও প্রয়োজন হয়। তারপর আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর নবীকে এ দোয়া শিখিয়েছেন তখন এ থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তী আইন প্রবর্তন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দণ্ডবিধি জারী করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা হাসিল করার প্রত্যাশা করা এবং এ জন্য প্রচেষ্টা

চালানো শুধু জায়েযই নয় বরং কাংখিত ও প্রশংসিতও এবং অন্যদিকে যারা এ প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা ও দুনিয়াদারী বলে আখ্যায়িত করে তারা ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাহলে তাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা বলা যায়। কিন্তু আল্লাহর দীনের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশা করা বৈষয়িক স্বার্থ পূজা নয় বরং আল্লাহর আনুগত্যের প্রত্যক্ষ দাবী।

১০১. এ ঘোষণা এমন এক সময় করা হয়েছিল যখন বিপুল সংখ্যক মুসলমান মক্কা ত্যাগ করে হাবশায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাদবাকি মুসলমানরা চরম অসহায় ও মজলুম অবস্থার মধ্যে মক্কা ও আশপাশের এলাকায় জীবন যাপন করছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের অবস্থাও সব সময় বিপদ সংকুল ছিল। সে সময় বাহ্যত বাতিলেরই রাজত্ব চলছিল। হকের বিজয়ের কোন দূরবর্তী সম্ভাবনাও কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম দেয়া হলো, তুমি বাতিল পন্থীদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দাও যে, হক এসে গেছে এবং বাতিল খতম হয়ে গেছে। এ সময় এ ধরনের ঘোষণা লোকদের কাছে নিছক কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি। তারা একে ঠাট্টা–মস্করা মনে করে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপর মাত্র ৯টি বছর অতিক্রান্ত না হতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীর বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন এবং কা'বা ঘরে প্রবেশ করে সেখানে তিনশো ষাটটি মূর্তির আকারে যে বাতিলকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল তাকে খতম করে দিলেন। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স) কা'বার মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ –

১০২. অর্থাৎ যারা এ কুরআনকে নিজেদের পথপ্রদর্শক এবং নিজেদের জন্য আইনের কিতাব বলে মেনে নেয় তাদের জন্য তো এটি আল্লাহর রহমত এবং তাদের যাবতীয় মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও তামাদ্দুনিক রোগের নিরাময়। কিন্তু যেসব জালেম একে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পথনির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে এ কুরআন তাদেরকে এর নাযিল হবার বা একে জানার আগে তারা যে অবস্থায় ছিল তার ওপরও টিকে থাকতে দেয় না। বরং তাদেরকে আরো বেশী ক্ষতির মধ্যে ঠেলে দেয়। এর কারণ, যতদিন কুরআন আসেনি অথবা যতদিন তারা কুরআনের সাথে পরিচিত হয়নি ততদিন তাদের ক্ষতি ছিল নিছক মূর্খতা ও অজ্ঞতার ক্ষতি। কিন্তু যখন কুরআন তাদের সামনে এসে গেলো এবং সে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল তখন তাদের ওপর আল্লাহর দাবী অকাট্যভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়ে গেলো। এখন যদি তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে গোমরাহীর ওপর অবিচল থাকার জন্য জোর দেয় তাহলে এর অর্থ হয় তারা অজ্ঞ নয় বরং জালেম ও বাতিল পন্থী এবং সত্যের প্রতি বিরূপ। এখন তাদের অবস্থা হবে এমন ব্যক্তির মতো যে বিষ ও বিষের প্রতিশেধক উভয়টি দেখে বিষকে বেছে নেয়। নিজেদের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার জন্য এখন তারা নিজেরাই হয় পুরোপুরি দায়ী এবং এরপর তারা যে কোন পাপ করে তার পূর্ণ শাস্তির অধিকারীও তারাই

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم
مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ
عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ
فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

১০ রুকু'

এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, "এই রূহ আমার রবের হুকুমে আসে কিন্তু তোমরা সামান্য জ্ঞানই লাভ করেছো।"[১০৩] আর হে মুহাম্মাদ! আমি চাইলে তোমার কাছ থেকে সবকিছুই ছিনিয়ে নিতে পারতাম, যা আমি অহীর মাধ্যমে তোমাকে দিয়েছি, তারপর তুমি আমার মোকাবিলায় কোন সহায়ক পাবে না, যে তা ফিরিয়ে আনতে পারে। এই যে যা কিছু তুমি লাভ করেছো, এসব তোমার রবের অনুগ্রহ, আসলে তাঁর অনুগ্রহ তোমার প্রতি অনেক বড়।[১০৪] বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোন একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।[১০৫]

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার করার ওপরই অবিচল থাকে।

হয়। এটি অজ্ঞতার নয় বরং জেনে শুনে দুষ্টামি ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতি এবং অজ্ঞতার ক্ষতির চাইতে এর পরিমাণ বেশী হওয়া উচিত। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট তাৎপর্যবহ বাক্যের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَّكَ وَعَلَيْكَ অর্থাৎ কুরআন হয় তোমার সপক্ষে প্রমাণ আর নয়তো তোমার বিপক্ষে প্রমাণ।

১০৩. সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে এখানে রূহ মানে প্রাণ। অর্থাৎ লোকেরা জীবনীশক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল যে,

এর প্রকৃত স্বরূপ কি এবং এর জবাবে বলা হয়েছে, এটি আল্লাহর হুকুমে আসে। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে আমি কোনক্রমেই সম্মত নই। কারণ এ অর্থ একমাত্র তখনই গ্রহণ করা যেতে পারে যখন পূর্বাপর আলোচনার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে এবং বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে এ আয়াতকে একটি একক বাক্য হিসেবে নেয়া হবে। নয়তো বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে রূহকে প্রাণ অর্থে গ্রহণ করার ফলে আয়াতে মারাত্মক ধরনের সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এ বিষয়টির কোন যুক্তিসংগত কারণ বুঝা যায় না যে, যেখানে তিনটি আয়াতে কুরআনের নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র হবার এবং কুরআন অমান্যকারীদের জালেম ও নিয়ামত অস্বীকারকারী হবার কথা বলা হয়েছে এবং যেখানে পরবর্তী আয়াতগুলো আবার কুরআনের আল্লাহর কালাম হবার ওপর প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেখানে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ বিষয়বস্তু এসে গেছে যে, প্রাণীদের মধ্যে প্রাণ আসে আল্লাহর হুকুমে?

আলোচনার যোগসূত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিচার করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এখানে রূহ মানে "অহী" বা অহী বহনকারী ফেরেশ্‌তাই হতে পারে। মুশরিকদের প্রশ্ন আসলে এ ছিল যে, কুরআন তুমি কোথায় থেকে আনো? একথায় আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মাদ! তোমাকে লোকেরা রূহ অর্থাৎ কুরআনের উৎস অথবা কুরআন লাভ করার মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে বলে দাও, এ রূহ আসে আমার রবের হুকুমে। কিন্তু তোমাদের জ্ঞান এত কম যে, তোমরা মানুষের বাণী এবং আল্লাহর অহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত বাণীর মধ্যে ফারাক করতে পারো না এবং এ বাণীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছো যে, কোন মানুষ এটি তৈরী করছে। শুধু যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভাষণের সাথে আয়াতের যোগসূত্র রক্ষা করার প্রয়োজনেই এ ব্যাখ্যা প্রাধান্য লাভের যোগ্য তা নয় বরং কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এসব শব্দ সহকারেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ

يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

"তিনি নিজের হুকুমে নিজের যে বান্দার ওপর চান রূহ নাযিল করেন, যাতে লোকদের একত্র হবার দিন সম্পর্কে সে সতর্ক করে দিতে পারে।" (১৫ আয়াত)

সূরা শূরায় বলা হয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

"আর এভাবেই আমি নিজের হুকুমে তোমার প্রতি একটি রূহ পাঠিয়েছি, তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি।" (৫২ আয়াত)

পূর্ববর্তীদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা (র) ও হাসান বাসূরীও (র) এ ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। ইবনে জারীর এ ব্যাখ্যাকে কাতাদার বরাত দিয়ে ইবনে আব্বাসের উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি একটি অদ্ভুত কথা লিখেছেন যে, ইবনে আব্বাস গোপনে এ মত ব্যক্ত করতেন। অন্যদিকে তাফসীরে রূহুল মা'আনী–এর লেখক হাসান ও কাতাদার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "রূহ বলতে জিব্রীলকে বুঝানো হয়েছে এবং প্রশ্ন আসলে এ ছিল যে, তা কিভাবে নাযিল হয় এবং কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে অহী প্রক্ষিপ্ত হয়।"

১০৪. বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে কাফেরদেরকে কষ্ট দেয়া। কারণ তারা বলতো, কুরআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের তৈরী বা গোপনে অন্য কোন লোকের কাছ থেকে শেখানো বাণী। তাদেরকে বলা হচ্ছে ঃ এ বাণী পয়গম্বর রচনা করেননি বরং আমি প্রদান করেছি এবং যদি আমি এ বাণী ছিনিয়ে নিই তাহলে এ ধরনের বাণী রচনা করে নিয়ে আসার ক্ষমতা পয়গম্বরের নেই। তাছাড়া দ্বিতীয় কোন শক্তিও নেই যে এ ব্যক্তিকে এ ধরনের মহাশক্তিধর কিতাব পেশ করার যোগ্য করে তুলতে পারে।

১০৫. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের আরো তিন জায়গায় এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারার ৩ রুকূ', সূরা ইউনুসের ৪ রুকূ' এবং সূরা হূদের ২ রুকূ'তে এ চ্যালেঞ্জ এসেছে। সামনে সূরা তূরের ২ রুকূ'তেও এ বিষয়বস্তু আসছে। এসব জায়গায় কাফেরদের যে অপবাদের জবাবে একথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কুরআন রচনা করেছেন এবং অযথা এটাকে আল্লাহর কালাম বলে পেশ করছেন। এ ছাড়াও সূরা ইউনুসের ১৬ আয়াতে এ অপবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّوْشَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

"হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলো, আমি তোমাদের এ কুরআন শুনাবো এটা যদি আল্লাহ না চাইতেন, তাহলে আমি কখনোই শুনাতে পারতাম না বরং তোমাদের এর খবরও দিতে পারতাম না। আমি তো তোমাদের মধ্যেই জীবনের সুদীর্ঘকাল কাটিয়ে আসছি। তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?"

এ আয়াতগুলোতে কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম হবার সপক্ষে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তিন ধরনের ঃ

এক ঃ এ কুরআন স্বীয় ভাষা, বর্ণনা পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, আলোচনা, শিক্ষা ও গায়েবের খবর পরিবেশনের দিক দিয়ে একটি মু'জিযা। এর নজির উপস্থাপন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তোমরা বলছো একজন মানুষ এটা রচনা করেছে। কিন্তু আমি বলছি, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মিলেও এ ধরনের একটি কিতাব রচনা করতে পারবে না। বরং মুশরিকরা যে জিনদেরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছে এবং এ কিতাব যাদের মাবুদ হবার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আঘাত হানছে তারাও যদি কুরআন অস্বীকারকারীদেরকে সাহায্য করার জন্য একাট্টা হয়ে যায় তাহলে তারাও এদেরকে এ কুরআনের সমমানের একটি কিতাব রচনা করে দিয়ে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার যোগ্য করতে পারবে না।

দুই ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ তোমাদের মধ্যে বাইর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। বরং এ কুরআন নাযিলের পূর্বেও ৪০ বছর তোমাদের মধ্যেই বসবাস করেছেন। নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগেও কি কখনো তোমরা তাঁর মুখে এই ধরনের কালাম এবং এই ধরনের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সম্বলিত বাণী শুনেছিলে? যদি না শুনে থাকো এবং নিশ্চিতভাবেই শুনোনি তাহলে কোন ব্যক্তির ভাষা, চিন্তাধারা,

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

তারা বলে, "আমরা তোমার কথা মানবো না যতক্ষণ না তুমি ভূমি বিদীর্ণ করে আমাদের জন্য একটি ঝরণাধারা উৎসারিত করে দেবে। অথবা তোমার খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান হবে এবং তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করে দেবে নদী–নালা। অথবা তুমি আকাশ ভেংগে টুকরো টুকরো করে তোমার হুমকি অনুযায়ী আমাদের ওপর ফেলে দেবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশ্‌তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবে। অথবা তোমার জন্য সোনার একটি ঘর তৈরী হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে এবং তোমার আরোহণ করার কথাও আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি একটি লিখিত পত্র আনবে, যা আমরা পড়বো।"— হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, পাক–পবিত্র আমার পরওয়ারদিগার, আমি কি একজন বাণীবাহক মানুষ ছাড়া অন্য কিছু?[১০৬]

তথ্যজ্ঞান এবং চিন্তা ও বর্ণনা ভংগীতে হঠাৎ রাতারাতি এ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে না, একথা কি তোমরা বুঝতে পারছো?

তিন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে দিয়ে কোথাও অদৃশ্য হয়ে যান না বরং তোমাদের মধ্যেই থাকেন। তোমরা তাঁর মুখে কুরআন শুনে থাকো এবং অন্যান্য আলোচনা ও বক্তৃতাও শুনে থাকো। কুরআনের কালাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কালামের ভাষা ও বর্ণনা ভংগীর মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে কোন এক ব্যক্তির এ ধরনের দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইল কোনক্রমে হতেই পারে না। এ পার্থক্যটা শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজের দেশের লোকদের মধ্যে বাস করতেন তখনই ছিল না বরং আজো হাদীসের কিতাবগুলোর মধ্যে তাঁর শত শত উক্তি ও ভাষণ অবিকৃত রয়েছে এগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। এগুলোর ভাষা ও বর্ণনাভংগীর সাথে কুরআনের ভাষা ও বর্ণনা–

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

১১ রুকূ'

লোকদের কাছে যখনই কোন পথনির্দেশ আসে তখন তাদের একটা কথাই তাদের ঈমান আনার পথ রুদ্ধ করে দেয়। কথাটা এই যে, "আল্লাহ কি মানুষকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?"[১০৭] তাদেরকে বলো, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তভাবে চলাফেরা করতো তাহলে নিশ্চয়ই আমি কোন ফেরেশতাকেই তাদের কাছে রসূল বানিয়ে পাঠাতাম।[১০৮]

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও, আমারও তোমাদের শুধু একমাত্র আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং সবকিছু দেখছেন।[১০৯]

যাকে আল্লাহ পথ দেখান সে-ই পথ লাভ করে এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি তাঁকে ছাড়া আর কোন সহায়ক ও সাহায্যকারী পেতে পারো না।[১১০] এ লোকগুলোকে আমি কিয়ামতের দিন উপুড় করে টেনে আনবো অন্ধ, বোবা ও বধির করে।[১১১] এদের আবাস জাহান্নাম। যখনই তার আগুন স্তিমিত হতে থাকবে আমি তাকে আরো জোরে জ্বালিয়ে দেবো।

ভংগীর এত বেশী পার্থক্য লক্ষণীয় যে, ভাষা ও সাহিত্যের কোন উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক এ দু'টিকে এক ব্যক্তির কালাম বলে দাবী করতে পারেন না।

১০৬. মু'জিযা দাবী করার একটি জবাব এর আগে ৬ রুকূ'র وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ আয়াতের মধ্যে এসে গেছে। এখানে এ দাবীর দ্বিতীয় জবাব দেয়া হয়েছে। এ

সংক্ষিপ্ত জবাবটির মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের অতুলনীয় অলংকার। বিরোধীদের দাবী ছিল, যদি তুমি আল্লাহর নবী হয়ে থাকো তাহলে যমীনের দিকে ইশারা করো এবং তার ফলে অকস্মাৎ একটি ঝরণাধারা প্রবাহিত হোক, অথবা এখনই একটি সবুজ শ্যামল বাগান তৈরী হয়ে যাক এবং তার মধ্যে নদীনালা বয়ে চলুক। আকাশের দিকে ইশারা করো এবং সংগে সংগেই আকাশ ভেংগে চৌচির হয়ে তোমার বিরোধিতাকারীদের ওপর পড়ুক। একটা ফুঁক দাও এবং চোখের পলকে একটি সোনার প্রাসাদ গড়ে উঠুক। একটা আওয়াজ দাও এবং দেখতে না দেখেতেই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা সামনে এসে দাঁড়াক এবং তাঁরা সাক্ষ দিক যে, আমরা মুহাম্মাদকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি। আমাদের চোখের সামনে আকাশে উঠে যাও এবং আল্লাহর কাছ থেকে একটি পত্র আমাদের নামে লিখিয়ে আনো। এ পত্রটি আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করবো এবং নিজেদের চোখে দেখে পড়বো।—এসব লম্বা চওড়া দাবী দাওয়ার জবাবে একথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, "এদেরকে বলে দাও, আমার পরওয়ারদিগার পাক–পবিত্র! আমি একজন বাণীবাহক ছাড়া কি অন্য কিছু?" অর্থাৎ নির্বোধের দল! আমি কি আল্লাহ হবার দাবী করেছিলাম? তাহলে তোমরা কেন আমার কাছে এ দাবী করছো? আমি কবে তোমাদের বলেছিলাম, আমি সর্বশক্তিমান? আমি কবে বলেছিলাম, এ পৃথিবী ও আকাশে আমার শাসন চলছে? আমার দাবী তো প্রথম দিন থেকে এটিই ছিল যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাণী বহনকারী একজন মানুষ। তোমাদের যদি যাচাই করতে হয় তাহলে আমার বাণী যাচাই করো। ঈমান আনতে হলে এ বাণীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা যাচাই করে ঈমান আনো। আর অস্বীকার করতে হলে এ বাণীর মধ্যে কোন ত্রুটি বের করে দেখাও। আমার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে হলে একজন মানুষ হিসেবে আমার জীবন, চরিত্র ও কার্যকলাপ দেখো। এ সবকিছু বাদ দিয়ে তোমরা আমার কাছে এ যমীন চিরে ফেলা এবং আকাশ ভেংগে ফেলার কি সব উদ্ভট দাবী নিয়ে এসেছো? নবুওয়াতী কাজের সাথে এগুলোর কি সম্পর্ক?

১০৭. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা এ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকে যে, মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না। তাই যখন কোন রসূল এসেছেন এবং তারা দেখেছে তিনি পানাহার করছেন, তাঁর স্ত্রী–সন্তানাদি আছে, তিনি রক্ত–মাংসের মানুষ তখন তারা ফায়সালা দিয়ে বসেছে যে, এ ব্যক্তি রসূল নয়, কারণ এতো মানুষ। আর তিনি চলে যাবার দীর্ঘকাল পর তাঁর ভক্তদের মধ্যে এমনসব লোক জন্ম নিতে থাকে যারা বলতে থাকে, তিনি মানুষ ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন রসূল। ফলে কেউ তাঁকে আল্লাহ বানিয়েছে, কেউ বানিয়েছে আল্লাহর পুত্র, আবার কেউ বলেছে আল্লাহ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। মোটকথা মানবিক সত্তা ও নবুওয়াতী সত্তার একই সত্তার মধ্যে একত্র হওয়া হামেশা মূর্খদের কাছে একটি হেঁয়ালি হয়েই থেকেছে।

১০৮. অর্থাৎ মানুষের কাছে গিয়ে পয়গাম শুনিয়ে দেয়া হলো, শুধু এতটুকুই নবীর কাজ নয়। বরং এ পয়গাম অনুযায়ী মানব জীবনের সংশোধন করাও তাঁর কাজ। তাঁকে এ পয়গামের মূলনীতিগুলোকে মানবিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে প্রয়োগ করতে হয়। নিজের জীবনেও এ নীতিগুলো বাস্তবায়িত করতে হয়। যে অসংখ্য মানুষ এ পয়গাম শুনার ও বুঝার চেষ্টা করে তাদের মনে যেসব জটিল প্রশ্ন জাগে সেগুলোর জবাব তাঁকে

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

এটা হচ্ছে তাদের এ কাজের প্রতিদান যে, তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে এবং বলেছে "যখন আমরা শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো তখন কি আবার আমাদের নতুন করে পয়দা করে উঠানো হবে?" তারা কি খেয়াল করেনি, যে আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার অবশ্যই ক্ষমতা রাখেন? তিনি তাদের হাশরের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন, যার আগমন অবধারিত। কিন্তু জালেমরা জিদ ধরেছে যে তারা তা অস্বীকারই করে যাবে।

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, যদি আমার রবের রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের অধীনে থাকতো তাহলে তোমরা ব্যয় হয়ে যাবার আশংকায় নিশ্চিতভাবেই তা ধরে রাখতে। সত্যিই মানুষ বড়ই সংকীর্ণমনা।[১১২]

দিতে হয়। যারা এ পয়গাম গ্রহণ করে, এর শিক্ষাবলীর ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে সংগঠিত করার ও প্রশিক্ষণ দেবার দায়িত্বও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। বিকৃতি ও ধ্বংসের সমর্থক শক্তিগুলোকে দাবিয়ে দেবার এবং যে সংস্কারের কর্মসূচী দিয়ে আল্লাহ নিজের নবী পাঠিয়েছেন তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁকে অস্বীকার, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলায় প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে হয়। এসব কাজ যখন মানুষের মধ্যেই করতে হয় তখন এগুলোর জন্য মানুষ ছাড়া আর কাকে পাঠানো যায়? ফেরেশতা তো বড় জোর এসে পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে যেতো। মানুষের মধ্যে মানুষের মতো বসবাস করে মানুষের মতো কাজ করা এবং তারপর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের জীবনে সংস্কার সাধন করে দেখিয়ে দেয়া কোন ফেরেশতার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একজন মানুষই ছিল এ কাজের উপযোগী।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِذْ جَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১২ রুকূ'

আমি মূসাকে নয়টি নিদর্শন দিয়েছিলাম, সেগুলো সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।[১১৩] *এখন নিজেরাই তোমরা বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখে নাও যখন সেগুলো তাদের সামনে এলো তখন ফেরাউন তো একথাই বলেছিল, "হে মূসা! আমার মতে তুমি অবশ্যই একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।"*[১১৪]

১০৯. অর্থাৎ যেসব বহুবিধ পদ্ধতিতে আমি তোমাদের বুঝাচ্ছি এবং তোমাদের অবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছি তাও আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আমার বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছো তাও আল্লাহ দেখছেন। এসব কিছুর পর শেষ পর্যন্ত ফায়সালা তাঁকেই করতে হবে। তাই শুধুমাত্র তাঁর জানা ও দেখাই যথেষ্ট।

১১০. অর্থাৎ যার ভ্রষ্টতা প্রীতি ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তার জন্য সঠিক পথের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং যাকে আল্লাহ এমনসব ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন যেদিকে সে যেতে চাচ্ছিল, তাকে এখন সঠিক পথের দিকে নিয়ে আসার ক্ষমতা আর কার আছে? যে ব্যক্তি সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিথ্যার ওপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে যেতে চেয়েছে এবং যার এ দুর্মতি দেখে আল্লাহও তার জন্য এমন সব কার্যকারণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে সত্যের প্রতি তার ঘৃণা এবং মিথ্যার প্রতি আসক্তি আরো বেশী বেড়ে গেছে, তাকে দুনিয়ার কোন্ শক্তি মিথ্যা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে এবং সত্যের ওপর বহাল করতে পারে? যে নিজে ভুল পথে চলতে চায় তাকে জোর করে সঠিক পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নিয়ম নয়। আর মানুষের মনের পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা আল্লাহর ছাড়া আর কারো নেই।

১১১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যে অবস্থায় ছিল, সত্যকে দেখতে পেতো না, সত্য কথা শুনতে পেতো না এবং সত্য কথা বলতো না, ঠিক তেমনিভাবেই কিয়ামতেও তাদেরকে উঠানো হবে।

১১২. ইতিপূর্বে ৬ রুকূ'র وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আয়াতে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল এখানে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা যেসব মনস্তাত্বিক কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত অস্বীকার করতো তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ ছিল যে, এভাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব তাদের মেনে নিতে হতো। আর সাধারণত মানুষ সমকালীন ও কোন পরিচিত–সহযোগীর শ্রেষ্ঠত্ব খুব কমই মেনে নিতে প্রস্তুত হয়। এ প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, যাদের কৃপণতার অবস্থা হচ্ছে এই যে, কারো যথার্থ মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেও যারা মনে ব্যথা পায়, তাদের হাতে যদি আল্লাহ নিজের রহমতের চাবিগুলো দিয়ে দেন তাহলে তারা কাউকে একটি কানাকড়িও দেবে না।

১১৩. এখানে আবার মক্কার কাফেরদের মু'জিযা পেশ করার দাবীর জবাব দেয়া হয়েছে এবং এটি তৃতীয় জবাব। কাফেররা বলতো, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতক্ষণ না তুমি অমুক অমুক কাজগুলো করে দেখাবে। জবাবে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের পূর্বে ফেরাউনকে এমনিতর সুস্পষ্ট মু'জিযা এক দু'টি নয় পরপর ৯টি দেখানো হয়েছিল। তারপর তোমরা জানো মেনে নেবার প্রবণতাই যার ছিল না সে এগুলো দেখে কি বললো? আর এটাও জানো যে, মু'জিযা দেখার পরও যখন সে নবীকে অস্বীকার করলো তখন তার পরিণতি কি হলো?

এখানে যে ন'টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে এর আগে সূরা আরাফেও সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) লাঠি, যা সাপে পরিণত হতো। (২) সাদা হাত, যা বগলের ভেতর থেকে বের করার পর সূর্যের মতো চমকাতে থাকতো। (৩) যাদুকরদের যাদুকে প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাভূত করা। (৪) এক ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হওয়া এবং তারপর একের পর এক (৫) তুফান, (৬) পংগপাল, (৭) শস্যকীট, (৮) ব্যাং এবং (৯) রক্তের আপদ নাযিল হওয়া।

১১৪. মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে উপাধি দিতো এটি সেই একই উপাধি। এ সূরার ৫ রুকূ'তে এদের এ উক্তিও এসেছে ঃ

اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا (তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকের পেছনে ছুটে চলছো।) এখন এদেরকে বলা হচ্ছে, ঠিক এ একই উপাধিতে ফেরাউন মূসা আলাইহিস সালামকে ভূষিত করেছিল।

এখানে আর একটি আনুসংগিক বিষয়ও রয়েছে। সেদিকে ইংগিত করে দেয়া আমি জরুরী মনে করি। বর্তমান যুগে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী হাদীসের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠিয়েছে তার মধ্যে একটি আপত্তি হচ্ছে এই যে, হাদীসের বক্তব্য মতে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল। অথচ কুরআনের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে, একজন যাদু প্রভাবিত ব্যক্তি এটা ছিল কাফেরদের একটি মিথ্যা অপবাদ। হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, এভাবে হাদীস বর্ণনাকারীগণ কুরআনকে মিথ্যুক এবং মক্কার কাফেরদেরকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু এখানে দেখুন কুরআনের দৃষ্টিতে হযরত মূসার ওপরও ফেরাউনের এ একই মিথ্যা দোষারোপ ছিল যে, আপনি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। আবার কুরআন নিজেই সূরা ত্বা-হা'য় বলছে ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى – فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى –

"যখন যাদুকররা নিজেদের দড়াদড়ি ছুঁড়ে দিল তখন অকস্মাৎ তাদের যাদুর ফলে মূসার মনে হতে লাগলো যে তাদের লাঠি ও দড়িগুলো দৌড়ে চলেছে। কাজেই মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গেলো।"

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿۱۰۲﴾

মূসা এর জবাবে বললো, "তুমি খুব ভাল করেই জানো এ প্রজ্ঞাময় নিদর্শনগুলো আকাশ ও পৃথিবীর রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেননি[১১৫] আর আমার মনে হয় হে ফেরাউন! তুমি নিশ্চয়ই একজন হতভাগা ব্যক্তি।[১১৬]

এ শব্দগুলো কি সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশ করছে না যে, হযরত মূসা সে সময় যাদু প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন? হাদীস অস্বীকারকারীগণ কি এ প্রসংগেও বলতে প্রস্তুত আছেন যে, কুরআন নিজেই নিজেকে মিথ্যা এবং ফেরাউনের মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে?

আসলে এ ধরনের আপত্তি উত্থাপনকারীরা জানেন না যে, মক্কার কাফেররা ও ফেরাউন কোন্ অর্থে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত মূসাকে 'যাদুগ্রস্ত' বলতো। তাদের বক্তব্য ছিল, কোন শত্রু যাদু করে তাঁদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে এবং এ পাগলামির প্রভাবে তারা নবুওয়াতের দাবী করছেন এবং একটি সম্পূর্ণ অভিনব বাণী শুনাচ্ছেন। কুরআন তাদের এ অপবাদকে মিথ্যা গণ্য করেছে। তবে সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তির শরীরে বা শরীরের কোন অনুভূতিতে যাদুর প্রভাব পড়ার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। এটা ঠিক এ রকম ব্যাপার যেমন কারোর গায়ে পাথর মারলে সে আহত হয়। কাফেরদের অপবাদ এ ধরনের ছিল না। কুরআনও এ ধরনের অপবাদের প্রতিবাদ করেনি। এ ধরনের কোন সাময়িক প্রতিক্রিয়ায় নবীর মর্যাদা প্রভাবিত হয় না। নবীর ওপর যদি বিষের প্রভাব পড়তে পারে, নবী যদি আহত হতে পারেন, তাহলে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাবও পড়তে পারে। এর ফলে নবুওয়াতের মর্যাদা বিনষ্ট হতে পারে কি কারণে? নবীর মন-মস্তিষ্ক যদি যাদুর প্রভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, এমনকি তিনি যাদুর প্রভাবাধীনেই কথা বলতে ও কাজ করতে থাকেন তাহলেই এর ফলে নবুওয়াতের মর্যাদা বিনষ্ট হতে পারে। সত্য বিরোধীরা হযরত মূসা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এ অপবাদ দিতো এবং কুরআন এরই প্রতিবাদ করেছে।

১১৫. একথা হযরত মূসা (আ) এ জন্য বলেন যে, কোন দেশে দুর্ভিক্ষ লাগা বা লাখো বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় ধ্বংসের বিভীষিকা নিয়ে পংগপালের মতো ব্যাঙ বের হয়ে আসা অথবা শস্য গুদামগুলোয় ব্যাপকভাবে পোকা লেগে যাওয়া এবং এ ধরনের অন্যান্য জাতীয় দুর্যোগ দেখা দেয়া কোন যাদুকরের যাদুর বলে বা কোন মানুষের ক্ষমতায় সম্ভবপর ছিল না। তারপর যখন প্রত্যেকটি দুর্যোগ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত মূসা ফেরাউনকে এ বলে নোটিশ দিতেন যে, তোমার হঠকারিতা থেকে বিরত না হলে এ দুর্যোগটি তোমার রাজ্যে চেপে বসবে এবং ঠিক তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সেই দুর্যোগটি সমগ্র রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলতো, তখন এ অবস্থায় কেবলমাত্র একজন পাগল ও চরম হঠকারী ব্যক্তিই একথা বলতে পারতো যে, এ বিপদ ও দুর্যোগগুলো পৃথিবী ও আকাশ-মণ্ডলীর একচ্ছত্র অধিপতি ছাড়া অন্য কেউ নাযিল করেছে।

فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا
مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ
وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

শেষ পর্যন্ত ফেরাউন মূসা ও বনী ইস্‌রাঈলকে দুনিয়ার বুক থেকে উৎখাত করার সংকল্প করলো। কিন্তু আমি তাকে ও তার সংগী-সাথীদেরকে এক সাথে ডুবিয়ে দিলাম এবং এরপর বনী ইস্‌রাঈলকে বললাম, এখন তোমরা পৃথিবীতে বসবাস করো,[১১৭] তারপর যখন আখেরাতের প্রতিশ্রুতির সময় এসে যাবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে এক সাথে হাযির করবো।

এ কুরআনকে আমি সত্য সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্য সহকারেই এটি নাযিল হয়েছে। আর হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমি এ ছাড়া আর কোন কাজে পাঠাইনি যে, (যে মেনে নেবে তাকে) সুসংবাদ দিয়ে দেবে এবং (যে মেনে নেবে না তাকে) সাবধান করে দেবে।[১১৮] আর এ কুরআনকে আমি সামান্য সামান্য করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনিয়ে দাও এবং তাকে আমি (বিভিন্ন সময়) পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি।[১১৯] হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও, তোমরা একে মানো বা না মানো, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে[১২০] তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা আনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে, "পাক-পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হয়েই থাকে।"[১২১]

১১৬. অর্থাৎ আমি তো যাদুগ্রস্ত নই, তবে তোমার ওপর নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্যের পদাঘাত হয়েছে। আল্লাহর এ নিদর্শনগুলো একের পর এক দেখার পরও তোমার নিজের

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ (১০৯) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (১১০) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (১১১)

এবং তারা নত মুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের দীনতা আরো বেড়ে যায়।[১২২]

হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ বা রহমান যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সবই ভাল নাম।[১২৩] *আর নিজের নামায খুব বেশী উচ্চ কন্ঠেও পড়বে না, বেশী ক্ষীণ কন্ঠেও না, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি মধ্যম পর্যায়ের কন্ঠস্বর অবলম্বন করবে।*[১২৪] *আর বলো, "সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোন পুত্রও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীকও হয়নি এবং তিনি এমন অক্ষমও নন যে, কেউ তাঁর সাহায্যকারী ও নির্ভর হবে।"*[১২৫] *আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।*

হঠকারিতার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, তোমার কপাল পুড়েছে।

১১৭. এটিই হচ্ছে এ কাহিনীটি বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য। মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরবের মাটি থেকে উৎখাত করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছিল। তাই তাদেরকে শুনানো হচ্ছে, ফেরাউন এসব কিছু করতে চেয়েছিল মূসা ও বনী ইস্রাঈলের সাথে। কিন্তু কার্যত হয়েছে এই যে, ফেরাউন ও তার সাথীদেরকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীতে মূসা ও তার অনুসারীদেরকে বসবাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন তোমরাও যদি এ একই পথ অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের পরিণামও এর থেকে ভিন্ন কিছু হবে না।

১১৮. অর্থাৎ তোমাদের একথা বলা হয়নি যে, যারা কুরআনের শিক্ষাবলী যাচাই করে হক ও বাতিলের ফায়সালা করতে প্রস্তুত নয় তাদেরকে তোমরা ঝরণাধারা প্রবাহিত করে, বাগান তৈরী করে এবং আকাশ চিরে কোন না কোনভাবে মুমিন বানাবার চেষ্টা করবে। বরং তোমাদের কাজ শুধুমাত্র এতটুকুই ঃ তোমরা লোকদের সামনে হক কথা

পেশ করে দাও, তারপর তাদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দাও, যে একথা মেনে নেবে সে ভাল কাজ করবে এবং যে মেনে নেবে না সে খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১৯. এটি বিরোধীদের একটি সংশয়ের জবাব। তারা বলতো, আল্লাহর পয়গাম পাঠাবার দরকার হলে সম্পূর্ণ পয়গাম এক সংগে পাঠান না কেন? এভাবে থেমে থেমে সামান্য সামান্য পয়গাম পাঠানো হচ্ছে কেন? আল্লাহকেও কি মানুষের মতো ভেবে চিন্তে কথা বলতে হয়? এ সংশয়ী বক্তব্যের বিস্তারিত জবাব সূরা নাহ্‌লের ১৪ রুকূ'র প্রথম দিকের আয়াতগুলোতে দেয়া হয়েছে। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। তাই এখানে এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন বোধ করছি না।

১২০. অর্থাৎ যে আহলি কিতাব গোষ্ঠী আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত এবং যারা তার বাচনভংগীর সাথে পরিচিত।

১২১. অর্থাৎ কুরআন শুনার সাথে সাথেই তারা বুঝতে পারে, যে নবীর আগমনের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী নবীগণের সহীফাসমূহে দেয়া হয়েছিল তিনি এসে গেছেন।

১২২. আহলি কিতাবদের সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল লোকদের এ মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার কথা কুরআন মজীদের বহু জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আলে ইমরান ১২ ও ২০ রুকূ' এবং আল মায়েদার ১১ রুকূ' দেখুন।

১২৩. এটি মুশরিকদের একটি আপত্তির জবাব। তারা এ মর্মে আপত্তি জানিয়েছিল যে, স্রষ্টার নাম "আল্লাহ" এটা আমরা শুনেছিলাম কিন্তু এ "রহমান" নাম কোথায় থেকে আনলে? তাদের মধ্যে যেহেতু আল্লাহর এ নামের প্রচলন ছিল না তাই তারা তাঁর রহমান নাম শুনে নাক সিটকাতো।

১২৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কায় যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবীগণ নামায পড়ার সময় উচ্চকণ্ঠে কুরআন পড়তেন তখন কাফেররা শোরগোল করতো এবং অনেক সময় এক নাগাড়ে গালিগালাজ করতো। এ জন্য হুকুম দেয়া হলো, এমন উচ্চস্বরে পড়ো না যাতে কাফেররা শুনে হৈ-হল্লোড় করতে পারে আবার এমন নিচু স্বরেও পড়ো না যা তোমাদের নিজেদের সাথীরাও শুনতে না পায়। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট অবস্থার সাথে এ হুকুম সম্পৃক্ত ছিল। মদীনায় যখন অবস্থা বদলে গেলো তখন আর এ হুকুম কার্যকর থাকেনি। তবে হাঁ, মুসলমানরা যখনই মক্কার মতো অবস্থার সম্মুখীন হয় তখনই তাদের এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

১২৫. যেসব মুশরিক বিভিন্ন দেবতা ও জ্ঞানী গুণী মহামানবদের সম্পর্কে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ নিজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিভিন্ন বিভাগ এবং নিজের রাজত্বের বিভিন্ন এলাকা তাদের ব্যবস্থাপনায় দিয়ে দিয়েছেন তাদের এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এ বাক্যে রয়েছে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপ। এ অর্থহীন বিশ্বাসটির পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ নিজে তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের বোঝা বহন করতে অক্ষম। তাই তিনি নিজের জন্য কোন সাহায্যকারী ও নির্ভর তালাশ করে বেড়াচ্ছেন। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ অক্ষম নন। তাঁর কোন ডেপুটি, সহকারী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই।

আল কাহ্‌ফ

১৮

নামকরণ

প্রথম রুকূ'র ৯ আয়াত اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ নাম দেবার মানে হচ্ছে এই যে, এটা এমন একটা সূরা যার মধ্যে আল কাহ্‌ফ শব্দ এসেছে।

নাযিলের সময়-কাল

এখান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলো শুরু হচ্ছে। মক্কী জীবনকে আমি চারটি বড় বড় অধ্যায়ে ভাগ করেছি। সূরা আন'আমের ভূমিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ এসে গেছে। এ বিভাগ অনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়টি প্রায় ৫ নববী সন থেকে শুরু হয়ে ১০ নববী সন পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর মোকাবিলায় এ অধ্যায়টির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী অধ্যায় দু'টিতে কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং তাঁর আন্দোলন ও জামায়াতকে বিপর্যস্ত করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপহাস, ব্যাংগ-বিদ্রূপ, আপত্তি, অপবাদ, দোষারোপ, ভীতি প্রদর্শন, লোভ দেখানো ও বিরুদ্ধ প্রচারণার ওপর নির্ভর করছিল। কিন্তু এ তৃতীয় অধ্যায়ে এসে তারা জুলুম, নিপীড়ন, মারধর ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির অস্ত্র খুব কড়াকড়িভাবে ব্যবহার করে। এমনকি বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে দেশ ত্যাগ করে হাবশার দিকে যেতে হয়। আর বাদবাকি মুসলমানদের এবং তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও বংশের লোকদের আবু তালেব গিরি গুহায় পূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কটের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। তবুও এ যুগে আবু তালেব ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) ন্যায় দু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে কুরাইশদের দু'টি বড় বড় শাখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। ১০ নববী সনে এ দু'জনের মৃত্যুর সাথে সাথেই এ অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটে। এরপর শুরু হয় চতুর্থ অধ্যায়। এ শেষ অধ্যায়ে মুসলমানদের মক্কায় জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মুসলমানদের নিয়ে মক্কা ত্যাগ করতে হয়।

সূরা কাহ্‌ফের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মক্কী যুগের এ তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় জুলুম, নিপীড়ন, বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখনো মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করেনি। তখন যেসব মুসলমান নির্যাতিত হচ্ছিল তাদেরকে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী শুনানো হয়, যাতে তাদের হিম্মত বেড়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, ঈমানদাররা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য ইতিপূর্বে কি করেছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরীক্ষা নেবার জন্য আহ্লি কিতাবদের পরামর্শক্রমে তাঁর সামনে যে তিনটি প্রশ্ন করেছিল তার জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। প্রশ্ন তিনটি ছিল ঃ এক, আসহাবে কাহ্ফ কারা ছিলেন? দুই, খিযিরের ঘটনাটি এবং তার তাৎপর্য কি?[১] তিন, যুলকারনাইনের ঘটনাটি কি? এ তিনটি কাহিনীই খৃষ্টান ও ইহুদীদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত ছিল। হিজাযে এর কোন চর্চা ছিল না। তাই আহ্লি কিতাবরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যিই কোন গায়েবী ইল্‌মের মাধ্যম আছে কিনা তা জানার জন্যই এগুলো নির্বাচন করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে কেবল এগুলোর পূর্ণ জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ সংগে এ ঘটনা তিনটিকে সে সময় মক্কায় কুফর ও ইসলামের মধ্যে যে অবস্থা বিরাজ করছিল তার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে দিয়েছেন।

এক ঃ আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে বলেন, এ কুরআন যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করছে তারা ছিলেন তারই প্রবক্তা। তাদের অবস্থা মক্কার এ মুষ্টিমেয় মজলুম মুসলমানদের অবস্থা থেকে এবং তাদের জাতির মনোভাব ও ভূমিকা মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের ভূমিকা থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারপর এ কাহিনী থেকে ঈমানদারদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যদি কাফেররা সীমাহীন ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী হয়ে গিয়ে থাকে এবং তাদের জুলুম-নির্যাতনের ফলে সমাজে একজন মুমিন শ্বাসগ্রহণ করারও অধিকার হারিয়ে বসে তবুও তার বাতিলের সামনে মাথা নত না করা উচিত বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত। এ প্রসংগে আনুসংগিকভাবে মক্কার কাফেরদেরকে একথাও বলা হয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী আখেরাত বিশ্বাসের নির্ভুলতার একটি প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফকে সুদীর্ঘকাল মৃত্যু নিদ্রায় বিভোর করে রাখার পর আবার জীবিত করে তোলেন ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করলে কি হবে, তা আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে নয়।

দুই ঃ মক্কার সরদার ও সচ্ছল পরিবারের লোকেরা নিজেদের জনপদের ক্ষুদ্র নও মুসলিম জামায়াতের ওপর যে জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদের সাথে যে ঘৃণা ও লাঞ্ছনাপূর্ণ আচরণ করছিল আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীর পথ ধরে সে সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এ প্রসংগে একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ জালেমদের সাথে কোন আপোস করবে না এবং নিজের গরীব সাথীদের মোকাবিলায় এ বড় লোকদেরকে মোটেই গুরুত্ব দেবে না। অন্যদিকে এ ধনী ও সরদারদেরকে এ মর্মে নসীহত করা হয়েছে যে, নিজেদের দু'দিনের আয়েশী জীবনের চাকচিক্য দেখে ফুলে যেয়ো না বরং চিরন্তন ও চিরস্থায়ী কল্যাণের সন্ধান করো।

---

১. হাদীসে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল রূহ সম্পর্কে। বনী ইসরাঈলের ১০ রুকূ'তে এর জবাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু সূরা কাহ্ফ ও বনী ইসরাঈলের নাযিলের সময়কালের মধ্যে রয়েছে কয়েক বছরের ব্যবধান। আর সূরা কাহ্ফে দু'টির জায়গায় তিনটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমার মতে, দ্বিতীয় প্রশ্নটি হযরত খিযির সম্পর্কেই ছিল, রূহ সম্পর্কে নয়। খোদ কুরআনেই এমনি একটি ইশারা আছে, তা থেকে আমার এ অভিমতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যাবে। (দেখুন ৬১ টীকা)।

তিন : এ আলোচনা প্রসংগে খিযির ও মূসার কাহিনীটি এমনভাবে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাতে কাফেরদের প্রশ্নের জবাবও এসে গেছে এ সংগে মুমিনদেরকেও সরবরাহ করা হয়েছে সান্তনার সরঞ্জাম। এ কাহিনীতে মূলত যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যেসব উদ্দেশ্য ও কল্যাণকারিতার ভিত্তিতে আল্লাহর এ বিশাল সৃষ্টিজগত চলছে তা যেহেতু তোমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে তাই তোমরা কথায় কথায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করো, এমন কেন হলো? এ–কি হয়ে গেলো? এ–তো বড়ই ক্ষতি হলো! অথচ যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে এখানে যাকিছু হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে এবং বাহ্যত যে জিনিসের মধ্যে ক্ষতি দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত তার ফলশ্রুতিতে কোন না কোন কল্যাণই দেখা যায়।

চার : এরপর যুলকারনাইনের কাহিনী বলা হয়। সেখানে প্রশ্নকারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয় যে, তোমরা তো নিজেদের এ সামান্য সরদারীর মোহে অহংকারী হয়ে উঠেছো অথচ যুলকারনাইনকে দেখো। কত বড় শাসক। কত জবরদস্ত বিজেতা। কত বিপুল বিশাল উপায়–উপকরণের মালিক হয়েও নিজের স্বরূপ ও পরিচিতি বিস্মৃত হননি। নিজের স্রষ্টার সামনে সবসময় মাথা হেঁট করে থাকতেন। অন্যদিকে তোমরা নিজেদের এ সামান্য পার্থিব বৈভব ও ক্ষেত–খামারের শ্যামল শোভাকে চিরস্থায়ী মনে করে বসেছো। কিন্তু তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে মজবুত ও সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করেও মনে করতেন সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করা যেতে পারে, এ প্রাচীরের ওপর নয়। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন এ প্রাচীর শত্রুদের পথ রোধ করতে থাকবে এবং যখনই তাঁর ইচ্ছা ভিন্নতর হবে তখনই এ প্রাচীরে ফাটল ও গর্ত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

এভাবে কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলো তাদের ওপরই পুরোপুরি উল্‌টে দেবার পর বক্তব্যের শেষে আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, বক্তব্য শুরু করার সময় যা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ তাওহীদ ও আখেরাত হচ্ছে পুরোপুরি সত্য। একে মেনে নেয়া, সে অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করা এবং আল্লাহর সামনে নিজেদের জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করার মধ্যেই তোমাদের নিজেদের মংগল। এভাবে না চললে তোমাদের নিজেদের জীবন ধ্বংস হবে এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۞ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۞ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۞ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۞

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোন বক্রতা রাখেননি।[১] একদম সোজা কথা বলার কিতাব, যাতে লোকদেরকে আল্লাহর কঠিন শাস্তি থেকে সে সাবধান করে দেয় এবং ঈমান এনে যারা সৎকাজ করে তাদেরকে সুখবর দিয়ে দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য রয়েছে ভাল প্রতিদান। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা বলে, আল্লাহ কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে ভয় দেখায়।[২] এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের বাপ–দাদারও ছিল না।[৩] তাদের মুখ থেকে বেরুনো একথা অত্যন্ত সাংঘাতিক! তারা নিছক মিথ্যাই বলে।

১. অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোন কথাবার্তা নেই যা বুঝতে পারা যায় না। আবার সত্য ও ন্যায়ের সরল রেখা থেকে বিচ্যুত এমন কোন কথাও নেই যা মেনে নিতে কোন সত্যপন্থী লোক ইতস্তত করতে পারে।

২. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তান–সন্তুতি আছে বলে দাবী করে। এদের মধ্যে রয়েছে খৃষ্টান, ইহুদী ও আরব মুশরিকরা।

৩. অর্থাৎ তাদের এ উক্তি যে, অমুক আল্লাহর পুত্র অথবা অমুককে আল্লাহ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এগুলো তারা এ জন্য বলছে না যে, তাদের আল্লাহর পুত্র হবার বা

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ﴿٨﴾

হে মুহাম্মাদ! যদি এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে দুশ্চিন্তায় তুমি হয়তো এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে।[৪] আসলে পৃথিবীতে এ যা কিছু সাজ সরঞ্জামই আছে এগুলো দিয়ে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্য থেকে কে ভাল কাজ করে। সবশেষে এসবকে আমি একটি বৃক্ষ–লতাহীন ময়দানে পরিণত করবো।[৫]

আল্লাহর কাউকে পুত্র বানিয়ে নেবার ব্যাপারে তারা কিছু জানে। বরং নিছক নিজেদের ভক্তি শ্রদ্ধার বাড়াবাড়ির কারণে তারা একটি মনগড়া মত দিয়েছে এবং এভাবে তারা যে কত মারাত্মক গোমরাহীর কথা বলছে এবং বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কত বড় বেয়াদবী ও মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তার কোন অনুভূতিই তাদের নেই।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে সে সময় যে মানসিক অবস্থার টানাপোড়ন চলছিল এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে যেসব কষ্ট দেয়া হচ্ছিল সে জন্য তাঁর মনে কোন দুঃখ ছিল না। বরং যে দুঃখটি তাঁকে ভিতরে ভিতরে কুরে কুরে খাচ্ছিল সেটি ছিল এই যে, তিনি নিজের জাতিকে নৈতিক অধপতন, ভ্রষ্টাচার ও বিভ্রান্তি থেকে বের করে আনতে চাচ্ছিলেন এবং তারা কোনক্রমেই এ পথে পা বাড়াবার উদ্যোগ নিচ্ছিল না। তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এ ভ্রষ্টতার অনিবার্য ফল ধ্বংস ও আল্লাহর আযাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি তাদেরকে এ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য দিনরাত প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর এ মানসিক অবস্থাকে একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মতো যে আলোর জন্য আগুন জ্বালালো কিন্তু পতংগরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করলো পুড়ে মরার জন্য। সে এদেরকে কোনক্রমে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু এ পতংগরা তার কোন প্রচেষ্টাকেই ফলবতী করতে দেয় না। আমার অবস্থাও অনুরূপ। আমি তোমাদের হাত ধরে টান দিচ্ছি কিন্তু তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়ছো।" (বুখারী ও মুসলিম। আরও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সূরা আশ্ শু'আরা ৩ আয়াত দেখুন)

এ আয়াতে বাহ্যত শুধু এতটুকু কথাই বলা হয়েছে যে, সম্ভবত তুমি এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে। কিন্তু এর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে নবীকে এ মর্মে সান্তনাও দেয়া হয়েছে যে, এদের ঈমান না আনার দায়–দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায় না, কাজেই তুমি

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا أَمَدًا ﴿١٢﴾

তুমি কি মনে করো গুহা[৬] ও ফলক ওয়ালারা[৭] আমার বিস্ময়কর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল?[৮] যখন ক'জন যুবক গুহায় আশ্রয় নিলো এবং তারা বললো : "হে আমাদের রব! তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো এবং আমাদের ব্যাপার ঠিকঠাক করে দাও।" তখন আমি তাদেরকে সেই গুহার মধ্যে থাপড়ে থাপড়ে বছরের পর বছর গভীর নিদ্রায় মগ্ন রেখেছি। তারপর আমি তাদেরকে উঠিয়েছি একথা জানার জন্য যে, তাদের দু'দলের মধ্য থেকে কোন্‌টি তার অবস্থান কালের সঠিক হিসেব রাখতে পারে।

কেন অনর্থক নিজেকে দুঃখে ও শোকে দগ্ধীভূত করছো? তোমার কাজ শুধুমাত্র সুখবর দেয়া ও ভয় দেখানো। লোকদেরকে মুমিন বানানো নয়। কাজেই তুমি নিজের প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাও। যে মেনে নেবে তাকে সুখবর দেবে এবং যে মেনে নেবে না তাকে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

৫. প্রথম আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছিল আর এ দু'টি আয়াতে কাফেরদেরকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সান্তনা বাক্য শুনিয়ে দেবার পর এখন তাঁর অস্বীকারকারীদেরকে সরাসরি সম্বোধন না করেই একথা শুনানো হচ্ছে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে তোমরা এই যেসব সাজ সরঞ্জাম দেখছো এবং যার মন ভুলানো চাকচিক্যে তোমরা মুগ্ধ হয়েছো, এতো নিছক একটি সাময়িক সৌন্দর্য, নিছক তোমাদের পরীক্ষার জন্য এর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। এসব কিছু আমি তোমাদের আয়েশ আরামের জন্য সরবরাহ করেছি, তোমরা এ ভুল ধারণা করে বসেছো। তাই জীবনের মজা লুটে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যের প্রতি তোমরা ভ্রুক্ষেপই করছো না। এ জন্যই তোমরা কোন উপদেশদাতার কথায় কান দিচ্ছো না। কিন্তু আসলে তো এগুলো আয়েশ আরামের জিনিস নয় বরং পরীক্ষার উপকরণ। এগুলোর মাঝখানে তোমাদের বসিয়ে দিয়ে দেখা হচ্ছে, তোমাদের মধ্য থেকে কে তার নিজের আসল স্বরূপ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার এসব মন মাতানো সামগ্রীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে এবং কে তার আসল মর্যাদার (আল্লাহর বন্দেগী) কথা মনে রেখে সঠিক নীতি অবলম্বন

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ⑬ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۟ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ⑭ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ⑮

২ রুকূ'

আমি তাদের সত্যিকার ঘটনা তোমাকে শুনাচ্ছি।[৯] তারা কয়েকজন যুবক ছিল, তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।[১০] আমি সে সময় তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা উঠলো এবং ঘোষণা করলো ঃ "আমাদের রব তো কেবল তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে ডাকবো না। যদি আমরা তাই করি তাহলে তা হবে একেবারেই অনর্থক।" (তারপর তারা পরস্পরকে বললো ঃ) "এ আমাদের জাতি, এরা বিশ্বজাহানের রবকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এরা তাদের মাবুদ হবার সপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনছে না কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

করছে। যেদিন এ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে সেদিনই ভোগের এসব সরঞ্জাম খতম করে দেয়া হবে এবং তখন এ পৃথিবী একটি লতাগুল্মহীন ধূ ধূ প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

৬. আরবী ভাষায় বড় ও বিস্তৃত গুহাকে 'কাহ্ফ' বলা হয় এবং সংকীর্ণ গহ্বরকে বলা হয় 'গার'।

৭. মূল শব্দ হচ্ছে "আর রকীম।" এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। কোন কোন সাহাবী ও তাবেঈর বর্ণনা মতে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাটি যে জনপদে সংঘটিত হয়েছিল সেই জনপদটির নাম ছিল আর রকীম। এটি "আইলাহ" (অর্থাৎ আকাবাহ) ও ফিলিস্তীনের মাঝামাঝি একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। আবার অনেক পুরাতন মুফাস্সির বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, এ নাম দিয়ে গুহা মুখে আসহাবে কাহ্ফের স্মৃতি রক্ষার্থে যে ফলক বা শিলালিপিটি লাগানো হয়েছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর 'তরজমানুল কুরআন' তাফসীর গ্রন্থে প্রথম অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, এ স্থানটিকেই বাইবেলের যিহোশূয় পুস্তকের ১৮ ঃ ২৬ শ্লোকে রেকম বা রাকম বলা হয়েছে। এরপর তিনি একে ফিলিস্তীনের

বিখ্যাত ঐতিহাসিক কেন্দ্র পেট্রা–এর প্রাচীন নাম হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু তিনি একথা চিন্তা করেননি যে, যিহোশূয় পুস্তকে রেকম বা রাকমের আলোচনা এসেছে বনী বিন ইয়ামীনের (বিন্যামীন সন্তান) মীরাস প্রসংগে। এ সংশ্লিষ্ট পুস্তকের নিজের বর্ণনামতে এ গোত্রের মীরাসের এলাকা জর্দান নদী ও লূত সাগরের (Dead sea) পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। সেখানে পেট্রার অবস্থানের কোন সম্ভাবনাই নেই। পেট্রার ধ্বংসাবশেষ যে এলাকায় পাওয়া গেছে তার ও বনী বিন ইয়ামীনের মীরাসের এলাকার মধ্যে ইয়াহুদা (যিহোদা) ও আদ্‌মীয়ার পুরো এলাকা অবস্থিত ছিল। এ কারণে আধুনিক যুগের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পেট্রা ও রেকম একই জায়গার নাম এ ধারণার কঠোর বিরোধিতা করেছেন। (দেখুন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯৪৬ সালে মুদ্রিত, ১৭ খণ্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা) আমি মনে করি, "আর রকীম" মানে ফলক বা শিলালিপি, এ মতটিই সঠিক।

৮. অর্থাৎ যে আল্লাহ এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর শক্তিমত্তার পক্ষে কয়েকজন লোককে দু' তিন শো বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখা এবং তারপর তাদেরকে ঘুমাবার আগে তারা যেমন তরুণ–তাজা ও সুস্থ–সবল ছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় জাগিয়ে তোলা কি তুমি কিছু অসম্ভব বলে মনে করো? যদি চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তুমি কখনো চিন্তা–ভাবনা করতে তাহলে তুমি একথা মনে করতে না যে, আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ।

৯. এ কাহিনীর প্রাচীনতম বিবরণ পাওয়া গেছে জেম্স সারোজি নামক সিরিয়ার একজন খৃষ্টান পাদ্রীর বক্তৃতামালায়। তার এ বক্তৃতা ও উপদেশবাণী সুরিয়ানী ভাষায় লিখিত। আসহাবে কাহ্ফের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ৪৫২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম হয়। ৪৭৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি নিজের এ বক্তৃতামালা সংকলন করেন। এ বক্তৃতামালায় তিনি আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। আমাদের প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ এ সুরিয়ানী বর্ণনার সন্ধান পান। ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্র মাধ্যমে এ কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন। অন্যদিকে এগুলো ইউরোপেও পৌঁছে যায়। সেখানে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তার অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। গিবন তার "রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস" গ্রন্থের ৩৩ অধ্যায়ে ঘুমন্ত সাতজন (Seven sleepers) শিরোনামে ঐসব উৎস থেকে এ কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের মুফাস্‌সিরগণের বর্ণনার সাথে এত বেশী মিলে যায় যে, উভয় বর্ণনা একই উৎস থেকে গৃহীত বলে মনে হয়। যেমন যে বাদশাহর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহাভ্যন্তরে আশ্রয় নেন আমাদের মুফাস্‌সিরগণ তাঁর নাম লিখেছেন 'দাকয়ানুস' বা 'দাকিয়ানুস' এবং গিবন বলেন, সে ছিল কাইজার 'ডিসিয়াস' (Decius)। এ বাদশাহ ২৪৯ থেকে ২৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাবার ব্যাপারে তার আমলই সবচেয়ে বেশী দুর্নাম কুড়িয়েছে। যে নগরীতে এ ঘটনাটি ঘটে আমাদের মুফাস্‌সিরগণ তার নাম লিখেছেন 'আফ্‌সুস' বা 'আস্‌সোস'। অন্যদিকে গিবন তার নাম লিখেছেন 'এফিসুস' (Ephesus)। এ নগরীটি এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে রোমীয়দের সবচেয়ে বড় শহর ও বন্দর নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান তুরস্কের 'ইজমীর' (স্মার্ণা) নগরী থেকে ২০–২৫ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়। (দেখুন ২২২ পৃষ্ঠায়)। তারপর

যে বাদশাহর শাসনামলে আসহাবে কাহ্ফ জেগে ওঠেন আমাদের মুফাস্সিরগণ তার নাম লিখেছেন 'তেযোসিস' এবং গিবন বলেন, তাদের নিদ্রাভংগের ঘটনাটি কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিস (Theodosius) এর আমলে ঘটে। রোম সাম্রাজ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নেয়ার পর ৪০৮ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রোমের কাইজার ছিলেন। উভয় বর্ণনার সাদৃশ্য এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, আসহাবে কাহ্ফ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাদের যে সাথীকে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান তার নাম আমাদের মুফাস্সিরগণ লিখেছেন 'ইয়াম্লিখা' এবং গিবন লিখেছেন 'ইয়াম্লিখুস' (Iamblchus) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রেও উভয় বর্ণনা একই রকমের। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, কাইজার ডিসিয়াসের আমলে যখন ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর চরম নিপীড়ন নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তখন এ সাতজন যুবক একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর কাইজার থিযোডোসিসের রাজত্বের ৩৮তম বছরে অর্থাৎ প্রায় ৪৪৫ বা ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে তারা জেগে উঠেছিলেন। এ সময় সমগ্র রোম সাম্রাজ্য ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী। ঐ হিসেবে গুহায় তাদের ঘুমানোর সময় ধরা যায় প্রায় ১৯৬ বছর।

কোন কোন প্রাচ্যবিদ এ কাহিনীটিকে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী বলে মেনে নিতে এ জন্য অস্বীকার করেছেন যে, সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে কুরআন তাদের গুহায় অবস্থানের সময় ৩০৯ বছর বলে বর্ণনা করছে। কিন্তু ২৫ টীকায় আমি এর জবাব দিয়েছি।

এ সুরিয়ানী বর্ণনা ও কুরআনের বিবৃতির মধ্যে সামান্য বিরোধও রয়েছে। এরি ভিত্তিতে গিবন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে "অজ্ঞতা"র অভিযোগ এনেছেন। অথচ যে বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি এতবড় দুঃসাহস করছেন তার সম্পর্কে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, সেটি এ ঘটনার তিরিশ চল্লিশ বছর পর সিরিয়ার এক ব্যক্তি লেখেন। আর এত বছর পর নিছক জনশ্রুতির মাধ্যমে একটি ঘটনার বর্ণনা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে কিছু না কিছু বদলে যায়। এ ধরনের একটি ঘটনার বর্ণনাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য মনে করা এবং তার কোন অংশের সাথে বিরোধ হওয়াকে নিশ্চিতভাবে কুরআনের ভ্রান্তি বলে মনে করা কেবলমাত্র এমনসব হঠকারী লোকের পক্ষেই শোভা পায় যারা ধর্মীয় বিদ্বেষ বশে বুদ্ধিমত্তার সামান্যতম দাবীও উপেক্ষা করে যায়।

আসহাবে কাহ্ফের ঘটনাটি ঘটে আফসোস (Ephesus) নগরীতে। খৃষ্টপূর্ব প্রায় এগারো শতকে এ নগরীটির পত্তন হয়। পরবর্তীকালে এটি মূর্তিপূজার বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার লোকেরা চাঁদ বিবির পূজা করতো। তাকে বলা হতো ডায়না (Diana)। এর সুবিশাল মন্দিরটি প্রাচীন যুগের দুনিয়ার অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হতো। এশিয়া মাইনরের লোকেরা তার পূজা করতো। রোমান সাম্রাজ্যেও তাকে উপাস্যদের মধ্যে শামিল করে নেয়া হয়।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর যখন তাঁর দাওয়াত রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছুতে শুরু করে তখন এ শহরের কয়েকজন যুবকও শিরক থেকে তাওবা করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। খৃষ্টীয় বর্ণনাবলী একত্র করে তাদের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ গ্রেগরী অব

টুরস (Gregory of Tours) তার গ্রন্থে (Meraculorum Liber) বর্ণনা করেছেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :

"তারা ছিলেন সাতজন যুবক। তাদের ধর্মান্তরের কথা শুনে কাইজার ডিসিয়াস তাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠান। তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের ধর্ম কি? তারা জানতেন, কাইজার ঈসার অনুসারীদের রক্তের পিপাসু। কিন্তু তারা কোন প্রকার শংকা না করে পরিষ্কার বলে দেন, আমাদের রব তিনিই যিনি পৃথিবী ও আকাশের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদকে আমরা ডাকি না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে অনেক বড় গুনাহ করবো। কাইজার প্রথমে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তোমাদের মুখ বন্ধ করো, নয়তো আমি এখনই তোমাদের হত্যা করার ব্যবস্থা করবো। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, তোমরা এখনো শিশু। তাই তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম। ইতিমধ্যে যদি তোমরা নিজেদের মত বদলে ফেলো এবং জাতির ধর্মের দিকে ফিরে আসো তাহলে তো ভাল, নয়তো তোমাদের শিরচ্ছেদ করা হবে।"

"এ তিন দিনের অবকাশের সুযোগে এ সাতজন যুবক শহর ত্যাগ করেন। তারা কোন গুহায় লুকাবার জন্য পাহাড়ের পথ ধরেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথে চলতে থাকে। তারা কুকুরটাকে তাদের পিছু নেয়া থেকে বিরত রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কিছুতেই তাদের সংগ ত্যাগ করতে রাযী হয়নি। শেষে একটি বড় গভীর বিস্তৃত গুহাকে ভাল আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে তারা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কুকুরটি গুহার মুখে বসে পড়ে। দারুন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত থাকার কারণে তারা সবাই সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়েন। এটি ২৫০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। ১৯৭ বছর পর ৪৪৭ খৃষ্টাব্দে তারা হঠাৎ জেগে ওঠেন। তখন ছিল কাইজার দ্বিতীয় থিয়োডোসিসের শাসনামল। রোম সাম্রাজ্য তখন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আফসোস শহরের লোকেরাও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল।"

"এটা ছিল এমন এক সময় যখন রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যু পরের জীবন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে জমায়েত ও হিসেব নিকেশ হওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড মতবিরোধ চলছিল। আখেরাত অস্বীকারের ধারণা লোকদের মন থেকে কিভাবে নির্মূল করা যায় এ ব্যাপারটা নিয়ে কাইজার নিজে বেশ চিন্তিত ছিলেন। একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন তিনি এমন কোন নিদর্শন দেখিয়ে দেন যার মাধ্যমে লোকেরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। ঘটনাক্রমে ঠিক এ সময়েই এ যুবকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠেন।"

"জেগে উঠেই তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি? কেউ বলেন একদিন, কেউ বলেন দিনের কিছু অংশ। তারপর আবার একথা বলে সবাই নীরব হয়ে যান যে এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। এরপর তারা জীন (Jean) নামে নিজেদের একজন সহযোগীকে রূপার কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে খাবার আনার জন্য শহরে পাঠান। লোকেরা যাতে চিনতে না পারে এ জন্য তাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন। তারা ভয় করছিলেন, লোকেরা আমাদের ঠিকানা জানতে পারলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে এবং ডায়নার পূজা করার জন্য আমাদের বাধ্য করবে। কিন্তু জীন শহরে পৌছে সবকিছু বদলে

গেছে দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন সবাই ঈসায়ী হয়ে গেছে এবং ডায়না দেবীর পূজা কেউ করছে না। একটি দোকানে গিয়ে তিনি কিছু রুটি কিনেন এবং দোকানদারকে একটি রূপার মুদ্রা দেন। এ মুদ্রার গায় কাইজার ডিসিয়াসের ছবি ছাপানো ছিল। দোকানদার এ মুদ্রা দেখে অবাক হয়ে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, এ মুদ্রা কোথায় পেলে? জীন বলে, এ আমার নিজের টাকা, অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসিনি। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। লোকদের ভীড় জমে ওঠে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নগর কোতোয়ালের কাছে পৌছে যায়। কোতোয়াল বলেন, এ গুপ্ত ধন যেখান থেকে এনেছো সেই জায়গাটা কোথায় আমাকে বলো। জীন বলেন, কিসের গুপ্তধন? এ আমার নিজের টাকা। কোন গুপ্তধনের কথা আমার জানা নেই। কোতোয়াল বলেন, তোমার একথা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তুমি যে মুদ্রা এনেছো এতো কয়েক শো বছরের পুরানো। তুমি তো সবেমাত্র যুবক, আমাদের বুড়োরাও এ মুদ্রা দেখেনি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। জীন যখন শোনেন কাইজার ডিসিয়াস মারা গেছে বহুযুগ আগে তখন তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলতে পারেন না। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, এ তো মাত্র কালই আমি এবং আমার ছয়জন সাথী এ শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম এবং ডিসিয়াসের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। জীনের একথা শুনে কোতোয়ালও অবাক হয়ে যান। তিনি তাকে নিয়ে যেখানে তার কথা মতো তারা লুকিয়ে আছেন সেই গুহার দিকে চলেন। বিপুল সংখ্যক জনতাও তাদের সাথী হয়ে যায়। তারা যে যথার্থই কাইজার ডিসিয়াসের আমলের লোক সেখানে পৌছে এ ব্যাপারটি পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায়। এ ঘটনার খবর কাইজার ডিসিয়াসের কাছেও পাঠানো হয়। তিনি নিজে এসে তাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের থেকে বরকত গ্রহণ করেন। তারপর হঠাৎ তারা সাতজন গুহার মধ্যে গিয়ে সটান শুয়ে পড়েন এবং তাদের মৃত্যু ঘটে। এ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখে লোকেরা যথার্থই মৃত্যুর পরে জীবন আছে বলে বিশ্বাস করে। এ ঘটনার পর কাইজারের নির্দেশে গুহায় একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করা হয়।"

খৃস্টীয় বর্ণনাসমূহে গুহাবাসীদের সম্পর্কে এই যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে কুরআন বর্ণিত কাহিনীর সাথে এর সাদৃশ্য এত বেশী যে, এদেরকেই আসহাবে কাহ্‌ফ বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এ ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন যে, এ ঘটনাটি হচ্ছে এশিয়া মাইনরের আর আরব ভূখণ্ডের বাইরের কোন ঘটনা নিয়ে কুরআন আলোচনা করে না, কাজেই খৃস্টীয় কাহিনীকে আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া কুরআনের পথ থেকে বিচ্যুতি হবে। কিন্তু আমার মতে এ আপত্তি ঠিক নয়। কারণ কুরআন মজীদে আসলে আরববাসীদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য এমন সব জাতির ও শক্তির অবস্থা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাদের সম্পর্কে তারা জানতো। তারা আরবের সীমানার মধ্যে থাকুক বা বাইরে তাতে কিছু আসে যায় না। এ কারণে মিসরের প্রাচীন ইতিহাস কুরআনে আলোচিত হয়েছে। অথচ (প্রাচীন) মিসর আরবের বাইরে অবস্থিত ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, মিসরের ঘটনাবলী যদি কুরআনে আলোচিত হতে পারে তাহলে রোমের ঘটনাবলী কেন হতে পারে না? আরববাসীরা যেভাবে মিসর সম্পর্কে জানতো ঠিক তেমনি রোম সম্পর্কেও তো জানতো। রোমান সাম্রাজ্যের সীমানা হিজাযের একেবারে উত্তর সীমান্তের সাথে লাগোয়া ছিল। আরবদের বাণিজ্য কাফেলা দিনরাত রোমীয় এলাকায় যাওয়া আসা করতো। বহু আরব গোত্র

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

এখন যখন তোমরা এদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে এরা পূজা করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছো তখন চলো অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই।[১১] তোমাদের রব তোমাদের ওপর তাঁর রহমতের ছায়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের উপযোগী সাজ সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন।"

তুমি যদি তাদেরকে গুহায় দেখতে,[১২] তাহলে দেখতে সূর্য উদয়ের সময় তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক থেকে ওঠে এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদেরকে এড়িয়ে বাম দিকে নেমে যায় আর তারা গুহার মধ্যে একটি বিস্তৃত জায়গায় পড়ে আছে।[১৩] এ হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান সে-ই সঠিক পথ পায় এবং যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন তার জন্য তুমি কোন পৃষ্ঠপোষক ও পথপ্রদর্শক পেতে পারো না।

রোমানদের প্রভাবাধীন ছিল। রোম আরবদের জন্য মোটেই অজ্ঞাত দেশ ছিল না। সূরা রূম এর প্রমাণ। এ ছাড়া একথাও চিন্তা করার মতো যে, এ কাহিনীটি আল্লাহ নিজেই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কুরআন মজীদে বর্ণনা করেননি। বরং মক্কার কাফেরদের জিজ্ঞাসার জবাবে বর্ণনা করেছেন। আর আহলি কিতাবরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য মক্কার কাফেরদেরকে তাঁর কাছ থেকে এমন ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিয়েছিল যে সম্পর্কে আরববাসীরা মোটেই কিছু জানতো না।

১০. অর্থাৎ যখন তারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনলো তখন আল্লাহ তাদের সঠিক পথে চলার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের ন্যায় ও সত্যের ওপর অবিচল থাকার সুযোগ দিলেন। তারা নিজেদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে কিন্তু বাতিলের কাছে মাথা নত করবে না।

১১. যে সময় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবকদের জনবসতি ত্যাগ করে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হয় সে সময় এশিয়া মাইনরে এ এফিসুস শহর ছিল মূর্তি পূজা ও যাদু বিদ্যার সবচেয়ে

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذَٰلِكَ
بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم
بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

৩ রুকূ'

তোমরা তাদেরকে দেখে মনে করতে তারা জেগে আছে, অথচ তারা ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ডাইনে বাঁয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছিলাম।[১৪] এবং তাদের কুকুর গুহা মুখে সামনের দু'পা ছড়িয়ে বসেছিল। যদি তুমি কখনো উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে তাহলে পিছন ফিরে পালাতে থাকতে এবং তাদের দৃশ্য তোমাকে আতংকিত করতো।[১৫]

আর এমনি বিস্ময়করভাবে আমি তাদেরকে উঠিয়ে বসালাম[১৬] যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করলোঃ "বলোতো, কতক্ষণ এ অবস্থায় থেকেছো?" অন্যেরা বললো, "হয়তো একদিন বা এর থেকে কিছু কম সময় হবে।" তারপর তারা বললো, "আল্লাহই ভাল জানেন আমাদের কতটা সময় এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। চলো এবার আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রূপার এ মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাই এবং সে দেখুক সবচেয়ে ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক; আর তাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, আমাদের এখানে থাকার ব্যাপারটা সে যেন কাউকে জানিয়ে না দেয়।

বড় কেন্দ্র। সেখানে ছিল ডায়না দেবীর একটি বিরাট মন্দির। এর খ্যাতি তখন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু দূরদেশ থেকে লোকেরা ডায়না দেবীর পূজা করার জন্য সেখানে আসতো। সেখানকার যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী ও তাবিজ লেখকরা সারা দুনিয়ায়

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

যদি কোনক্রমে তারা আমাদের নাগাল পায় তাহলে হয় প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা আমাদের জোর করে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আর এমন হলে আমরা কখনো সফলকাম হতে পারবো না।”

—এভাবে আমি নগরবাসীদেরকে তাদের অবস্থা জানালাম,[১৭] যাতে লোকেরা জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতের দিন নিশ্চিতভাবেই আসবে।[১৮] (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, যখন এটিই ছিল চিন্তার আসল বিষয়) সে সময় তারা পরস্পর এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল যে, এদের (আসহাবে কাহ্ফ) সাথে কি করা যায়। কিছু লোক বললো, “এদের ওপর একটি প্রাচীর নির্মাণ করো, এদের রবই এদের ব্যাপারটি ভাল জানেন।”[১৯] কিন্তু তাদের বিষয়াবলীর ওপর যারা প্রবল ছিল[২০] তারা বললো, “আমরা অবশ্যি এদের ওপর একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করবো।”[২১]

খ্যাতিমান ছিল। সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর পর্যন্ত তাদের জমজমাট কারবার ছিল। এ কারবারে ইহুদীদের বিরাট অংশ ছিল এবং ইহুদীরা তাদের এ কারবারকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আমল থেকে চলে আসা ব্যবসায় মনে করতো। (দেখুন ইনসাইক্লোপিডিয়া বিবলিক্যাল লিটারেচার) শিরক ও কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত এ পরিবেশে আল্লাহ বিশ্বাসীরা যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিলেন পরবর্তী রুকূ'তে আসহাবে কাহ্ফের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে ঃ “যদি তাদের হাত আমাদের ওপর পড়ে তাহলে তো তারা আমাদের প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।”

১২. মাঝখানে একথাটি উহ্য রাখা হয়েছে যে, এ পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী তারা শহর থেকে বের হয়ে পাহাড়গুলোর মধ্যে অবস্থিত একটি গুহায় আত্মগোপন করেন, যাতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু অথবা জোর করে মুরতাদ বানানোর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

১৩. অর্থাৎ তাদের গুহার মুখ ছিল উত্তর দিকে। এ কারণে সূর্যের আলো কোন মওসুমেই গুহার মধ্যে পৌঁছুতো না এবং বাইর থেকে কোন পথ অতিক্রমকারী দেখতে পেতো না গুহার মধ্যে কে আছে।

১৪. অর্থাৎ কেউ বাইর থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেও তাদের সাতজনের মাঝে মাঝে পার্শ্বপরিবর্তন করতে থাকার কারণে এ ধারণা করতো যে, এরা এমনিই শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে না।

১৫. অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যে একটি অন্ধকার গুহায় কয়েকজন লোকের এভাবে অবস্থান করা এবং সামনের দিকে কুকুরের বসে থাকা এমন একটি ভয়াবহ দৃশ্য পেশ করে যে, উঁকি দিয়ে যারা দেখতে যেতো তারাই তাদেরকে ডাকাত মনে করে ভয়ে পালিয়ে যেতো। এটি ছিল একটি বড় কারণ, যে জন্য লোকেরা এত দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে জানতে পারেনি। কেউ কখনো ভিতরে ঢুকে আসল ব্যাপারের খোঁজ খবর নেবার সাহসই করেনি।

১৬. যে অদ্ভুত পদ্ধতিতে তাদেরকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল এবং দুনিয়াবাসীকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনি সুদীর্ঘকাল পরে তাদের জেগে ওঠাও ছিল আল্লাহর শক্তিমত্তার বিস্ময়কর প্রকাশ।

১৭. গুহাবাসী যুবকদের (আসহাবে কাহ্ফ) একজন যখন শহরে খাবার কিনতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার দুনিয়া বদলে গিয়েছিল। মূর্তি পূজারী রোমানরা দীর্ঘদিন থেকে ঈসায়ী হয়ে গিয়েছিল। ভাষা, তাহযীব, তামাদ্দুন, পোশাক–পরিচ্ছদ সব জিনিসেই সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। দু'শো বছরের আগের এ লোকটি নিজের সাজ–সজ্জা, পোশাক, ভাষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারে হঠাৎ এক দর্শনীয় বিষয়ে পরিণত হলেন। তারপর যখন খাবার কেনার জন্য কাইজার ডিসিয়াসের যুগের মুদ্রা পেশ করলেন তখন দোকানদার অবাক হয়ে গেলো। সুরিয়ানী বর্ণনা অনুসারে বলা যায়, দোকানদারের সন্দেহ হলো হয়তো পুরাতন যুগের কোন গুপ্ত ধনের ভাণ্ডার থেকে এ মুদ্রা আনা হয়েছে। কাজেই আশেপাশের লোকদেরকে সেদিকে আকৃষ্ট করলো। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নগর শাসকের হাতে সোপর্দ করা হলো। সেখানে গিয়ে রহস্যভেদ হলো যে, দু'শো বছর আগে হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য পালিয়েছিলেন এ ব্যক্তি তাদেরই একজন। এ খবর শহরের ঈসায়ী অধিবাসীদের মধ্যে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে শাসকের সাথে বিপুল সংখ্যক জনতাও গুহায় পৌঁছে গেলো। এখন আসহাবে কাহ্ফগণ যখন জানতে পারলেন যে, তারা দু'শো বছর ঘুমাবার পর জেগেছেন তখন তারা নিজেদের ঈসায়ী ভাইদেরকে সালাম করে শুয়ে পড়লেন এবং তাদের প্রাণবায়ু উড়ে গেলো।

১৮. সুরিয়ানী বর্ণনা অনুযায়ী সেকালে সেখানে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে বিষম বিতর্ক চলছিল। যদিও রোমান শাসনের প্রভাবে সাধারণ লোক ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরকাল এ ধর্মের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অংগ ছিল তবুও তখনো রোমীয় শিরক ও মূর্তি পূজা এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাব ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। এর ফলে বহু লোক আখেরাত অস্বীকার অথবা কমপক্ষে তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতো। আবার এ সন্দেহ ও অস্বীকারকে যে জিনিসটি শক্তিশালী করছিল সেটি ছিল এই যে, এফিসুসে বিপুল সংখ্যক ইহুদী বাস করতো এবং তাদের একটি সম্প্রদায় (যাদেরকে

সাদুকী বলা হতো। প্রকাশ্যে আখেরাত অস্বীকার করতো। তারা আল্লাহর কিতাব (অর্থাৎ তাওরাত) থেকে আখেরাত অস্বীকৃতির প্রমাণ পেশ করতো এর মোকাবিলা করার জন্য ঈসায়ী আলেমগণের কাছে শক্তিশালী যুক্তি–প্রমাণ ছিল না। মথি, মার্ক ও লুক লিখিত ইঞ্জিলগুলোতে আমরা সাদুকীদের সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের বিতর্কের উল্লেখ পাই। আখেরাত বিষয়ে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তিনজন ইঞ্জিল লেখকই ঈসা আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এমন দুর্বল জবাব সংকলন করেছেন যার দুর্বলতা খোদ খৃষ্টান পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন (দেখুন মথি ২২ ঃ ৩২–৩৩, মার্ক ১২ ঃ ১৮–২৭, লুক ২০ ঃ ২৭–৪০)। এ কারণে আখেরাত অস্বীকারকারীদের শক্তি বেড়ে যাচ্ছিল এবং আখেরাত বিশ্বাসীরাও সন্দেহ ও দোটানার মধ্যে অবস্থান করতে শুরু করছিল। ঠিক এ সময় আসহাবে কাহ্ফের ঘুম থেকে জেগে ওঠার ঘটনাটি ঘটে এবং এটি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের স্বপক্ষে এমন চাক্ষুষ প্রমাণ পেশ করে যা অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

১৯. বক্তব্যের তাৎপর্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ছিল ঈসায়ী সজ্জনদের উক্তি তাদের মতে আসহাবে কাহ্ফ গুহার মধ্যে যেভাবে শুয়ে আছেন সেভাবেই তাদের শুয়ে থাকতে দাও এবং গুহা মুখ বন্ধ করে দাও। তাদের রবই ভাল জানেন তারা কারা, তাদের মর্যাদা কি এবং কোন্ ধরনের প্রতিদান তাদের উপযোগী।

২০. এখানে রোম সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং খৃস্টীয় গীর্জার ধর্মীয় নেতৃবর্গের কথা বলা হয়েছে, যাদের মোকাবিলায় সঠিক আকীদা–বিশ্বাসের অধিকারী ঈসায়ীদের কথা মানুষের কাছে ঠাঁই পেতো না। পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক গীর্জাসমূহে শির্ক, আউলিয়া পূজা ও কবর পূজা পুরো জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুযর্গদের আস্তানা পূজা করা হচ্ছিল এবং ঈসা, মারয়াম ও হাওয়ারীগণের প্রতিমূর্তি গীর্জাগুলোতে স্থাপন করা হচ্ছিল। আসহাবে কাহ্ফের নিদ্রাভংগের মাত্র কয়েক বছর আগে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র খৃস্টীয় জগতের ধর্মীয় নেতাদের একটি কাউন্সিল এ এফিসুসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আল্লাহ হওয়া এবং হযরত মারয়ামের (আ) "আল্লাহ–মাতা" হওয়ার আকীদা চার্চের সরকারী আকীদা হিসেবে গণ্য হয়েছিল এ ইতিহাস সামনে রাখলে পরিষ্কার জানা যায়, اَلَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ বাক্যে যাদেরকে প্রাধান্য লাভকারী বলা হয়েছে তারা হচ্ছে এমনসব লোক যারা ঈসার সাচ্চা অনুসারীদের মোকাবিলায় তৎকালীন খৃস্টান জনগণের নেতা এবং তাদের শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী যাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল মূলত এরাই ছিল শির্কের পতাকাবাহী এবং এরাই আসহাবে কাহ্ফের সমাধি সৌধ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদ তথা ইবাদাতখানা নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল

২১. মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মজীদের এ আয়াতটির সম্পূর্ণ উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছে। তারা এ থেকে প্রমাণ করতে চান যে, সাহাবীগণের কবরের ওপর সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ জায়েয। অথচ কুরআন এখানে তাদের এ গোমরাহীর প্রতি ইংগিত করছে যে, এ জালেমদের মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকাল অনুষ্ঠানের ব্যাপারে প্রত্যয় সৃষ্টি

করার জন্য তাদেরকে যে নিদর্শন দেখানো হয়েছিল তাকে তারা শির্কের কাজ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি সুযোগ মনে করে নেয় এবং ভাবে যে, ভালই হলো পূজা করার জন্য আরো কিছু আল্লাহর অলী পাওয়া গেলো। তাছাড়া এই আয়াত থেকে "সালেহীন"—সৎলোকদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরী করার প্রমাণ কেমন করে সংগ্রহ করা যেতে পারে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে ঃ

لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرُج

"কবর যিয়ারতকারী নারী ও কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণকারীদের এবং কবরে যারা বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

الا وان من كان قبلكم كانو يتخذون قبور انبياء هم مساجد فانى انهكم عن ذلك (مسلم)

"সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের কবরকে ইবাদাতখানা বানিয়ে নিতো। আমি তোমাদের এ ধরনের কাজ থেকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম)

لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيآء هم مساجد

"আল্লাহ ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন। তারা নিজেদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদাতখানায় পরিণত করেছে।" (আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

انّ أولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق يوم القيمة –

"এদের অবস্থা এ ছিল যে, যদি এদের মধ্যে কোন সৎলোক থাকতো তাহলে তার মৃত্যুর পর এরা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তার ছবি তৈরী করতো। এরা কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট সৃষ্টি হবে।" (মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সুস্পষ্ট বিধান থাকার পরও কোন আল্লাহভীরু ব্যক্তি কুরআন মজীদে ঈসায়ী পাদরী ও রোমীয় শাসকদের যে ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড কাহিনীচ্ছলে বর্ণনা করা হয়েছে তাকেই ঐ নিষিদ্ধ কর্মটি করার জন্য দলীল ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাবার দুঃসাহস কিভাবে করতে পারে?

এ প্রসংগে আরো বলা দরকার যে, ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে রেভারেণ্ড আরুনডেল (Arundell) এশিয়া মাইনরের আবিষ্কার (Discoveries in Asia Minor) নামে নিজের যে প্রত্যক্ষ দর্শনের ফলাফল পেশ করেন তাতে তিনি বলেন যে, প্রাচীন শহর এফিসুসের ধ্বংসাবশেষ সংলগ্ন পর্বতের ওপর তিনি হযরত মারয়াম ও "সাত ছেলে"র (অর্থাৎ আসহাবে কাহ্ফ) সমাধি সৌধের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন।

سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থজন ছিল তাদের কুকুরটি। আবার অন্য কিছু লোক বলবে, তারা পাঁচজন ছিল এবং তাদের কুকুরটি ছিল ষষ্ঠ, এরা সব আন্দাজে কথা বলে। অন্যকিছু লোক বলে, তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর।২২ বলো, আমার রবই ভাল জানেন তারা ক'জন ছিল, অল্প লোকেই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। কাজেই তুমি সাধারণ কথা ছাড়া তাদের সংখ্যা নিয়ে লোকদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করো না।২৩

২২. এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনার পৌনে তিনশো বছর পরে কুরআন নাযিলের সময় এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিল। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সাধারণ লোকদের জানা ছিল না। আসলে তখন তো ছাপাখানার যুগ ছিল না। কাজেই যেসব বইতে তাদের সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশী সঠিক তথ্যাদি ছিল সেগুলো সাধারণভাবে প্রকাশ করার কোন সুযোগ ছিল না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে ঘটনাবলী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো এবং সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে তাদের বহু বিবরণ গল্পের রূপ নিতো। তবুও যেহেতু তৃতীয় বক্তব্যটির প্রতিবাদ আল্লাহ করেননি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল।

২৩. এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সংখ্যাটি আসল নয় বরং আসল জিনিস হচ্ছে এ কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এ কাহিনী থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, একজন সাচ্চা মুমিনের কোন অবস্থায়ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং মিথ্যার সামনে মাথা নত করে দেবার জন্য তৈরী থাকা উচিত নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মুমিনের ভরসা দুনিয়াবী উপায় উপকরণের উপর নয় বরং আল্লাহর উপর থাকতে হবে এবং সত্যপথানুসারী হবার জন্য বাহ্যত পরিবেশের মধ্যে কোন আনুকূল্যের চিহ্ন না দেখা গেলেও আল্লাহর উপর ভরসা করে সত্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যে "প্রচলিত নিয়ম"কে লোকেরা "প্রাকৃতিক আইন" মনে করে এবং এ আইনের বিরুদ্ধে দুনিয়ায় কিছুই হতে পারে না বলে ধারণা করে, আসলে আল্লাহর মোটেই তা মেনে চলার প্রয়োজন নেই। তিনি যখনই এবং যেখানেই চান এ নিয়ম পরিবর্তন করে যে অস্বাভাবিক কাজ করতে চান করতে পারেন। কাউকে দু'শো বছর ঘুম পাড়িয়ে

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْیْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّآ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ ز
وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ وَقُلْ عَسٰٓی اَنْ یَّهْدِیَنِ رَبِّیْ لِاَقْرَبَ مِنْ
هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوْا فِیْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِیْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾
قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ج لَهٗ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَبْصِرْ بِهٖ
وَاَسْمِعْ ط مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ ز وَّلَا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

৪ রুকূ'

—আর দেখো, কোন জিনিসের ব্যাপারে কখনো একথা বলো না, আমি কাল এ কাজটি করবো। (তোমরা কিছুই করতে পারো না) তবে যদি আল্লাহ চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সংগে সংগেই নিজের রবকে স্মরণ করো এবং বলো, "আশা করা যায়, আমার রব এ ব্যাপারে সত্যের নিকটতর কথার দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।"[২৪] —আর তারা তাদের গুহার মধ্যে তিনশো বছর থাকে এবং (কিছু লোক মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরো নয় বছর বেড়ে গেছে।[২৫] তুমি বলো, আল্লাহ তাদের অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে বেশী জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় প্রচ্ছন্ন অবস্থা তিনিই জানেন, কেমন চমৎকার তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা! পৃথিবী ও আকাশের সকল সৃষ্টির তত্বাবধানকারী তিনি ছাড়া আর কেউ নেই এবং নিজের শাসন কর্তৃত্বে তিনি কাউকে শরীক করেন না।

এমনভাবে জাগিয়ে তোলা যে, সে যেন মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়েছে এবং তার বয়স, চেহারা–সুরত, পোশাক, স্বাস্থ্য তথা কোনকিছুর ওপর কালের বিবর্তনের কোন প্রভাব না পড়া, এটা তাঁর জন্য কোন বড় কাজ নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানব জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত বংশধরদেরকে একই সংগে জীবিত করে উঠিয়ে দেয়া, যে ব্যাপারে নবীগণ ও আসমানী কিতাবগুলো আগাম খবর দিয়েছে, আল্লাহর কুদরতের পক্ষে মোটেই কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষেরা কিভাবে প্রতি যুগে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে নিজেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষার সম্পদে পরিণত করার পরিবর্তে উল্টা সেগুলোকে নিজেদের বৃহত্তর ভ্রষ্টতার মাধ্যমে পরিণত করতো। আসহাবে কাহ্ফের অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ মানুষকে এ জন্য দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ তার মাধ্যমে পরকাল বিশ্বাসের উপকরণ লাভ করবে, ঠিক সেই ঘটনাকেই তারা এভাবে গ্রহণ করলো যে, আল্লাহ তাদেরকে পূজা করার জন্য আরো কিছু সংখ্যক অলী ও পূজনীয় ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন। –এ কাহিনী থেকে মানুষকে এ আসল

শিক্ষাগুলো গ্রহণ করা উচিত এবং এর মধ্যে এগুলোই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বিষয়। এ বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এ মর্মে অনুসন্ধান ও গবেষণা শুরু করে দেয়া যে, আসহাবে কাহ্ফ কতজন ছিলেন, তাদের নাম কি ছিল, তাদের কুকুরের গায়ের রং কি ছিল—এসব এমন ধরনের লোকের কাজ যারা ভেতরের শাঁস ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের ছাল নিয়ে নাড়াচাড়া করা পছন্দ করে। তাই মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর মাধ্যমে মুমিনদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি অন্য লোকেরা এ ধরনের অসংলগ্ন বিতর্কের অবতারণা করেও তাহলে তোমরা তাতে নাক গলাবে না এবং এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করবে না। বরং কেবলমাত্র কাজের কথায় নিজেদের সময় ক্ষেপন করবে। এ কারণেই আল্লাহ নিজেও তাদের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করেননি। এর ফলে আজে বাজে বিষয়ের মধ্যে নাক গলিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে যারা অভ্যস্ত তারা নিজেদের এ অভ্যাসকে জিইয়ে রাখার মাল মসলা পাবে না।

২৪. এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। পেছনের আয়াতগুলোর বক্তব্যের সাথে সংযোগ রেখে ধারাবাহিক বক্তব্যের মাঝখানে একথাটি বলা হয়েছে। পেছনের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল ঃ আসহাবে কাহ্ফের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই অনর্থক একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ো না এবং এ ব্যাপারে কারো সাথে বিতর্কও করো না। এ প্রসংগে সামনের দিকের কথা বলার আগে প্রাসংগিক বাক্য হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদেরকে আরো একটি নির্দেশও দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, তুমি কখনো দাবী করে একথা বলো না যে, আমি আগামীকাল অমুক কাজটি করবো। তুমি ঐ কাজটি করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে তুমি কীইবা জানো! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং যা ইচ্ছা তা করতে পারবে নিজের কাজের ব্যাপারে এমন স্বাধীন ক্ষমতাও তোমার নেই। তাই কখনো বেখেয়ালে যদি মুখ থেকে এমন কথা বের হয়ে যায় তাহলে সংগে সংগেই সাবধান হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং ইনশাআল্লাহ বলে দাও। তাছাড়া তুমি যে কাজটি করতে বলছো সেটাই অপেক্ষাকৃত কল্যাণকর না অন্য কাজ তার চেয়ে ভাল, একথাও তুমি জানো না। কাজেই আল্লাহর ওপর ভরসা করে এভাবে বলো ঃ আশা করা যায় আমার রব এ ব্যাপারে সঠিক কথা অথবা সঠিক কর্মপদ্ধতির দিকে আমাকে চালিত করবেন।

২৫. আমার মতে এ বাক্যটির সংযোগ রয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ বাক্যের ধারাবাহিকতা এভাবে রক্ষিত হয়েছে যে, "কিছু লোক বলবে তারা তিনজন ছিল এবং চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর............আর কিছু লোক বলে, তারা নিজেদের গুহায় তিনশো বছর ঘুমিয়ে ছিলেন এবং কিছু লোক এ মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে আরো নয় বছর বেড়ে গেছে।" এ বাক্যে তিনশো ও নয় বছরের যে সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে আমার মতে তা আসলে লোকদের উক্তি যা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, এটা আল্লাহর উক্তি নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে, পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ নিজেই বলছেন ঃ তুমি বলো, তারা কতদিন ঘুমিয়েছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। যদি ৩০৯ এর সংখ্যা আল্লাহ নিজেই বলে থাকতেন তাহলে তারপর একথা বলার কোন অর্থ ছিল না। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই হযরত আবদুল্লাহ

وَاتْلُ مَآ أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ أَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

হে নবী![২৬] তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার ওপর অহী করা হয়েছে তা (হুবহু) শুনিয়ে দাও। তাঁর বক্তব্য পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই, (আর যদি তুমি কারো স্বার্থে তার মধ্যে পরিবর্তন করো তাহলে) তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালাবার জন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।[২৭] আর নিজের অন্তরকে তাদের সংগলাভে নিশ্চিন্ত করো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল–সাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনো তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করো?[২৮] এমন কোন লোকের আনুগত্য করো না[২৯] যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।[৩০]

ইবনে আব্বাস (রা)ও এ সদর্থ করেছেন যে, এটি আল্লাহর উক্তি নয় বরং লোকদের উক্তির উদ্ধৃতি মাত্র।

২৬. আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী শেষ হবার পর এবার এখান থেকে দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর আলোচনা শুরু হচ্ছে। এ আলোচনায় মক্কায় মুসলমানরা যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন সে সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে।

২৭. এর মানে এ নয় যে, নাউযু বিল্লাহ! সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদের স্বার্থে কুরআনে কিছু পরিবর্তন করার এবং কুরাইশ সরদারদের সাথে কিছু কমবেশীর ভিত্তিতে আপোস করে নেবার কথা চিন্তা করছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করছিলেন। বরং মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করে এর মধ্যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, যদিও বাহ্যত সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদেরকে একথা বলা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালামের মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু কমবেশী করার অধিকার রাখেন না। তাঁর কাজ শুধু এতটুকুই, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন

তাকে কোন কিছু কমবেশী না করে হুবহু মানুষের কাছে পৌছে দেবেন। তুমি যদি মেনে নিতে চাও তাহলে বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন পেশ করা হয়েছে তাকে পুরোপুরি হুবহু মেনে নাও। আর যদি না মানতে চাও তাহলে সেটা তোমার খুশী তুমি মেনে নিয়ো না। কিন্তু কোন অবস্থায় এ আশা করো না যে, তোমাকে রাজী করার জন্য তোমার খেয়াল–খুশীমতো এ দীনের মধ্যে কোন আংশিক পর্যায়ের হলেও কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হবে। কাফেরদের পক্ষ থেকে বারবার এ মর্মে যে দাবী করা হচ্ছিল যে, আমরা তোমার কথা পুরোপুরি মেনে নেবো এমন জিদ ধরে বসে আছো কেন? আমাদের পৈতৃক দীনের আকীদা–বিশ্বাস ও রীতি–রেওয়াজের সুবিধা দেবার কথাটাও একটু বিবেচনা করো। তুমি আমাদেরটা কিছু মেনে নাও এবং আমরা তোমারটা কিছু মেনে নিই। এর ভিত্তিতে সমঝোতা হতে পারে এবং এভাবে গোত্রীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য অটুট থাকতে পারে। এটি হচ্ছে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই দাবীর জওয়াব। কুরআনে একাধিক জায়গায় তাদের এ দাবী উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর এ জওয়াবই দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা ইউনুসের ১৫ আয়াতটি দেখুন। বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْبَدِّلْهُ ط– (يونس – ١٥)

"যখন আমার আয়াত তাদেরকে পরিষ্কার শুনিয়ে দেয়া হয় তখন যারা কখনো আমার সামনে হাযির হবার আকাংখা রাখে না তারা বলে, এ ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো অথবা এর মধ্যে কিছু কাটছাঁট করো।"

২৮. ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশ সরদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো, বেলাল (রা), সোহাইব (রা), আম্মার (রা), খাব্বাব (রা) ও ইবনে মাসউদের (রা) মতো গরীব লোকেরা তোমার সাথে বসে, আমরা ওদের সাথে বসতে পারি না। ওদেরকে হটাও তাহলে আমরা তোমার মজলিসে আসতে পারি এবং তুমি কি বলতে চাও তা জানতে পারি। একথায় মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমার চারদিকে জমায়েত হয়েছে এবং দিনরাত নিজেদের রবকে স্মরণ করছে তাদেরকে তোমার কাছে থাকতে দাও এবং এ ব্যাপারে নিজের মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসতে দিও না এবং তাদের দিক থেকে কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। তুমি কি এ আন্তরিকতা সম্পন্ন লোকদেরকে ত্যাগ করে চাও যে, এদের পরিবর্তে পার্থিব জৌলুসের অধিকারী লোকেরা তোমার কাছে বসুক? এ বাক্যেও বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে কুরাইশ সরদারদেরকে একথা শুনানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য যে, তোমাদের এ লোক দেখানো জৌলুস, যার জন্য তোমরা গর্বিত। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে এগুলোর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। যেসব গরীব লোকের মধ্যে আন্তরিকতা আছে এবং যারা নিজেদের রবের স্মরণ থেকে কখনো গাফিল হয় না তারা তোমার চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান। হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সরদারদের মধ্যেও ঠিক এ একই ব্যাপার ঘটেছিল। তারা হযরত নূহকে (আ) বলতো ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

পরিষ্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক।[৩১] *আমি (অস্বীকারকারী) জালেমদের জন্য একটি আগুন তৈরী করে রেখেছি যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে।*[৩২] *সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো।*[৩৩] *এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং কি জঘন্য আবাস!*

وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ

"আমরা তো দেখছি আমাদের মধ্যে যারা নিম্ন স্তরের লোক, তারাই না বুঝে সুজে তোমার পেছনে জড়ো হয়েছে।"

হযরত নূহের (আ) জবাব ছিল ঃ مَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا "যারা ঈমান এনেছে আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না।" এবং لَا اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا "যাদেরকে তোমরা তাচ্ছিল্যের নজরে দেখো তাদের সম্বন্ধে আমি এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কোন কল্যাণ দান করেননি।" (হূদ ২৭, ২৯, ৩১ আয়াত, আন'আম ৫২ এবং আল হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)।

২৯. অর্থাৎ তার কথা মেনো না, তার সামনে মাথা নত করো না, তার ইচ্ছা পূর্ণ করো না এবং তার কথায় চলো না। এখানে আনুগত্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০. كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا এর একটি অর্থ তাই যা আমি অনুবাদে গ্রহণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "যে ব্যক্তি সত্যকে পেছনে রেখে এবং নৈতিক সীমারেখা লংঘন করে লাগামহীনভাবে চলে।" উভয় অবস্থায় মূল কথা একই দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিজের নফসের বান্দা হয়ে যায় তার প্রত্যেকটি কাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। এ ধরনের লোকের আনুগত্য করার মানে এ দাঁড়ায় যে, যে আনুগত্য করে সেও আল্লাহর সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অচেতন থেকে যায়, আর যার আনুগত্য করা হয় সে বিভ্রান্ত হয়ে যেখানে যেখানে ঘুরে বেড়ায় আনুগত্যকারীও সেখানে সেখানে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

৩১. এখানে এসে পরিষ্কার বুঝা যায় আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনী শুনাবার পর কোন্ উপলক্ষে এ বাক্যটি এখানে বলা হয়েছে। আসহাবে কাহ্‌ফের যে কাহিনী ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছিল, তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার পর তারা কিভাবে

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝٣٠ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝٣١

তবে যারা মেনে নেবে এবং সৎকাজ করবে, সেসব সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আমি কখনো নষ্ট করি না। তাদের জন্য রয়েছে চির বসন্তের জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে নদী, সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকনে সজ্জিত করা হবে,[৩৪] সূক্ষ্ম ও পুরু রেশম ও কিংখাবের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে এবং উপবেশন করবে উঁচু আসনে বালিশে হেলান দিয়ে,[৩৫] চমৎকার পুরস্কার এবং সর্বোত্তম আবাস!

দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দেন, "আমাদের রব তো একমাত্র তিনিই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রব।" তারপর কিভাবে তারা নিজেদের পথভ্রষ্ট জাতির সাথে কোনভাবেই আপোস করতে রাযী হননি বরং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলে দেন, "আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকবো না। যদি আমরা এমনটি করি তাহলে তা হবে বড়ই অসংগত ও অন্যায় কথা।" কিভাবে তারা নিজেদের জাতি ও তার উপাস্যদের ত্যাগ করে কোন প্রকার সাহায্য-সহায়তা ও সাজসরঞ্জাম ছাড়াই গুহার মধ্যে লুকিয়ে জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু সত্য থেকে এক চুল পরিমাণও সরে গিয়ে নিজের জাতির সাথে আপোস করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর যখন তারা জেগে উঠলেন তখনও তারা যে বিষয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ না করুন, যদি তাদের জাতি কোনভাবে তাদেরকে নিজেদের ধর্মের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় তাহলে তারা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এসব ঘটনা উল্লেখ করার পর এখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে—আর আসলে ইসলাম বিরোধীদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যেই তাঁকে বলা হচ্ছে—যে, এ মুশরিক ও সত্য অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর সাথে আপোস করার আদৌ কোন প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে তাকে হুবহু তাদের সামনে পেশ করে দাও। যদি তারা মানতে চায় তাহলে মেনে নিক আর যদি না মানতে চায় তাহলে নিজেরাই অশুভ পরিণামের মুখোমুখি হবে। যারা মেনে নিয়েছে তারা কম বয়েসী যুবক অথবা অর্থ ও কপর্দকহীন ফকীর, মিসকীন, দাস বা মজুর যেই হোক না কেন তারাই মহামূল্যবান হীরার টুকরা এবং তাদেরকেই এখানে প্রিয়ভাজন করা হবে। তাদেরকে বাদ দিয়ে এমন সব বড় বড় সরদার ও প্রধানদেরকে কোন কাজেই গ্রাহ্য করা হবে না তারা যত বেশী দুনিয়াবী শান শওকতের অধিকারী হোক না কেন, তারা আল্লাহ থেকে গাফিল এবং নিজেদের প্রবৃত্তির দাস।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

৫ রুকূ'

হে মুহাম্মাদ! এদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে দাও।৩৬ দু' ব্যক্তি ছিল। তাদের একজনকে আমি দু'টি আংগুর বাগান দিয়েছিলাম এবং সেগুলোর চারদিকে খেজুর গাছের বেড়া দিয়েছিলাম আর তার মাঝখানে রেখেছিলাম কৃষি ক্ষেত। দু'টি বাগানই ভাল ফলদান করতো এবং ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা সামান্যও ত্রুটি করতো না। এ বাগান দু'টির মধ্যে আমি একটি নহর প্রবাহিত করেছিলাম এবং সে খুব লাভবান হয়েছিল। এসব কিছু পেয়ে একদিন সে তার প্রতিবেশীর সাথে কথা প্রসংগে বললো, "আমি তোমার চেয়ে বেশী ধনশালী এবং আমার জনশক্তি তোমার চেয়ে বেশী।" তারপর সে তার বাগানে প্রবেশ করলো৩৭ এবং নিজের প্রতি জালেম হয়ে বলতে লাগলো ঃ "আমি মনে করি না এ সম্পদ কোন দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩২. 'সুরাদিক' শব্দের আসল মানে হচ্ছে তাঁবুর চারদিকের ক্যাম্বিস কাপড়ের ঘের। কিন্তু জাহান্নামের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার করলে মনে হয় 'সুরাদিক' মানে হবে তার লেলিহান শিখার বিস্তার এবং উত্তাপের প্রভাব বাইরের এলাকায় যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সেই সমগ্র এলাকার সীমানাই হচ্ছে 'সুরাদিক'। আয়াতে বলা হয়েছে, "তার সুরাদিক তাদেরকে ঘিরে নিয়েছে।" কেউ কেউ এটিকে ভবিষ্যত অর্থে নিয়েছে। অর্থাৎ এর মানে এ বুঝেছে যে, পরলোকে জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। কিন্তু আমি মনে করি এর মানে হবে, সত্য থেকে যে জালেম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে এখান থেকেই জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখার আওতাভুক্ত হয়ে গেছে এবং তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

৩৩. 'মুহ্‌ল' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবী অভিধানগুলোয় বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এর মানে লিখেছেন তেলের তলানি। কারোর মতে এ শব্দটি "লাভা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, গলিত ধাতু। আবার কারোর মতে এর মানে পুঁজ ও রক্ত।

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً لا وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لا لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ج اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

এবং আমি আশা করি না কিয়ামতের সময় কখনো আসবে। তবুও যদি আমাকে কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়েও নেয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর চাইতেও বেশী জাঁকালো জায়গা পাবো।”[৩৮] তার প্রতিবেশী কথাবার্তার মধ্যে তাকে বললো, “তুমি কি কুফরী করছো সেই সত্তার যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে পয়দা করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাবয়ব মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন?”[৩৯] আর আমার ব্যাপারে বলবো, আমার রব তো সেই আল্লাহই এবং আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না। আর যখন তুমি নিজের বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন তুমি কেন বললে না, “আল্লাহ যা চান তাই হয়, তাঁর প্রদত্ত শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই?[৪০] যদি তুমি সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে আমাকে তোমার চেয়ে কম পেয়ে থাকো তাহলে অসম্ভব নয় আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভাল কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানের ওপর আকাশ থেকে কোন আপদ পাঠাবেন যার ফলে তা বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরে পরিণত হবে।

৩৪. প্রাচীনকালে রাজা বাদশাহরা সোনার কাঁকন পরতেন। জান্নাতবাসীদের পোশাকের মধ্যে এ জিনিসটির কথা বর্ননা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সেখানে তাদেরকে রাজকীয় পোশাক পরানো হবে। একজন কাফের ও ফাসেক বাদশাহ সেখানে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং একজন মুমিন ও সৎ মজদুর সেখানে থাকবে রাজকীয় জৌলুসের মধ্যে।

৩৫. 'আরাইক' শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে “আরীকাহ” আরবী ভাষায় আরীকাহ এমন ধরনের আসনকে বলা হয় যার ওপর ছত্র খাটানো আছে। এর মাধ্যমেও

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে এবং তুমি তাকে কোনক্রমেই উঠাতে পারবে না।" শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ফসল বিনষ্ট হলো এবং সে নিজের আংগুর বাগান মাচানের ওপর, লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখে নিজের নিয়োজিত পুঁজির জন্য আফসোস করতে থাকলো এবং বলতে লাগলো, "হায়! যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম।" —সে সময় আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কোন গোষ্ঠীও ছিল না, আর সে নিজেও এ বিপদের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না। তখন জানা গেলো, কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে ন্যস্ত, যিনি সত্য। আর পুরস্কার সেটাই ভাল, যা তিনি দান করেন এবং পরিণতি সেটাই শ্রেয়, যা তিনি দেখান।

এখানে এ ধারণা দেয়াই উদ্দেশ্য যে, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী রাজকীয় সিংহাসনে বসে থাকবে।

৩৬. এ উদাহরণটির প্রাসংগিক সম্পর্ক বুঝার জন্য পেছনের রুকূ'র বিশেষ আয়াতটি সামনে থাকা দরকার যাতে মক্কার অহংকারী সরদারদের কথার জবাব দেয়া হয়েছিল। সরদাররা বলেছিল, আমরা গরীব মুসলমানদের সাথে বসতে পারি না, তাদেরকে সরিয়ে দিলে আমরা তোমার কাছে গিয়ে বসে তুমি কি বলতে চাও তা শুনতে পারি। সূরা আল কালামের ১৭ থেকে ৩৩ আয়াতে যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তাও এখানে নজরে রাখা উচিত। তাছাড়া সূরা মার্‌য়ামের ৭৩–৭৪ আয়াত, আল মু'মিনুনের ৫৫ থেকে ৬১ আয়াত, সাবার ৩৪–৩৬ আয়াত এবং হা–মীম সাজদার ৪৯–৫০ আয়াতের ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া দরকার।

৩৭. অর্থাৎ যে বাগানগুলোকে সে নিজের বেহেশত মনে করছিল। অর্বাচীন লোকেরা দুনিয়ায় কিছু ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শান–শওকতের অধিকারী হলেই হামেশা এ বিভ্রান্তির শিকার হয় যে, তারা দুনিয়াতেই বেহেশত পেয়ে গেছে। এখন আর এমন কোন্ বেহেশত আছে যা অর্জন করার জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে?

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٦﴾

৬ রুকূ’

আর হে নবী! দুনিয়ার জীবনের তাৎপর্য তাদেরকে এ উপমার মাধ্যমে বুঝাও যে, আজ আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে গেলো আবার কাল এ উদ্ভিদগুলোই শুকনো ভূষিতে পরিণত হলো, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।[৪১] এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য-শোভা মাত্র। আসলে তো স্থায়িত্ব লাভকারী সৎকাজগুলোই তোমার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই উত্তম আশা-আকাংখা সফল হবার মাধ্যম।

৩৮. অর্থাৎ যদি পরকাল থেকেই থাকে তাহলে আমি সেখানে এখানকার চেয়েও বেশী সচ্ছল থাকবো। কারণ এখানে আমার সচ্ছল ও ধনাঢ্য হওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, আমি আল্লাহর প্রিয়।

৩৯. যদিও এ ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি বরং وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ এর শব্দাবলী প্রকাশ করছে যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করতো, তবুও তার প্রতিবেশী তাকে আল্লাহর সাথে কুফরী করার দায়ে অভিযুক্ত করলো। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কুফরী করা নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার নাম নয় বরং অহংকার, গর্ব, দম্ভ ও আখেরাত অস্বীকারও কুফরী হিসেবে গণ্য। যে ব্যক্তি মনে করলো, আমিই সব, আমার ধন-সম্পদ ও শান শওকত কারোর দান নয় বরং আমার শক্তি ও যোগ্যতার ফল এবং আমার সম্পদের ক্ষয় নেই, আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবার কেউ নেই এবং কারোর কাছে আমাকে হিসেব দিতেও হবে না, সে আল্লাহকে মানলেও নিছক একটি অস্তিত্ব হিসেবেই মানে, নিজের মালিক প্রভু এবং শাসনকর্তা হিসেবে মানে না। অথচ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মানেই হচ্ছে উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বলে স্বীকার করা, আল্লাহকে নিছক একটি অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার নাম ঈমান নয়।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

সেই দিনের কথা চিন্তা করা দরকার যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো[৪২] এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে সম্পূর্ণ অনাবৃত[৪৩] আর আমি সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এমনভাবে ঘিরে এনে একত্র করবো যে, (পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্য থেকে) একজনও বাকি থাকবে না।[৪৪] এবং সবাইকে তোমার রবের সামনে লাইনবন্দী করে পেশ করা হবে।—নাও দেখে নাও, তোমরা এসে গেছো তো আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে যেমনটি আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।[৪৫] তোমরা তো মনে করেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত ক্ষণ নির্ধারিতই করিনি।—আর সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং তারা বলছে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা, আমাদের ছোট বড় এমন কোন কিছুই এখানে লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারোর প্রতি জুলুম করবেন না।

৪০. "অর্থাৎ আল্লাহ যা চান তাই হবে। আমাদের ও অন্য কারোর কোন ক্ষমতা নেই। আমাদের যদি কোন জোর চলতে পারে তাহলে তা চলতে পারে একমাত্র আল্লাহরই সুযোগ ও সাহায্য–সহযোগিতা দানের মাধ্যমেই।"

৪১. অর্থাৎ তিনি জীবনও দান করেন আবার মৃত্যুও। তিনি উত্থান ঘটান আবার পতনও ঘটান। তাঁর নির্দেশে বসন্ত আসে এবং পাতা ঝরা শীত মওসুমও তাঁর নির্দেশেই আসে। আজ যদি তুমি সচ্ছল ও আয়েশ আরামের জীবন যাপন করে থাকো তাহলে এ অহংকারে মত্ত হয়ে থেকো না যে, এ অবস্থার পরিবর্তন নেই। যে আল্লাহর হুকুমে তুমি এসব কিছু লাভ করেছো তাঁরই হুকুমে এসব কিছু তোমার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেয়া যেতে পারে।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ۭ أَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۭ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৭ রুকূ'

স্মরণ করো যখন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা করো তখন তারা সিজদা করেছিল কিন্তু ইবলীস করেনি।[৪৭] সে ছিল জিনদের একজন, তাই তার রবের হুকুমের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেলো।[৪৮] এখন কি তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং তার বংশধরদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছো অথচ তারা তোমাদের দুশমন? বড়ই খারাপ বিনিময় জালেমরা গ্রহণ করছে!

৪২. অর্থাৎ যখন যমীনের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে এবং পাহাড় ঠিক এমনভাবে চলতে শুরু করবে যেমন আকাশে মেঘেরা ছুটে চলে। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ অবস্থাটিকে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ

"তুমি পাহাড়গুলো দেখো এবং মনে করো এগুলো অত্যন্ত জমাটবদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু এগুলো চলবে ঠিক যেমন মেঘেরা চলে।" (আন্ নামল ঃ ৮৮)।

৪৩. অর্থাৎ এর ওপর কোন শ্যামলতা, বৃক্ষ-তরুলতা এবং ঘরবাড়ি থাকবে না। সারাটা পৃথিবী হয়ে যাবে একটা ধূ ধূ প্রান্তর। এ সূরার সূচনায় এ কথাটিই বলা হয়েছিল এভাবে যে, "এ পৃথিবী পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সেসবই আমি লোকদের পরীক্ষার জন্য একটি সাময়িক সাজসজ্জা হিসেবে তৈরী করেছি। এক সময় আসবে যখন এটি সম্পূর্ণ একটি পানি ও বৃক্ষ লতাহীন মরুপ্রান্তরে পরিণত হবে।"

৪৪. অর্থাৎ আদম থেকে নিয়ে কিয়ামতের পূর্বে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত যেসব মানুষ জন্ম নেবে, তারা মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুনিয়ার বুকে একবার মাত্র নিঃশ্বাস নিলেও, তাদের প্রত্যেককে সে সময় পুনরবার পয়দা করা হবে এবং সবাইকে একই সংগে জমা করে দেয়া হবে।

৪৫. অর্থাৎ সে সময় আখেরাত অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে ঃ দেখো, নবীগণ যে খবর দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে তো। তারা তোমাদের বলতেন, আল্লাহ যেভাবে তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন। তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলে। কিন্তু এখন বলো, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হয়েছে কি না?

৪৬. অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি অপরাধ করেনি কিন্তু সেটি খামাখা তার নামে লিখে দেয়া হয়েছে, এমনটি কখনো হবে না। আবার কোন ব্যক্তিকে তার অপরাধের পাওনা সাজার বেশী সাজা দেয়া হবে না এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অযথা পাকড়াও করেও শাস্তি দেয়া হবে না।

৪৭. এ বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় আদম ও ইবলীসের কাহিনীর প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পথভ্রষ্ট লোকদেরকে তাদের এ বোকামির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া যে, তারা নিজেদের স্নেহশীল ও দয়াময় আল্লাহ এবং শুভাকাংখী নবীদেরকে ত্যাগ করে এমন এক চিরন্তন শত্রুর ফাঁদে পা দিচ্ছে যে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৪৮. অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল না। বরং সে ছিল জিনদের একজন। তাই তার পক্ষে আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ফেরেশতাদের ব্যাপারে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বলে, তারা প্রকৃতিগতভাবে অনুগত ও হুকুম মেনে চলে ঃ

لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

"আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুমই দেন না কেন তারা তার নাফরমানী করে না এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।" (আত্ তাহরীম ঃ ৬)

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

"তারা অবাধ্য হয় না, তাদের রবকে, যিনি তাদের ওপর আছেন, ভয় করে এবং তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তাই করে।" (আন্ নহ্‌ল ঃ ৫০)

অন্যদিকে জিন হচ্ছে মানুষের মতো একটি স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টি। তাদেরকে জন্মগত আনুগত্যশীল হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদেরকে কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয়টি করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ সত্যটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ইবলীস ছিল জিনদের দলভুক্ত, তাই সে স্বেচ্ছায় নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করে ফাসেকীর পথ বাছাই করে নেয়। এ সুস্পষ্ট বক্তব্যটি লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এক ধরনের ভুল ধারণা দূর করে দেয়। এ ধারণাটি হচ্ছে ঃ ইবলীস ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত ছিল এবং তাও আবার সাধারণ ও মামুলি ফেরেশ্‌তা নয়, ফেরেশ্‌তাদের সরদার। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আল হিজর ২৭ এবং আল জিন ১৩-১৫ আয়াত)।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, যদি ইবলীস ফেরেশ্‌তাদের দলভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে কুরআনের এ বর্ণনা পদ্ধতি কেমন করে সঠিক হতে পারে যে, "আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সবাই সিজদা করলো কিন্তু ইবলীস করলো না?" এর জবাব হচ্ছে, ফেরেশ্‌তাদেরকে সিজদা করার হুকুম দেবার অর্থ এ ছিল যে, ফেরেশ্‌তাদের কর্ম ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী পৃষ্ঠে অস্তিত্বশীল সকল সৃষ্টিও মানুষের হুকুমের অনুগত হয়ে যাবে। কাজেই ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে এ সমস্ত সৃষ্টিও সিজদানত হলো কিন্তু ইবলীস তাদের সাথে সিজদা করতে অস্বীকার করলো। (ইবলীস শব্দের অর্থ জানার জন্য আল মু'মিনুনের ৭৩ টীকা দেখুন)।

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টিতেও তাদেরকে শরীক করিনি।[৪৯] পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করা আমার রীতি নয়।

তাহলে সেদিন এরা কি করবে যেদিন এদের রব এদেরকে বলবে, ডাকো সেই সব সত্তাকে যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে?[৫০] এরা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা এদেরকে সাহায্য করতে আসবে না এবং আমি তাদের মাঝখানে একটিমাত্র ধ্বংস গহবর তাদের সবার জন্য বানিয়ে দেবো।[৫১] সমস্ত অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের এর মধ্যে পড়তে হবে এবং এর হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

৪৯. এর অর্থ হচ্ছে, এ শয়তানরা তোমাদের আনুগত্য ও বন্দেগী লাভের হকদার হয়ে গেলো কেমন করে? বন্দেগী তো একমাত্র স্রষ্টারই অধিকার হতে পারে। আর এ শয়তানদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, এদের আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্মে শরীক হওয়া তো দূরের কথা এরা নিজেরাই তো সৃষ্টি মাত্র।

৫০. এখানে আবার সেই একই বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ও তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করে অন্য কারো বিধান ও নেতৃত্ব মেনে চলা আসলে তাকে মুখে আল্লাহর শরীক বলে ঘোষণা না দিলেও আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে তাকে শরীক করারই শামিল। বরং ঐ ভিন্ন সত্তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেও যদি আল্লাহর হুকুমের মোকাবিলায় তাদের হুকুম মেনে চলা হয় তাহলেও মানুষ শির্‌কের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। কাজেই এখানে শয়তানদের ব্যাপারে প্রাকাশ্যে দেখা যাচ্ছে, দুনিয়ায় সবাই তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছে কিন্তু এ অভিশাপের পরও যারা তাদের অনুসরণ করে কুরআন তাদের সবার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনছে যে, তোমরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরীক করে রেখেছো। এটি বিশ্বাসগত শির্‌ক নয় বরং কর্মগত শির্‌ক এবং কুরআন একেও শির্‌ক বলে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ১ খণ্ড, আন্ নিসা, টীকা ৯১–১৪৫; আল আন'আম

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৮ রুকূ'

আমি এ কুরআনে লোকদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি কিন্তু মানুষ বড়ই বিবাদপ্রিয়। তাদের সামনে যখন পথনির্দেশ এসেছে তখন কোন্ জিনিসটি তাদেরকে তা মেনে নিতে এবং নিজেদের রবের সামনে ক্ষমা চাইতে বাধা দিয়েছে? এ জিনিসটি ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে বাধা দেয়নি যে, তারা প্রতীক্ষা করেছে তাদের সাথে তাই ঘটুক যা পূর্ববর্তী জাতিদের সাথে ঘটে গেছে অথবা তারা আযাবকে সামনে আসতে দেখে নিক।[৫২]

রসূলদেরকে আমি সুসংবাদ দান ও সতর্ক করার দায়িত্ব পালন ছাড়া অন্য কোন কাজে পাঠাই না।[৫৩] *কিন্তু কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মিথ্যার হাতিয়ার দিয়ে সত্যকে হেয় করার চেষ্টা করে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করেছে।*

৮৭–১০৭; ২ খণ্ড, আত তাওবাহ্, টীকা ৩১; ইবরাহীম, টীকা ৩২; ৩ খণ্ড, মার্‌য়াম, ৩৭ টীকা; আল মু'মিনুন, ৪১ টীকা; আল ফুরকান ৫৬ টীকা; আল কাসাস, ৮৬ টীকা; ৪ খণ্ড সাবা ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩; ইয়াসীন ৫৩ টীকা; আশ্ শূরা, ৩৮ টীকা; আল–জাসিয়াহ, ৩০ টীকা)।

৫১. মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। একটি অর্থ আমি অনুবাদে অবলম্বন করেছি এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবো।" অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল আখেরাতে তা ঘোরতর শত্রুতায় পরিবর্তিত হবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيٰتِ رَبِّهٖ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۚ
إِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ
تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ
ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَّهُمْ
مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرٰى أَهْلَكْنٰهُمْ
لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

আর কে তার চেয়ে বড় জালেম, যাকে তার রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সেই খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায় যার সাজ–সরঞ্জাম সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরী করেছে? (যারা এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথের দিকে যতই আহবান কর না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না।[৫৪]

তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইলে দ্রুত আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, তা থেকে পালিয়ে যাবার কোন পথই তারা পাবে না।[৫৫]

এ শাস্তিপ্রাপ্ত জনপদগুলো তোমাদের সামনে আছে,[৫৬] *এরা জুলুম করলে আমি এদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং এদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।*

৫২. অর্থাৎ যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার ব্যাপারে কুরআন কোন ফাঁক রাখেনি। মন ও মস্তিষ্ককে আবেদন করার জন্য যতগুলো প্রভাবশালী পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভবপর ছিল সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তা এখানে অবলম্বিত হয়েছে। এখন সত্যকে মেনে নেবার পথে তাদের জন্য কি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? শুধুমাত্র এটিই যে তারা আযাবের অপেক্ষা করছে। পিটুনি খাওয়া ছাড়া তারা সোজা হতে চায় না।

৫৩. এ আয়াতেরও দু'টি অর্থ হতে পারে এবং এ দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۫ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۫ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৯ রুকূ'

(এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল, "দুই দরিয়ার সংগমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সফর শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।"[৫৭] সে অনুসারে যখন তারা তাদের সংগমস্থলে পৌঁছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে গাফেল হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ংগের মতো পথ তৈরী করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর মূসা তার খাদমকে বললো, "আমাদের নাশ্‌তা আনো, আজকের সফরে তো আমরা ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" খাদেম বললো, "আপনি কি দেখেছেন, কি ঘটে গেছে? যখন আমরা সেই পাথরটার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমার মাছের কথা মনে ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন গাফেল করে দিয়েছিল যে, আমি (আপনাকে) তার কথা বলতে ভুলে গেছি। মাছ তো অদ্ভুতভাবে বের হয়ে দরিয়ার মধ্যে চলে গেছে।"

একটি অর্থ হচ্ছে, রসূলদেরকে আমরা এ জন্য পাঠাই যে, ফায়সালার সময় আসার আগে তারা লোকদেরকে আনুগত্যের ভাল ও নাফরমানির খারাপ পরিণতির ব্যাপারে সজাগ করে দেবেন। কিন্তু এ নির্বোধ লোকেরা আগাম সতর্কবাণী থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করছে না এবং রসূল তাদেরকে যে অশুভ পরিণাম থেকে বাঁচাতে চান তারই মুখোমুখি হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যদি আযাব ভোগ করাই তাদের কাছে কাংখিত হয়ে থাকে তাহলে নবীর কাছে তার দাবী না করা উচিত। কারণ নবীকে আযাব দেবার জন্য নয় বরং আযাব দেবার পূর্বে শুধুমাত্র সাবধান করার জন্য পাঠান হয়।

৫৪. অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি বা দল যুক্তি, প্রমাণ ও শুভেচ্ছামূলক উপদেশের মোকাবিলায় বিতর্ক প্রিয়তায় নেমে আসে, মিথ্যা ও প্রতারণার অস্ত্র দিয়ে সত্যের মোকাবিলা করতে থাকে এবং নিজের কৃতকর্মের খারাপ পরিণতি দেখার আগে কারোর বুঝাবার পর নিজের ভুল মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না তখন আল্লাহ তার অন্তরকে তালাবদ্ধ করেন, সত্যের প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য তার কানকে বধির করে দেন। এ ধরনের লোকেরা উপদেশ বাণীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে না বরং ধ্বংসের গর্তে পড়ে যাবার পরই এদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এরা যে পথে এগিয়ে চলছিল সেটিই ছিল ধ্বংসের পথ।

৫৫. অর্থাৎ কেউ কোন দোষ করলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। তাঁর দয়াগুণের দাবী অনুযায়ী অপরাধীদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে তিনি তাড়াহুড়া করেন না এবং তাদের সংশোধিত হবার জন্য সুযোগ দিতে থাকেন দীর্ঘকাল। কিন্তু বড়ই মূর্খ তারা যারা এ ঢিল দেয়াকে ভুল অর্থে গ্রহণ করে এবং মনে করে তারা যাই কিছু করুক না কেন তারেদকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৫৬. এখানে সাবা, সামূদ, মাদায়েন ও লূতের জাতির বিরাণ এলাকাগুলোর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কুরাইশরা নিজেদের বাণিজ্যিক সফরের সময় যাওয়া আসার পথে এসব জায়গা দেখতো এবং আরবের অন্যান্য লোকেরাও এগুলো সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিল।

৫৭. এ পর্যায়ে কাফের ও মুমিন উভয় গোষ্ঠীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করাই মূল উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি হচ্ছে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে মানুষের স্থূল দৃষ্টি তা থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল গ্রহণ করে। কারণ আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সামনে রেখে কাজ করেন তা তার জানা থাকে না। মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, জালেমরা স্ফীত হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে, নিরপরাধরা কষ্ট ও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, নাফরমানদের প্রতি অজস্রধারে অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে, আনুগত্যশীলদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে, অসৎলোকেরা আয়েশ আরামে দিন যাপন করছে এবং সৎলোকদের দূরবস্থার শেষ নেই। লোকেরা নিছক এর গুঢ় রহস্য না জানার কারণে সাধারণভাবে তাদের মনে দোদুল্যমানতা এমন কি বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। কাফের ও জালেমরা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে, এ দুনিয়াটা একটা অরাজকতার মুল্লুক। এখানে কোন রাজা নেই। আর থাকলেও তার শাসন শৃংখলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখানে যার যা ইচ্ছা করতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস বা কৈফিয়ত তলব করার কেউ নেই। এ ধরনের ঘটনাবলী দেখে মুমিন মনমরা হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় কঠিন পরীক্ষাকালে তার ঈমানের ভিতও নড়ে যায়। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজের ইচ্ছা জগতের পরদা উঠিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সেখানে দিনরাত কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কি কারণে হচ্ছে এবং ঘটনার বহিরাংগন তার অভ্যন্তর থেকে কেমন ভিন্নতর হয় তা তিনি জানতে পারেন।

হযরত মূসার (আ) এ ঘটনাটি কোথায় ও কবে সংঘটিত হয়? কুরআনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। হাদীসে অবশ্যি আমরা আওফীর একটি বর্ণনা পাই, যাতে তিনি

ভূমধ্য সাগর
ফিলিস্তিন
উত্তর
মিশর
আরব
নীলনদ
লোহিত সাগর
জিদ্দা
মক্কা
নীলনদ
নীলনদ
আতবারা নদী
বর্তমান খার্তুম নগরী
আবিসিনিয়া

হযরত মূসা (আ) ও খিজিরের (আ) কিসসা সংক্রান্ত মানচিত্র
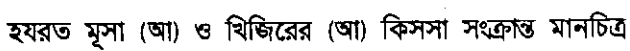
ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) যখন মিসরে নিজের জাতির বসতি স্থাপন করেন তখন এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রেওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে তা এ বর্ণনা সমর্থন করে না। তাছাড়া অন্য কোন উপায়েও একথা প্রমাণ হয় না যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) কখনো মিসরে গিয়েছিলেন। বরং কুরআন একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, মিসর ত্যাগ করার পর তাঁর সমস্তটা সময় সিনাই ও তীহ অঞ্চলে কাটে। কাজেই এ রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি। এক, হযরত মূসাকে (আ) হয়তো তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছিল। কারণ নবুওয়াতের শুরুতেই পয়গম্বরদের জন্য এ ধরনের শিক্ষা ও অনুশীলনের দরকার হয়ে থাকে। দুই, মুসলমানরা মক্কা মু'আয্‌যমায় যে ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল বনী ইসরাঈলও যখন তেমনি ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিল তখনই হযরত মূসার জন্য এ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে। এ দু'টি কারণে আমাদের অনুমান, (অবশ্য সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ জানেন) এ ঘটনার সম্পর্ক এমন এক যুগের সাথে যখন মিসরে বনী ইস্‌রাঈলদের ওপর ফেরাউনের জুলুমের সিলসিলা জারি ছিল এবং মক্কার কুরাইশ সরদারদের মতো ফেরাউন ও তার সভাসদরাও আযাবে বিলম্ব দেখে ধারণা করছিল যে, তাদের ওপরে এমন কোন সত্তা নেই যার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং মক্কার মজলুম মুসলমানদের মতো মিসরের মজলুম মুসলমানরাও অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, হে আল্লাহ! আর কত দিন এ জালেমদেরকে পুরস্কৃত এবং আমাদের ওপর বিপদের সয়লাব-স্রোত প্রবাহিত করা হবে? এমনকি হযরত মূসাও চীৎকার করে উঠেছিলেন :

رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ج-

"হে পরওয়ারদিগার! তুমি ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে দুনিয়ার জীবনে বড়ই শান শওকত ও ধন-দওলত দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক! এটাকি এ জন্য যে, তারা দুনিয়াকে তোমার পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে?" (ইউনুস : ৮৮)

যদি আমাদের এ অনুমান সঠিক হয় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্ভবত হযরত মূসার (আ) এ সফরটি ছিল সুদানের দিকে। এ ক্ষেত্রে দু' দরিয়ার সংগমস্থল বলতে বুঝাবে বর্তমান খার্তুম শহরের নিকটবর্তী নীল নদের দুই শাখা বাহ্‌রুল আব্‌ইয়াদ (হোয়াইট নীল) ও বাহরুল আযরাক্ (ব্লু নীল) যেখানে এসে মিলিত হয়েছে (দেখুন ২২১ পৃষ্ঠার চিত্র)। হযরত মূসা (আ) সারা' জীবন যেসব এলাকায় কাটিয়েছেন সেসব এলাকায় এ একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও দু'নদীর সংগমস্থল নেই।

এ ঘটনাটির ব্যাপারে বাইবেল একেবারে নীরব। তবে তালমুদে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে এ ঘটনাটিকে মূসার (আ) পরিবর্তে 'রাব্বী ইয়াহহানান বিন লাভীর' সাথে সম্পৃক্ত

করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "হযরত ইলিয়াসের সাথে উল্লেখিত রাব্বীর এ ঘটনাটি ঘটে। হযরত ইলিয়াসকে (আ) দুনিয়া থেকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেয়ার পর ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি দুনিয়ার ব্যাবস্থাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন।" (THE TALMUD SELECTIONS BY·H. POLANO. PP. 313—16) সম্ভবত বনী ইস্‌রাঈলের মিসর ত্যাগের পূর্বেকার ঘটনাবলীর ন্যায় এ ঘটনাটিও সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত থাকেনি এবং শত শত বছর পরে তারা ঘটনার এক জায়গার কথা নিয়ে আর এক জায়গায় জুড়ে দিয়েছে। তালমুদের এ বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের কেউ কেউ একথা বলে দিয়েছেন যে, কুরআনের এ স্থানে যে মূসার কথা বলা হয়েছে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নন বরং অন্য কোন মূসা হবেন। কিন্তু তালমুদের প্রত্যেকটি বর্ণনাকে নির্ভুল ইতিহাস গণ্য করা যেতে পারে না। আর কুরআনে কোন অজানা ও অপরিচিত মূসার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, এ ধরনের কোন কথা অনুমান করার কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে যখন হযরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে মূসা বলতে বনী ইস্‌রাঈলের নবী হযরত মূসাকে (আ) নির্দেশ করেছেন। তখন কোন মুসলমানের জন্য তালমুদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না।

পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কুরআন মজীদের এ কাহিনীটিরও উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করেছেন। তারা তিনটি কাহিনীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে, এসব জায়গা থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি নকল করেছেন এবং তারপর দাবী করেছেন, আমাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গিলগামিশের কাহিনী, দ্বিতীয়টি সুরিয়ানী সিকান্দার নামা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ওপরে যে ইহুদী বর্ণনাটির উল্লেখ আমরা করেছি। কিন্তু এ কুটীল স্বভাব লোকেরা জ্ঞান চর্চার নামে যেসব গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান সেখানে পূর্বাহ্নেই এ সিদ্ধান্ত করে নেন যে, কুরআনকে কোনক্রমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে মেনে নেয়া যাবে না। কাজেই এখন যে কোনভাবেই এ বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু পেশ করেছেন তা অমুক অমুক জায়গা থেকে চুরি করা বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি থেকে গৃহীত। এ ন্যক্কারজনক গবেষণা পদ্ধতিতে তারা এমন নির্লজ্জভাবে টানাহেঁচড়া করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় যে, তা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘৃণায় মন রি রি করে ওঠে এবং মানুষ বলতে বাধ্য হয় ঃ যদি এর নাম হয় তাত্বিক গবেষণা তাহলে এ ধরনের তত্ব–জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অভিশাপ। কোন জ্ঞানান্বেষণকারী তাদের কাছে যদি কেবলমাত্র চারটি বিষয়ের জবাব চায় তাহলে তাদের বিদ্বেষমূলক মিথ্যাচারের একেবারেই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে ঃ

এক, আপনাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনারা দু'চারটে প্রাচীন গ্রন্থে কুরআনের কোন বর্ণনার সাথে কিছুটা মিলে যায় এমন ধরনের বিষয় পেয়েই দাবী করে বসেন যে, কুরআনের বর্ণনাটি অবশ্যই এ গ্রন্থগুলো থেকে নেয়া হয়েছে?

দুই, আপনারা বিভিন্ন ভাষার যেসব গ্রন্থকে কুরআন মজীদের কাহিনী ও অন্যান্য বর্ণনার উৎস গণ্য করেছেন সেগুলোর তালিকা তৈরী করলে দস্তুরমতো একটি বড়সড়

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

মূসা বললো, "আমরা তো এরই খোঁজে ছিলাম।"[৫৮] কাজেই তারা দু'জন নিজেদের পদরেখা ধরে পেছনে ফিরে এলো এবং সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেলো, যাকে আমি নিজের অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম।[৫৯]

মূসা তাকে বললো, "আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন?" সে বললো, "আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না। আর তাছাড়া যে ব্যাপারের আপনি কিছুই জানেন না সে ব্যাপারে আপনি সবর করবেনই বা কেমন করে।" মূসা বললো, "ইন্‌শাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী হিসেবেই পাবেন এবং কোন ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুম অমান্য করবো না।" সে বললো, "আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে চলেন তাহলে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।"

লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকা তৈরী হয়ে যাবে। এ ধরনের কোন লাইব্রেরী কি সে সময় মক্কায় ছিল এবং বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকবৃন্দ সেখানে বসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপাদান সরবরাহ করছিলেন? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের বাইরে, যে দু'তিনটি সফর করেছিলেন শুধুমাত্র তারই ওপর আপনারা নির্ভর করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বাণিজ্যিক সফরগুলোয় তিনি কয়টি লাইব্রেরীর বই অনুলিখন বা মুখস্ত করে এনেছিলেন? নবুওয়াতের ঘোষণার একদিন আগেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাপ–আলোচনা ও কথাবার্তায় এ ধরনের তথ্যের কোন চিহ্ন পাওয়া না যাওয়ার যুক্তিসংগত কারণ কি?

তিন, মক্কার কাফের সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃস্টান সবাই অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাগুলো কোথা থেকে আনেন। আপনারা বলতে পারেন নবীর (সা) সমকালীনরা তাঁর এ চুরির কোন খবর পায়নি কেন? এর কারণ কি? তাদেরকে তো বারবারই এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল যে, এ কুরআন আল্লাহ নাযিল করছেন, অহী ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উৎস নেই, যদি তোমরা একে মানুষের বাণী বলো তাহলে মানুষ যে এমন বাণী তৈরী করতে পারে তা প্রমাণ করে দাও। এ চ্যালেঞ্জটি নবীর (সা) সমকালীন ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেংগে দিয়েছিল। তারা এমন একটি উৎসের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে পারেনি যা থেকে কুরআনের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে বলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা সন্দেহও করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমকালীনরা এ গোয়েন্দাবৃত্তিতে ব্যর্থ হলো কেন? আর হাজার বারোশো বছর পরে আজ বিরোধী পক্ষ এতে সফল হচ্ছেন কেমন করে?

শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, একথার সম্ভাবনা তো অবশ্যি আছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং এ কিতাবটি বিগত ইতিহাসের এমনসব ঘটনার সঠিক খবর দিচ্ছে যা হাজার হাজার বছর ধরে শ্রুতির মাধ্যমে বিকৃত হয়ে অন্য লোকদের কাছে পৌছেছে এবং গল্পের রূপ নিয়েছে। কোন্ ন্যায়সংগত প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্ভাবনাটিকে একদম উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং কেন শুধুমাত্র এ একটি সম্ভাবনাকে আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, লোকদের মধ্যে গল্প ও মৌখিক প্রবাদ আকারে যেসব কিস্সা কাহিনী প্রচলিত ছিল কুরআন সেগুলো থেকেই গৃহীত হয়েছে? ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হঠকারিতা ছাড়া এ প্রাধান্য দেবার অন্য কোন কারণ বর্ণনা করা যেতে পারে কি?

এ প্রশ্নগুলো নিয়ে যে ব্যক্তিই একটু চিন্তা-ভাবনা করবে তারই এ সিদ্ধান্তে পৌছে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকতে পারে না যে, প্রাচ্যবিদরা "তত্ত্বজ্ঞানের" নামে যা কিছু পেশ করেছেন কোন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী ও জ্ঞানানুশীলনকারীর কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই।

৫৮. অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের এ নিশানীটিই তো আমাকে বলা হয়েছিল। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ইংগিতেই হযরত মূসা (আ) এ সফর করছিলেন। তাঁর গন্তব্য স্থলের চিহ্ন হিসেবে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, যেখানে তাঁদের নাশ্তার জন্য নিয়ে আসা মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে সেখানে তাঁরা আল্লাহর সেই বান্দার দেখা পাবেন, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল।

৫৯. সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসে এ বান্দার নাম বলা হয়েছে খিযির। কাজেই ইসরাঈলী বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে যারা হযরত ইলিয়াসের (আ) সাথে এ ঘটনাটি জুড়ে দেন তাদের বক্তব্য মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়। তাদের এ বক্তব্য শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর সাথে সংঘর্ষশীল হবার কারণেই যে ভুল তা নয় বরং এ কারণেও ভুল যে, হযরত ইলিয়াস হযরত মূসার কয়েকশ বছর পরে জন্মলাভ করেছিলেন।

১০ রুকূ'

অতপর তারা দু'জন রওয়ানা হলো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করলো তখন ঐ ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করে দিল। মূসা বললো, "আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকে ডুবিয়ে দেবার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? এতো আপনি বড়ই মারাত্মক কাজ করলেন।" সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না?" মূসা বললো, "ভুল চুকের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমার ব্যাপারে আপনি কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।"

এরপর তারা দু'জন চললো। চলতে চলতে তারা একটি বালকের দেখা পেলো এবং ঐ ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। মূসা বললো, "আপনি এক নিরপরাধকে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি? এটা তো বড়ই খারাপ কাজ করলেন।" সে বললো, "আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না?" মূসা বললো, "এরপর যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওজর পেয়ে গেছেন।"

কুরআনে হযরত মূসার (আ) খাদেমের নামও বলা হয়নি। তবে কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইউশা' বিন নূন। পরে তিনি হযরত মূসার (আ) খলীফা হন।

فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ۨاسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ۭ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا
لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي
الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاۗءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ
غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

তারপর তারা সামনের দিকে চললো। চলতে চলতে একটি জনবসতিতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে লোকদের কাছে খাবার চাইলো। কিন্তু তারা তাদের দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখলো, সেটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে দেয়ালটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। মূসা বললো, "আপনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।" সে বললো, "ব্যাস, তোমার ও আমার সংগ শেষ হয়ে গেলো। এখন আমি যে কথাগুলোর ওপর তুমি সবর করতে পারোনি সেগুলোর তাৎপর্য তোমাকে বলবো। সেই নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা সাগরে মেহনত মজদুরী করতো। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহর এলাকা যে প্রত্যেকটি নৌকা জবরদস্তি ছিনিয়ে নিতো। আর ঐ বালকটির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আমাদের আশংকা হলো, এ বালক তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ ও কুফরীর মাধ্যমে তাদেরকে বিব্রত করবে। তাই আমরা চাইলাম তাদের রব তার বদলে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়েও তার চেয়ে ভাল হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় আচরণও বেশী আশা করা যাবে।

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا ج فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ق رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ج وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ط ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

এবার থাকে সেই দেয়ালের ব্যাপারটি। সেটি হচ্ছে এ শহরে অবস্থানকারী দুটি এতীম বালকের। এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো আছে এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক। তাই তোমার রব চাইলেন এ কিশোর দু'টি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাক এবং তারা নিজেদের গুপ্ত ধন বের করে নিক। তোমার রবের দয়ার কারণে এটা করা হয়েছে। নিজ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে আমি এটা করিনি। তুমি যেসব ব্যাপারে সবর করতে পারোনি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।[৬০]

৬০. এ কাহিনীটির মধ্যে একটি বিরাট জটিলতা আছে। এটি দূর করা প্রয়োজন। হযরত খিযির যে তিনটি কাজ করেছিলেন তার মধ্যে তৃতীয় কাজটির সাথে শরীয়াতের বিরোধ নেই কিন্তু প্রথম কাজ দু'টি নিসন্দেহে মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আল্লাহ যতগুলো শরীয়াত নাযিল করেছেন তাদের প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধী। কারোর মালিকানাধীন কোন জিনিস নষ্ট করার এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি কোন শরীয়াত কোন মানুষকে দেয়নি। এমন কি যদি কোন ব্যক্তি ইলহামের মাধ্যমে জানতে পারে যে, সামনের দিকে এক জালেম একটি নৌকা ছিনিয়ে নেবে এবং অমুক বালকটি বড় হয়ে খোদাদ্রোহী ও কাফের হয়ে যাবে তবুও আল্লাহ প্রেরিত শরীয়াতগুলোর মধ্য থেকে কোন শরীয়াতের দৃষ্টিতেই তার জন্য এ তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নৌকা ছেঁদা করে দেয়া এবং একটি নিরপরাধ বালককে হত্যা করা জায়েয নয়। এর জবাবে একথা বলা যে, হযরত খিযির এ কাজ দু'টি আল্লাহর হুকুমে করেছিলেন আসলে এতে এই জটিলতা একটুও দূর হয় না। প্রশ্ন এ নয় যে, হযরত খিযির কার হুকুমে এ কাজ করেছিলেন। এগুলো যে আল্লাহর হুকুমে করা হয়েছিল তা তো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কারণ হযরত খিযির নিজেই বলছেন, তাঁর এ কাজগুলো তাঁর নিজের ক্ষমতা ইখতিয়ারভুক্ত নয় বরং এগুলোর উদ্যোক্তা হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও করুণা। আর হযরত খিযিরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ করে আল্লাহ নিজেই এর সত্যতার ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহর হুকুমে যে এ কাজ করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে যে আসল প্রশ্ন দেখা দেয় সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর এ বিধান কোন্ ধরনের ছিল? একথা সুস্পষ্ট, এগুলো শরীয়াতের বিধান ছিল না। কারণ কুরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ থেকে আল্লাহর শরীয়াতের যেসব মূলনীতি প্রমাণিত হয়েছে তার কোথাও কোন ব্যক্তিকে এ সুযোগ দেয়া হয়নি যে, সে

অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই কাউকে হত্যা করতে পারবে। তাই নিশ্চিতভাবে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, এ বিধানগুলো প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এমন সব সৃষ্টিগত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল যেগুলোর আওতাধীনে দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, কাউকে রোগমুক্ত করা হয়, কাউকে মৃত্যু দান করা হয়, কাউকে জীবন দান করা হয়, কাউকে ধ্বংস করা হয় এবং কারোর প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করা হয়। এখন যদি এগুলো সৃষ্টিগত বিধান হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর দায়িত্ব একমাত্র ফেরেশতাগণের ওপরই সোপর্দ হতে পারে। তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শরীয়াতগত বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা–ইখতিয়ার ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর হুকুম তামিল করে থাকে। আর মানুষের ব্যাপারে বলা যায়, সে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন সৃষ্টিগত হুকুম প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিণত হোক বা ইলহামের সাহায্যে এ ধরনের কোন অদৃশ্য জ্ঞান ও হুকুম লাভ করে তা কার্যকর করুক, সর্বাবস্থায় যে কাজটি সে সম্পন্ন করেছে সেটি যদি শরীয়াতের কোন বিধানের পরিপন্থী হয় তাহলে তার গুনাহগার হওয়া থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কারণ মানব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষ শরীয়াতের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কোন মানুষ ইলহামের মাধ্যমে শরীয়াতের কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণের হুকুম লাভ করেছে এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিরুদ্ধাচরণকে কল্যাণকর বলা হয়েছে বলেই শরীয়াতের বিধানের মধ্য থেকে কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা তার জন্য বৈধ হয়ে গেছে, শরীয়াতের মূলনীতির মধ্যে কোথাও এ ধরনের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

এটি এমন একটি কথা যার ওপর কেবলমাত্র শরীয়াতের আলেমগণই যে, একমত তাই নয় বরং প্রধান সূফীগণও একযোগে একথা বলেন। আল্লামা আলূসী বিস্তারিতভাবে আবদুল ওয়াহ্‌হাব শি'রানী, মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী, মুজাদ্দিদে আলফিসানি, শায়খ আবদুল কাদের জীলানী, জুনায়েদ বাগদাদী, সাররী সাক্‌তী, আবুল হাসান আন্‌নূরী, আবু সাঈদ আলখাররায্‌, আবুল আব্বাস আহমদ আদ্‌দাইনাওয়ারী ও ইমাম গায্‌যালীর ন্যায় খ্যাতনামা বুযর্গগণের উক্তি উদ্ধৃত করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, তাসাউফপন্থীদের মতেও কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী ইল্‌হামকে কার্যকর করা যার প্রতি ইলহাম হয় তার জন্যও বৈধ নয়।

এখন কি আমরা একথা মেনে নেবো যে, এ সাধারণ নিয়ম থেকে মাত্র একজন মানুষকে পৃথক করা হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন হযরত খিযির? অথবা আমরা মনে করবো, খিযির কোন মানুষ ছিলেন না বরং তিনি আল্লাহর এমনসব বান্দার দলভুক্ত ছিলেন যারা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে (আল্লাহর শরীয়াতের আওতাধীনে নয়) কাজ করেন?

প্রথম অবস্থাটি আমরা মেনে নিতাম যদি কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতো যে, হযরত মূসাকে যে 'বান্দা'র কাছে অনুশীলন লাভের জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনি মানুষ ছিলেন। কিন্তু কুরআন তার মানুষ হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি বরং কেবলমাত্র عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বান্দাদের একজন) বলে ছেড়ে দিয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট, এ বাক্যাংশ থেকে ঐ বান্দার মানব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য হয় না। কুরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় ফেরেশতাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন দেখুন সূরা আম্বিয়া ২৬ আয়াত এবং সূরা যখরুফ ১৯ আয়াত। তাছাড়া কোন সহী হাদীসেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন বক্তব্য উদ্ধৃত হয়নি যাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হযরত

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ
عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ
فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً
الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

১১ রুকূ’

আর হে মুহাম্মাদ! এরা তোমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[৬১] এদেরকে বলে দাও, আমি তার সম্বন্ধে কিছু কথা তোমাদের শুনাচ্ছি।[৬২]

আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছিলাম এবং তাকে সবরকমের সাজ–সরঞ্জাম ও উপকরণ দিয়েছিলাম। সে (প্রথমে পশ্চিমে এক অভিযানের) সাজ–সরঞ্জাম করলো। এমন কি যখন সে সূর্যাস্তের সীমানায় পৌঁছে গেলো[৬৩] তখন সূর্যকে ডুবতে দেখলো একটি কালো জলাশয়ে[৬৪] এবং সেখানে সে একটি জাতির দেখা পেলো। আমি বললাম, “হে যুল্‌কারনাইন! তোমার এ শক্তি আছে, তুমি এদেরকে কষ্ট দিতে পারো অথবা এদের সাথে সদাচার করতে পারো।”[৬৫] সে বললো, “তাদের মধ্য থেকে যে জুলুম করবে আমরা তাকে শাস্তি দেবো তারপর তাকে তার রবের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তিনি তাকে অধিক কঠিন শাস্তি দেবেন। আর তাদের মধ্য থেকে যে ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তার জন্য আছে ভাল প্রতিদান এবং আমরা তাকে সহজ বিধান দেবো।”

খিযিরকে মানব সম্প্রদায়ের একজন সদস্য গণ্য করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসটি সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি উবাই ইবনে কা’ব থেকে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট পৌঁছেছে। সেখানে হযরত খিযিরের জন্য শুধুমাত্র رجل (রজুল) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যদিও মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের জন্য

ব্যবহার করা হয় তবুও শুধুমাত্র মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় না। কাজেই কুরআনে এ শব্দটি জিনদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা জিনে বলা হয়েছে ঃ وَانَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ তাছাড়া এ কথা সুস্পষ্ট যে, জিন বা ফেরেশ্‌তা অথবা অন্য কোন অদৃশ্য অস্তিত্ব যখন মানুষের সামনে আসবে তখন মানুষের আকৃতি ধরেই আসবে এবং এ অবস্থায় তাকে মানুষই বলা হবে। হযরত মারি্য়ামের সামনে যখন ফেরেশ্‌তা এসেছিল তখন কুরআন এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি যে "সেখানে তিনি একজন পুরুষকে পেলেন" হযরত খিযিরের মানুষ হবার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করছে না। এরপর এ জটিলতা দূর করার জন্য আমাদের কাছে হযরত খিযিরকে মানুষ নয় ফেরেশতা হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথই থাকে না। অথবা তাঁকে আল্লাহর এমন কোন সৃষ্টি মনে করতে হবে যিনি শরীয়াতের বিধানের আওতাধীন নন বরং আল্লাহর ইচ্ছা পুরনের কাজে নিযুক্ত একজন কর্মী। প্রথম যুগের আলেমগণের কেউ কেউও এমত প্রকাশ করেছেন এবং ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মাওয়ারদীর বরাত দিয়ে তা উদ্ধৃত করেছেন।

৬১. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ এ বাক্যটির শুরুতে যে "আর" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সম্পর্ক অবশ্যই পূর্ববর্তী কাহিনীগুলোর সাথে রয়েছে। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, মূসা ও খিযিরের কাহিনীও লোকদের প্রশ্নের জবাবে শোনানো হয়েছে। একথা আমাদের এ অনুমানকে সমর্থন করে যে, এ সূরার এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী আসলে মক্কার কাফেররা আহলি কিতাবদের পরামর্শক্রমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল।

৬২. এখানে যে যুলকারনাইনের কথা বলা হচ্ছে তিনি কে ছিলেন, এ বিষয়ে প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজো পর্যন্ত মতবিরোধ চলে আসছে। প্রাচীন যুগের মুফাস্‌সিরগণ সাধারণত যুলকারনাইন বলতে আলেকজাণ্ডারকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে তাঁর যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, আলেকজাণ্ডারের সাথে তার মিল খুবই কম। আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে মুফাসসিরগণের অধিকাংশ এ মত পোষণ করেন যে, তিনি ছিলেন ইরানের শাসনকর্তা খুরস তথা খসরু বা সাইরাস। এ মত তুলনামূলকভাবে বেশী যুক্তিগ্রাহ্য। তবুও এখনো পর্যন্ত সঠিক ও নিশ্চিতভাবে কোন ব্যক্তিকে যুলকারনাইন হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারেনি।

কুরআন মজীদ যেভাবে তার কথা আলোচনা করেছে তা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে চারটি কথা জানতে পারি ঃ

এক, তার যুলকারনাইন (শাব্দিক অর্থ "দু' শিংওয়ালা") উপাধিটি কমপক্ষে ইহুদীদের মধ্যে, যাদের ইংগিতে মক্কার কাফেররা তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিল, নিশ্চয়ই পরিচিত হওয়ার কথা তাই একথা জানার জন্য আমাদের ইসরাঈলী সাহিত্যের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় থাকে না যে, তারা "দু' শিংওয়ালা" হিসেবে কোন্ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে জানতো?
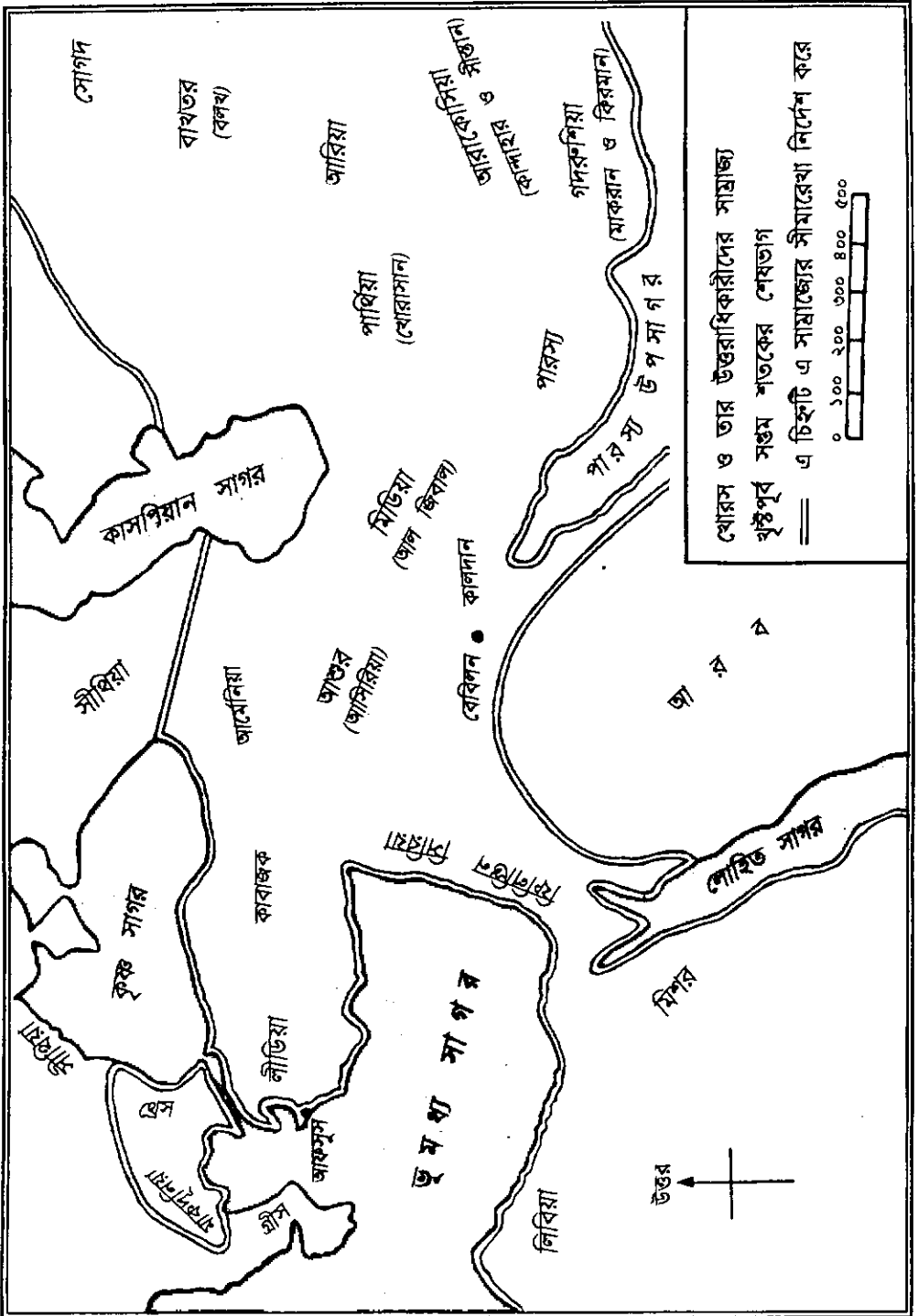
জুলকারনাইন কিস্সা সংক্রান্ত মানচিত্র (সূরা আল–কাহ্ফ ৬২ নং টীকা)

দুই, এ ব্যক্তির অবশ্যই কোন বড় শাসক ও এমন পর্যায়ের বিজেতা হওয়ার কথা যার বিজয় অভিযান পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিচালিত হয়েছিল এবং অন্যদিকে উত্তর–দক্ষিণ দিকেও বিস্তৃত হয়েছিল। কুরআন নাযিলের পূর্বে এ ধরনের কৃতিত্বের অধিকারী মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির কথাই জানা যায়। তাই অনিবার্যভাবে তাদেরই কারোর মধ্যে আমাদের তার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ও বৈশিষ্টও খুঁজে দেখতে হবে।

তিন, তাকে অবশ্যই এমন একজন শাসনকর্তা হতে হবে যিনি নিজের রাজ্যকে ইয়াজুজ মা'জুজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কোন পার্বত্য গিরিপথে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ বৈশিষ্টটির অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের একথাও জানতে হবে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে কোন্ জাতিকে বুঝানো হয়েছে এবং তারপর এও দেখতে হবে যে, তাদের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট এ ধরনের কোন্ প্রাচীর দুনিয়ায় নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেটি কে নির্মাণ করেছে?

চার, তার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলোসহ এ বৈশিষ্টটিও উপস্থিত থাকা চাই যে, তিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা হবেন। কারণ কুরআন এখানে তার এ বৈশিষ্টটিকেই সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট করেছে।

এর মধ্য থেকে প্রথম বৈশিষ্টটি সহজেই খুরসের (বা সাইরাস) বেলায় প্রযোজ্য। কারণ বাইবেলের দানিয়েল পুস্তকে দানিয়েল নবীর যে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে তিনি ইরানীদের উত্থানের পূর্বে মিডিয়া ও পারস্যের যুক্ত সাম্রাজ্যকে একটি দু' শিংওয়ালা মেষের আকারে দেখেন। ইহুদীদের মধ্যে এ "দু' শিংধারী"র বেশ চর্চা ছিল। কারণ তার সাথে সংঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত বেবিলনের সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় এবং বনী ইসরাঈল দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ৮ টীকা)।

দ্বিতীয় চিহ্নটিরও বেশীর ভাগ তার সাথে খাপ খেয়ে যায় কিন্তু পুরোপুরি নয়। তার বিজয় অভিযান নিসন্দেহে পশ্চিমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সমুদ্রসীমা এবং পূর্বে বখ্তর (বলখ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু উত্তরে বা দক্ষিণে তার কোন বড় আকারের অভিযানের সন্ধান এখনো পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়নি। অথচ কুরআন সুস্পষ্টভাবে তার তৃতীয় একটি অভিযানের কথা বর্ণনা করছে। তবুও এ ধরনের একটি অভিযান পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, খুরসের রাজ্য উত্তরে ককেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তৃতীয় চিহ্নটির ব্যাপারে বলা যায়, একথা প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে রাশিয়া ও উত্তর চীনের এমনসব উপজাতিদের বুঝানো হয়েছে যারা তাতারী, মংগল, হূন ও সেথিন নামে পরিচিত এবং প্রাচীন যুগ থেকে সভ্য দেশগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে আসছিল। তাছাড়া একথাও জানা গেছে যে, তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু খুরসই যে, এ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তা এখনো প্রমাণিত হয়নি।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى
قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا
لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ
دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ
اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا
عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

তারপর সে (আর একটি অভিযানের) প্রস্তুতি নিল। এমন কি সে সূর্যোদয়ের সীমানায় গিয়ে পৌঁছুলো। সেখানে সে দেখলো, সূর্য এমন এক জাতির ওপর উদিত হচ্ছে যার জন্য রোদ থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা আমি করিনি।[৬৬] এ ছিল তাদের অবস্থা এবং যুলকারনাইনের কাছে যা ছিল তা আমি জানতাম।

আবার সে (আর একটি অভিযানের) আয়োজন করলো। এমনকি যখন দু' পাহাড়ের মধ্যখানে পৌঁছুলো[৬৭] তখন সেখানে এক জাতির সাক্ষাত পেলো। যারা খুব কমই কোন কথা বুঝতে পারতো।[৬৮] তারা বললো, "হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ[৬৯] এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। আমরা কি তোমাকে এ কাজের জন্য কোন কর দেবো, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে?

এহেন অবস্থায় আল্লাহ তার বিবেকের সামনে এ প্রশ্ন রেখে দেন যে, এটা তোমার পরীক্ষার সময়, এ জাতিটি তোমার সামনে ক্ষমতাহীন ও অসহায়। তুমি জুলুম করতে চাইলে তার প্রতি জুলুম করতে পারো এবং সদাচার করতে চাইলে তাও তোমার আয়ত্বাধীন রয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ তিনি দেশ জয় করতে করতে পূর্ব দিকে এমন এলাকায় পৌঁছে গেলেন যেখানে সভ্য জগতের সীমানা শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সামনের দিকে এমন একটি অসভ্য জাতির এলাকা ছিল, যারা ইমারত নির্মাণ তো দূরের কথা তাঁবু তৈরী করতেও পারতো না।

৬৭. যেহেতু সামনের দিকে বলা হচ্ছে যে, এ দু' পাহাড়ের বিপরীত পাশে ইয়াজুজ মাজুজের এলাকা ছিল তাই ধরে নিতে হয় যে, এ পাহাড় বলতে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী সুবিস্তীর্ণ ককেসীয় পর্বতমালাকে বুঝানো হয়েছে।

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾

সে বললো, "আমার রব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তাই যথেষ্ট। তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করে দিচ্ছি।[৭০] আমাকে লোহার পাত এনে দাও।" তারপর যখন দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা সে পূর্ণ করে দিল তখন লোকেদের বললো, এবার আগুন জ্বালাও। এমনকি যখন এই (অগ্নি প্রাচীর) পুরোপুরি আগুনের মতো লাল হয়ে গেলো তখন সে বললো, "আনো, এবার আমি গলিত তামা এর উপর ঢেলে দেবো।" (এ প্রাচীর এমন ছিল যে) ইয়াজুজ ও মাজুজ এটা অতিক্রম করেও আসতে পারতো না এবং এর গায়ে সুড়ংগ কাটাও তাদের জন্য আরো কঠিন ছিল। যুলকারনাইন বললো, "এ আমার রবের অনুগ্রহ। কিন্তু যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতির নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তিনি একে ধূলিস্মাত করে দেবেন[৭১] আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।"[৭২]

৬৮. অর্থাৎ যুলকারনাইন ও তার সাথীদের জন্য তাদের ভাষা ছিল প্রায়ই অপরিচিত ও দুর্বোধ্য। ভীষণভাবে সভ্যতার আলো বিবর্জিত ও বন্য হওয়ার কারণে তাদের ভাষা কেউ জানতো না এবং তারাও কারোর ভাষা জানতো না।

৬৯. ইয়াজুজ মা'জুজ বলতে বুঝায়, যেমন ওপরে ৬২ টীকায় ইশারা করা হয়েছে যে, এশিয়ার উত্তর পূর্ব এলাকার এমন সব জাতি যারা প্রাচীন যুগে সুসভ্য দেশগুলোর ওপর ধ্বংসাত্মক হামলা চালাতে অভ্যস্ত ছিল এবং মাঝে মধ্যে এশিয়া ও ইউরোপ উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করতো। বাইবেলের আদি পুস্তকে (১০ অধ্যায়) তাদেরকে হযরত নূহের (আ) পুত্র ইয়াফেসের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এ একই কথা বলেছেন। হিযিকিয়েল (যিহিষ্কেল) পুস্তিকায় (৩৮ ও ৩৯

অধ্যায়) তাদের এলাকা বলা হয়েছে রোশ (রুশ), তূবল (বর্তমান তোবলস্ক) ও মিস্‌ক (বর্তমান মস্কো)কে। ইস্‌রাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুস তাদেরকে সিথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম–এর বর্ণনা মতে মাজূজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

৭০. অর্থাৎ শাসনকর্তা হিসেবে আমার প্রজাদেরকে লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। এ কাজের জন্য তোমাদের ওপর আলাদা করে কোন কর বসানো আমার জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ দেশের যে অর্থভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দিয়েছেন এ কাজ সম্পাদনের জন্য তা যথেষ্ট। তবে শারিরীক শ্রম দিয়ে তোমাদের আমাকে সাহায্য করতে হবে।

৭১. অর্থাৎ যদিও নিজের সামর্থ মোতাবেক আমি অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেছি তবুও এটি কোন অক্ষয় জিনিস নয়। যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন এটি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারপর এর ধ্বংসের জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন তা যখন এসে যাবে তখন কোন জিনিসই একে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। "প্রতিশ্রুতির সময়"–এর দু' অর্থ হয়। এর অর্থ প্রাচীরটি ধ্বংস হবার সময়ও হয় আবার প্রত্যেকটি জিনিসের মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য আল্লাহ যে সময়টি নির্ধারিত করে রেখেছেন সে সময়টিও হয় অর্থাৎ কিয়ামত।

যুলকারনাইন নির্মীত প্রাচীর সম্পর্কে কিছু লোকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। তারা সুপরিচিত চীনের প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর মনে করে। অথচ এ প্রাচীরটি ককেশাসের দাগিস্তান অঞ্চলের দরবন্দ ও দারিয়ালের (Darial) মাঝখানে নির্মীত হয়। ককেশীয় অঞ্চল বলতে বুঝায় কৃষ্ণ সাগর (Black sea) ও কাস্পিয়ান সাগরের (Caspian sea) মধ্যবর্তী এলাকা। এ এলাকায় কৃষ্ণসাগর থেকে দারিয়াল পর্যন্ত রয়েছে সুউচ্চ পাহাড়। এর মাঝখানে যে সংকীর্ণ গিরিপথ রয়েছে কোন দুর্ধর্ষ হানাদার সেনাবাহিনীর পক্ষেও তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তবে দরবন্দ ও দারিয়ালের মধ্যবর্তী এলাকায় পর্বত শ্রেণীও বেশী উঁচু নয় এবং সেখানকার পার্বত্য পথগুলোও যথেষ্ট চওড়া। প্রাচীন যুগে উত্তরের বর্বর জাতিরা এ দিক দিয়েই দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে হত্যা ও লুটতরাজ চালাতো। ইরানী শাসকগণ এ পথেই নিজেদের রাজ্যের ওপর উত্তরের হামলার আশংকা করতেন। এ হামলাগুলো রুখবার জন্য একটি অত্যন্ত মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। এ প্রাচীরটি ছিল ৫০ মাইল লম্বা, ২৯০ ফুট উঁচু এবং ১০ ফুট চওড়া। এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি যে, এ প্রাচীর শুরুতে কে এবং কবে নির্মাণ করেছিল। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ এটিকেই যুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিহিত করেছেন। কুরআন মজীদে এ প্রাচীর নির্মাণের যে প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে তার চিহ্নসমূহ এখনো এখানে পাওয়া যায়।

ইবনে জারীর তাবারী ও ইবনে কাসীর তাদের ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনাটি লিখেছেন। ইয়াকুতী তাঁর মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে এরি বরাত দিয়ে লিখেছেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

আর সে দিন[৭৩] আমি লোকদেরকে ছেড়ে দেবো, তারা (সাগর তরংগের মতো) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমি সব মানুষকে একত্র করবো। আর সেদিন আমি জাহান্নামকে সেই কাফেরদের সামনে আনবো, যারা আমার উপদেশের ব্যাপারে অন্ধ হয়েছিল এবং কিছু শুনতে প্রস্তুতই ছিল না।

আনহু যখন আজারবাইজান বিজয়ের পর ২২ হিজরীতে সুরাকাহ ইব্‌ন আমরকে বাবুল আবওয়াব (দরবন্দ) অভিযানে রওয়ানা করেন। সূরাকাহ আবদুর রহমান ইব্‌ন রবী'আহকে নিজের অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে সামনের দিকে পাঠিয়ে দেন। আবদুর রহমান যখন আর্মেনীয়া এলাকায় প্রবেশ করেন তখন সেখানকার শাসক শারবরায যুদ্ধ ছাড়াই আনুগত্য স্বীকার করেন। এরপর তিনি বাবুল আবওয়াবের দিকে অগ্রসর হবার সংকল্প করেন। এ সময় শারবরায তাঁকে বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। সে আপনাকে এর বিস্তারিত বিবরণ শুনাতে পারে। তদানুসারে তিনি আবদুর রহমানের সামনে সেই ব্যক্তিকে হাযির করেন। (তাবারী, ৩ খণ্ড, ২৩৫-৩৩৯ পৃঃ; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ খণ্ড; ১২২-১২৫ পৃঃ এবং মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব প্রসংগ)।

এ ঘটনার দুশো' বছর পর আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৭-২৩৩ হিঃ) যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন করার জন্য সাল্লামুত তারজুমানের নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি অভিযাত্রী দল পাঠান। ইয়াকুত তাঁর মু'জামুল বুলদান এবং ইব্‌নে কাসীর তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, এ অভিযাত্রী দলটি সামারুরাহ থেকে টিফ্‌লিস, সেখান থেকে আস্‌সারীর, ওখান থেকে আল্লান হয়ে দীলান শাহ এলাকায় পৌঁছে যায়। তারপর তারা খাযার (কাস্পিয়ান) দেশে প্রবেশ করেন। এরপর সেখান থেকে দরবন্দে পৌঁছে যুলকারনাইনের প্রাচীর পরিদর্শন করে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২ খণ্ড , ১১১ পৃঃ; ৭ খণ্ড, ১২২-১২৫ পৃ ঃ, মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, হিজরী তৃতীয় শতকেও মুসলমানরা ককেশাসের এ প্রাচীরকেই যুলকারনাইনের প্রাচীর মনে করতো।

ইয়াকুত মু'জামুল বুলদানের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকেই সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। খাযার শিরোনামে তিনি লিখছেন ঃ

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

১২ রুকূ'

তাহলে কি[৭৪] যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তারা একথা মনে করে যে, আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাদেরকে নিজেদের কর্মসম্পাদনকারী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে?[৭৫] এ ধরনের কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি।

هى بلاد الترك خلف باب الابواب المعروف بالدربند قريب من سد ذى القرنين –

"এটি তুরস্কের এলাকা। যুলকারনাইন প্রাচীরের সন্নিকটে দরবন্দ নামে খ্যাত বাবুল আবওয়াবের পেছনে এটি অবস্থিত।" এ প্রসংগে তিনি খলীফা মুকতাদির বিল্লাহর দূত আহমদ ইব্‌ন ফুদলানের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন। তাতে খাযার রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, খাযার একটি রাজ্যের নাম, এর রাজধানী ইতিল। ইতিল নদী এ শহরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ নদীটি রাশিয়া ও বুলগার থেকে এসে খাযার তথা কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

বাবুল আবওয়াব শিরোনামে তিনি লিখছেন, তাকে আলবাব এবং দরবন্দও বলা হয়। এটি খাযার (কাস্পিয়ান) সাগর তীরে অবস্থিত। কুফরীর রাজ্য থেকে মুসলিম রাজ্যের দিকে আগমনকারীদের জন্য এ পথটি বড়ই দুর্গম ও বিপদ সংকুল। এক সময় এটি নওশেরেওঁয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইরানের বাদশাহগণ এ সীমান্ত সংরক্ষণের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন।

৭২. যুলকারনাইনের কাহিনী এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কাহিনীটি যদিও মক্কার কাফেরদের পরীক্ষামূলক প্রশ্নের জবাবে শুনানো হয় তবুও আসহাবে কাহ্ফ এবং মূসা ও খিযিরের কাহিনীর মতো এ কাহিনিটিকেও কুরআন নিজের রীতি অনুযায়ী নিজের উদ্দেশ্য সাধনে পুরোপুরি ব্যবহার করেছে। এতে বলা হয়েছে, যে যুলকারনাইনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তোমরা আহলি কিতাবদের মুখে শুনেছো সে নিছক একজন বিজেতা ছিল না বরং সে ছিল তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসী মুমিন। সে তার রাজ্যে আদল, ইনসাফ ও দানশীলতার নীতি কার্যকর করেছিল। সে তোমাদের মতো সংকীর্ণচেতা ছিল না। সামান্য সরদারী লাভ করে তোমরা যেমন মনে করো, আমি অদ্বিতীয়, আমার মতো আর কেউ নেই, সে তেমন মনে করতো না।

৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের সত্য প্রতিশ্রুতির প্রতি যুলকারনাইন যে ইংগিত করেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কথাটি বাড়িয়ে এখানে এ বাক্যাংশটি বলা হচ্ছে।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারাই, যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সবসময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো[৭৬] এবং যারা মনে করতো যে, তারা সব কিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে হাযির হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেবো না।[৭৭]

৭৪. এ হচ্ছে সমস্ত সূরাটার শেষ কথা। তাই যুলকারনাইনের ঘটনার সাথে নয় বরং সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তুর সাথে এর সম্পর্ক সন্ধান করা উচিত। সূরার সামগ্রিক বিষয়বস্তু হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জাতিকে শির্‌ক ত্যাগ করে তাওহীদ বিশ্বাস অবলম্বন করার এবং বৈষয়িক স্বার্থপূজা ত্যাগ করে আখেরাতে বিশ্বাস করার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু জাতির প্রধান সমাজপতি ও সরদাররা নিজেদের সম্পদ ও পরাক্রমের নেশায় মত্ত হয়ে কেবল তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং যে গুটিকয় সত্যাশ্রয়ী মানুষ এ দাওয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালাচ্ছিল এবং তাদেরকে অপদস্থ ও হেয়প্রতিপন্ন করছিল। এ অবস্থার ওপর এ সমগ্র ভাষণটি দেয়া হয়েছে। ভাষণটি শুরু থেকে এ পর্যন্ত চলে এসেছে এবং এর মধ্যেই বিরোধীরা পরীক্ষা করার জন্য যে তিনটি কাহিনীর কথা জিজ্ঞেস করেছিল সেগুলোও একের পর এক ঠিক জায়গা মতো নিখুঁতভাবে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন ভাষণ শেষ করতে গিয়ে কথার মোড় আবার প্রথমে যেখান থেকে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিল এবং ৪ থেকে ৮ রুকূ' পর্যন্ত যে বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে সেদিকেই ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

৭৫. অর্থাৎ এসব কিছু শোনার পরও কি তারা মনে করে যে, এই নীতি তাদের জন্য লাভজনক হবে?

৭৬. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। অনুবাদে আমি একটি অর্থ গ্রহণ করেছি। এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, "যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সাধনা দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই হারিয়ে গেছে।" অর্থাৎ তারা যা কিছু করেছে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কহীন হয়ে ও আখেরাতের চিন্তা

ذٰلِكَ جَزَاۤؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾

যে কুফরী তারা করেছে তার প্রতিফল স্বরূপ এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলদের সাথে যে বিদ্রূপ তারা করতো তার প্রতিফল হিসেবে তাদের প্রতিদান জাহান্নাম। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আপ্যায়নের জন্য থাকবে ফিরদৌসের বাগান।[৭৮] সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং কখনো সে স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না।[৭৯]

না করেই শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই করেছে। দুনিয়ার জীবনকেই তারা আসল জীবন মনে করেছে। দুনিয়ার সাফল্য ও সচ্ছলতাকেই নিজেদের উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে। আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও তাঁর সন্তুষ্টি কিসে এবং তাঁর সামনে গিয়ে আমাদের কখনো নিজেদের কাজের হিসেব দিতে হবে, এ কথা কখনো চিন্তা করেনি। তারা নিজেদেরকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন বুদ্ধিমান জীব মনে করতো, যার কাজ দুনিয়ার এ চারণ ক্ষেত্র থেকে কিছু লাভ হাতিয়ে নেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

৭৭. অর্থাৎ এ ধরনের লোকেরা দুনিয়ায় যতই বড় বড় কৃতিত্ব দেখাক না কেন, দুনিয়া শেষ হবার সাথে সাথে সেগুলোও শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের সুরম্য অট্টালিকা ও প্রাসাদ, নিজেদের বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ও সুবিশাল লাইব্রেরী, নিজেদের সুবিস্তৃত রাজপথ ও রেলগাড়ী, নিজেদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ, নিজেদের শিল্প ও কলকারখানা, নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও আর্ট গ্যালারী এবং আরো অন্যান্য যেসব জিনিস নিয়ে তারা গর্ব করে তার মধ্য থেকে কোন একটি জিনিসও তারা আল্লাহর তুলাদণ্ডে ওজন করার জন্য নিজেদের সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হতে পারবে না। সেখানে থাকবে শুধুমাত্র কর্মের উদ্দেশ্য এবং তার ফলাফল। যদি কারোর সমস্ত কাজের উদ্দেশ্য দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থেকে থাকে, ফলাফলও সে দুনিয়াতেই চেয়ে থাকে এবং দুনিয়ায় নিজের কাজের ফল দেখেও থাকে, তাহলে তার সমস্ত কার্যকলাপ এ ধ্বংসশীল দুনিয়ার সাথেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আখেরাতে যা পেশ করে সে কিছু ওজন পেতে পারে, তা অবশ্যি এমন কোন কর্মকাণ্ড হতে হবে, যা সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করেছে, তাঁর হুকুম মোতাবেক করেছে এবং যেসব ফলাফল আখেরাতে প্রকাশিত হয় সেগুলোকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে করেছে। এ ধরনের কোন কাজ যদি তার হিসেবের খাতায় না থাকে তাহলে দুনিয়ায় সে যা কিছু করেছিল সবই নিসন্দেহে বৃথা যাবে।

৭৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মুমিনূন, ১০ টীকা।

হে মুহাম্মাদ! বলো, যদি আমার রবের কথা[৮০] লেখার জন্য সমুদ্র কালিতে পরিণত হয় তাহলে সেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার রবের কথা শেষ হবে না। বরং যদি এ পরিমাণ কালি আবারও আনি তাহলে তাও যথেষ্ট হবে না।

হে মুহাম্মাদ! বলো, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি অহী করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহই তোমাদের ইলাহ, কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী তার সৎকাজ করা উচিত এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।

৭৯. অর্থাৎ তার চেয়ে আরামদায়ক কোন পরিবেশ কোথাও থাকবে না। ফলে জান্নাতের জীবন তার সাথে বিনিময় করার কোন ইচ্ছাই তাদের মনে জাগবে না।

৮০. "কথা" বলে বুঝানো হয়েছে তাঁর কাজ, পূর্ণতার গুণাবলী, বিস্ময়কর ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা লুকমান, ৪৮ টীকা।